বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

২

সোমানন্দ অবধূত

সন্ধ্যা-সুমন্‌স' পাবলিকেশানস্‌
গ্রাম — বিদ্যাধরপুর (রেল ষ্টেশনের ২নং প্লাটফর্মের কাছে), পোঃ + থানা
সোনারপুর, কোলকাতা--৭০০১৫০, জেলা - ২৪ পরগণা (দঃ)
ফোন — ৯৮৩০৪৭৯৩২৪

প্রকাশক :

প্রেমানন্দ প্রামাণিক
গ্রাম--বিদ্যাধরপুর, পোষ্ট অফিস--সোনারপুর
২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কোলকাতা --৭০০১৫০
মোবাইল--৯৮৩০৪৭৯৩২৪

প্রকাশ কাল ঃ

জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭ সাল

মুদ্রণে ঃ— লতিকা ইনভেন্ট গ্রাফিক্স
প্রোঃ রাজকুমার মণ্ডল (৯৩৩৯৩৩১১৯৮) বিদ্যাধরপুর (রামপুর), দঃ ২৪ পরগণা

পরিবেশক ঃ

(১) দে বুক স্টোর্স
(২ দে'জ পাবলিশিং
(৩) জ্ঞান সঞ্চয়
(৪) মহেশ লাইব্রেরী
(৫) বুক ফ্রেন্ড
(৬) বলাকা বুক স্টল
(৭) দত্ত বুক স্টল

(১–৭) কলেজ ষ্ট্রীট বইপাড়া

(৮) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
(বিবেকানন্দ রোড ক্রশিং)

লেখক পরিচিতি—-

সোমানন্দ অবধূত লেখকের **দীক্ষান্ত নাম।** **অমরকন্টকের** পবিত্র **নর্মদাতীর্থে** এই নামই রেখেছিলেন তার **গুরুমা--বেদবতী মাইয়া।**

প্রকৃত নাম— **শ্রী প্রেমানন্দ প্রামাণিক।**

আদি নিবাস — গোপালচক, গেঁওখালী, পূর্ব মেদিনীপুর।

নর্মদার আদেশে লিখে চলেছেন—নর্মদা-পরিক্রমার ভয়াল শিহরণভরা অনুপম কাহিনী। ব্যাক্তি জীবনে তিনি ছিলেন **কলকাতা হাইকোর্টের, আপীল অধিক্ষেত্রের বিভাগীয় প্রধান** (Section Officer)। গত জুলাই ২০০৬ সালে চাকুরী জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন।

অতি অতি বাল্যকাল থেকে, কৈশোর আর যৌবনের প্রথম দিকটাতেও—ভিক্ষা করেছেন মানুষের দরজায় দরজায়, দাদা-দিদি-ভাই-বোন ও মায়ের সাথে; ক্ষুন্নিবৃত্তি ও বেঁচে থাকার জন্য। ফলতঃ স্কুল-কলেজে **নিয়মিত পড়াশুনা** করা সম্ভব হয়নি। আপন প্রবল ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে, ঠোঙার বই আব ফুটপাতের ছেঁড়া বই ভিক্ষা কবে করে পড়ে, চিরকালই **এক্সটারর্ণাল পরীক্ষার্থী** হয়ে পড়াশুনা করেছেন। একদিকে যেমন **ইংরাজী-বাংলা-সংস্কৃত-হিন্দী-উড়িয়া-সাঁওতালী-বাঙ্গাল** ভাষা, নিজের মাতৃভাষার মত জানেন ও লেখেন; অন্য দিকে তেমনই জানেন —**এ্যালোপাথি, আয়ুর্বেদ-ইউনানী-সিদ্ধ** ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এবং তার ফলিত প্রয়োগ রূপ।

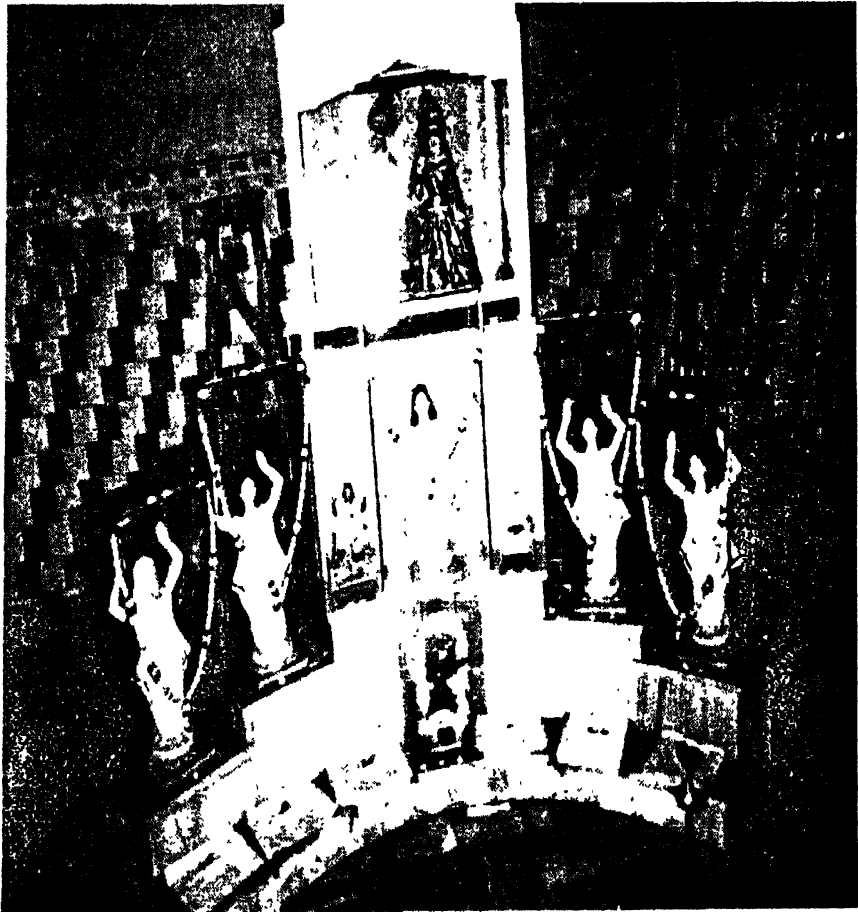
হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের অতি জটিল আর গুহ্যতম দিকের, সাবলীল ও সুনিপুণ ব্যাখাকার; সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম। এত সরলীকরণ এর আগে আর দেখা যায়নি। Human Anatomy & phisiology, Ayurvedic & Unani medicine-এর আলোয় এনে, ব্যাখা করেছেন তন্ত্রের ফলিত বৈজ্ঞানিক দিক; নিজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিবিড় আলোকে--- নর্মদামায়ের সরাসরি নির্দ্দেশে। খণ্ডের পর খণ্ডে পাওয়া যাবে, তার **সুনিপুণ** লেখনীর পরিচয়, যেন অকাতরে বিতরণ করে চলেছেন—পিপাসু পাঠকদেরকে তাঁর অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার— যার অন্য নাম—**একেবারে উজাড় করে দেওয়া।**

নর্মদা-পাঠকচক্র

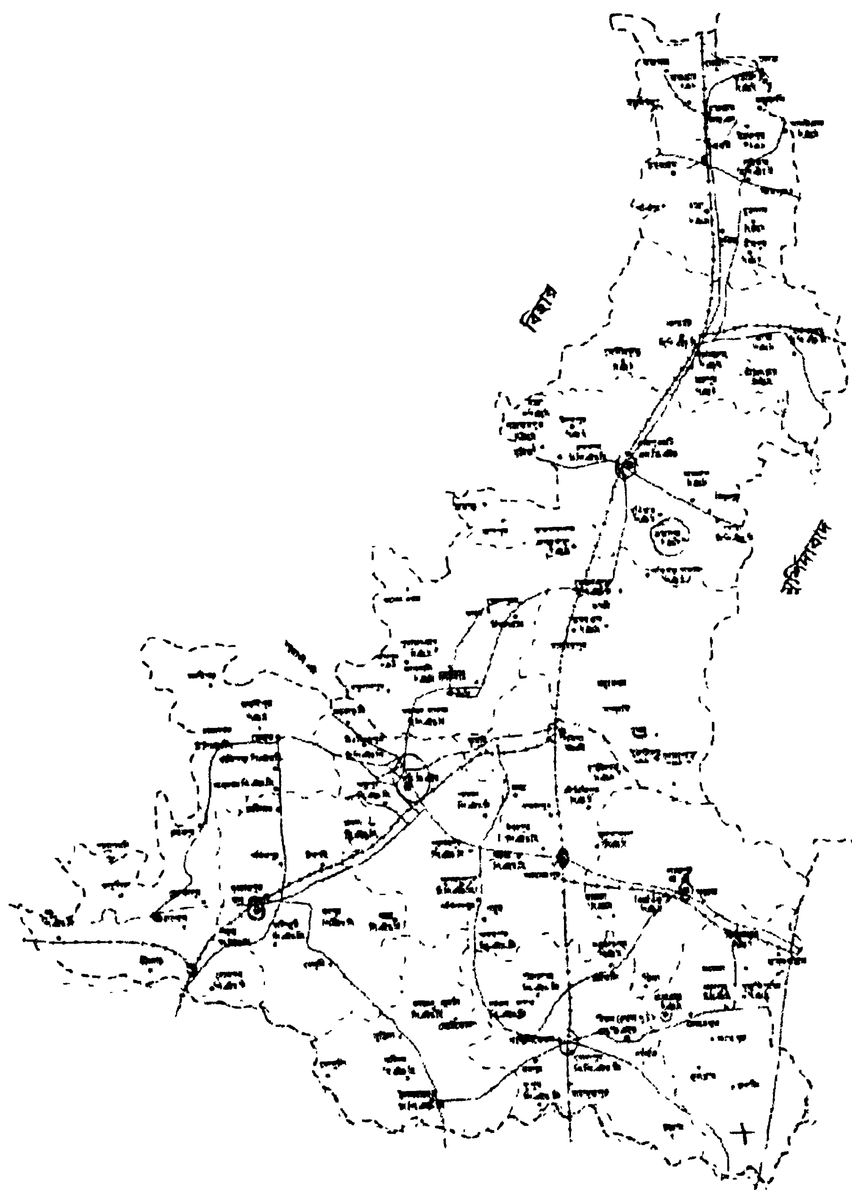
(Readers' Forum)
USA UK Germany, & all Provinces of India

সূচীপত্র

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



বর্ধমান

বার্ত্তাঃ বিশেষাঃ

(News : A Special one)

নর্মদা, পরম পিতা শিব এবং দুর্গার মানসকন্যা, বা বলা যেতে পারে যে—শিবের হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপা; এক মহাশক্তিময়ী সে। মহামায়া কালীর কন্যারূপা—খেয়ালী-আর ক্ষ্যাপাটে বা উড়নচণ্ডী-কন্যা। ভালবাসে সে, পেতে পিতা-মাতার স্নেহ। গেরুয়া-ধারিকা-সর্পরূপা সে, আমি তাকে যেমন দেখেছি, নর্ম্মদা-পরিক্রমার পথে পথে; বিন্ধ্যপর্বতে আর তার বুক-কাঁপানে জটিল-কুটিল, অরণ্যভূমিতে।

কোটি কোটি বছর ধরে, আজও তার তীর ধরে চলে পবিত্র পরিক্রমা; তার পুণ্যময়ী আশীর্বাদ পেতে। লক্ষ লক্ষ সাধু-মুনি-ঋষি দেবদেবী, রক্ষ-যক্ষ-কিন্নরেরা—আজও তাকে পরিক্রমা করে! শিব-দুর্গা স্বয়ং পিতামাতা হয়েও, করে তাকে পরিক্রমা আজও। একথা আমার নয়—স্বয়ং মহাঋষি মার্কণ্ডেয়ের।

ওই বিপদসংকুল পাহাড়ীপথে, গভীর বিন্ধ্যা-অরণ্য ভেদ করে; বছরের পর বছর পরিক্রমা করা—কারুর কারুর পক্ষে সম্ভব হয় না, সময়-সুযোগ, শরীর-মন; আর ভয়ে হুতাশে! তবে কী ব্রাত্য থাকবে তারা? পাবে নাকি তার অপ্রমেয় করুণা? অবশ্যই পাবে ১০ শতাংশ পুণ্য সবাই, যদি মনে মনে জপ করে—ওঁ হ্রাং রেবা রেবা হ্রাং ওঁ!

তবুও অভক্তিপুষ্ট অবিশ্বাসী আমরা, সামনে কোন মূর্ত্তি না দেখলে, মাথা নোয়াতে চাই না! এতটাই তরল, আমাদের ভক্তি আর বিশ্বাস! আর তাই চাই তার মূর্ত্তি, মঠ-মন্দির-মিশন, শুধু মেতে উঠতে—তার পবিত্র নামে, তাকে পেতে একান্ত করে! পশ্চিমবাংলায় নাই তার কোন মঠ-মন্দির আর মিশন, যতটুকু আমার জানা আছে। কন্যাস্বরূপা শিবকন্যার যে একটা, খেলাঘর বা আশ্রম বানিয়ে দিতে হয়, এই বাংলায়—তাদের জন্য, যারা সদিচ্ছা

থাকা সত্বেও—যেতে পারলো না তার তটরেখায় ! এখানে তাকে দর্শণ করে; সমান পুণ্যের ভাগীদার হতে পারবে তারা।

তাই ভিক্ষা চাই, সাহায্য চাই, খেলাঘররূপী তার মঠ-মন্দির আর আশ্রম গড়ে তুলতে। যেখানে পাণ্ডারূপী পাষণ্ডের খপ্পরে না পড়ে, ভক্তেরা নিজেরাই পূজা করতে পারবে নর্ম্মদার; শুধু জল দিয়ে তাকে—জলময়ীরূপে। ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য, কিছুই লাগে না—তার নাম করতে , প্রণাম জানাতে। সদিচ্ছা আর সামর্থে কুলিয়ে উঠলে—মুক্ত হস্তে দান করুণ—এই বিরাট কর্মযজ্ঞে। অতি সামান্যতম দানও—শ্রদ্ধায় গৃহীত হবে।



যোগাযোগের ঠিকানা

Sri Premananda Pramanik
Vill - Bidyadharpur, P.O. & P.S. –
Sonarpur, Kolkata - 700150
Dist - 24 Parganas (South), West Bengal

নিবেদক
সোমানন্দ অবধূত
ফোন ঃ- ৯৮৩০৪৭৯৩২৪

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



পারুল বোন আমার (ফিরে দেখা)

উনসত্তরের (1969) আশ্বিন মাস। সামনেই দুগ্গাপূজো। পাড়ায় পাড়ায় ঠাকুরের প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছে। **পোঙাপাকা ছোঁড়ারা** চাঁদার বিল বই নিয়ে, লুকিয়ে-চুরিয়ে চাঁদা তুলছে পাড়ায় পাড়ায়; রাজ্যপাল **ধরমবীরার** ভয়ে। **সোনাগাছি-বেশ্যা-পাড়ায়** চাঁদার মাত্রাটা একটু বেশী। শরীর বেচে **আয়** কিনা! No investment—এর ফলে, জুলুমটা একটু মাত্রাছাড়া। আমাকেও চাঁদা তুলতে বেরুতে বলেছিল **দাশু** বলে একটা ছেলে। আমি **রাজী হয়নি**। কারণ চাঁদা তুলতে গেলে—আমার সব থেকে বেশী **অপরাধ-বোধ** জাগে। যারা কারণে-অকারণে যখন-তখন চাঁদা তুলতে বেরিয়ে, মানুষকে **বিরক্ত আর বিব্রত করে**, হাতে শাসন-ক্ষমতা থাকলে—আমিই তাদের প্রথম বেহদ্দ মার দিতাম।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে, সবে **ফামার্সী পড়া** শেষ করে, ফিরে এসেছি কলকাতায়। চাকরি-বাকরি তখনও জুটেনি। তাই **পুরানো পাড়ায়** ফিরে এসেছি। **যুথি মাসীর** (বৃদ্ধা গণিকার) কাছে থাকি। তাদের **ফাই-ফরমাস খাটি**। সকালে গঙ্গায় **'চান করা'**তে নিয়ে যাই। ওদের বাজার-হাটও করি। আর সন্ধ্যেবেলায় যখন **সুরের আর অসুরের** লড়াই বেঁধে যায়, তখন সামাল দিই দু'টোকেই। যুথী মাসীর এক নম্বর ল্যাংবোট আমি।

মাসীর অনেকগুলি **'কাঁসি'** আছে। টাইট জামা পরে মুখে রং মেখে, যখন দেয়ালে **ঠেস দিয়ে** দাঁড়ায় ওরা গলিটায়, আলো আর আঁধারের মাঝখানে; তখন কলেজে পড়ার (1962-65) দিনগুলো, মনের মধ্যে **উঁকি-ঝুঁকি** মারে। N.C.C ক্যাডেটদের মত

যেন ওরা **"ফল্-ইন্"** (Fall in) করে, **'ড্রিল'** (Drill) করার জন্য। 1962-63-র চীন আর 1965-র পাকিস্তানের যুদ্ধের কথাও, তখন মনে করিয়ে দেয়।

ওরাও যেন প্রস্তুত, **সারারাতের** যুদ্ধের জন্য। নয়নে **বাণ** আছে, বয়ানে **আহ্বান** আছে, মুখে **পান** আছে, ধড়ে **প্রাণ** আছে—এমন যে **মাসীর চ্যালীরা,** তাদের **নাড়ু গোপাল** আমি। **লিডারও বটে** ল্যাডারও **(Ladder = মই) বটে।**

যুথী মাসীর এই চ্যালাকে কেউ, হেলা ফেলা করে না, **সাহসও নাই।** রথী-মহারথীরা আসে মাসীর **গরীবখানায়,** খানদানি রং মাখতে। আর তাদের **খিদমৎগার আমি।** যথেষ্ট পরিচয় আছে সে সব নর-পুংঙ্গবদের সাথে; যাদের সাথে ওই **'কাঁসিরা'** আপ্রাণ চেষ্টা করে ভিড়বার। আমাকে এ ব্যাপারে **মই বা ল্যাডার** করে, ওরা তরতর করে উঠতে চায়। তার বদলে জামা দেয়, প্যান্ট দেয়, খেতে দেয়—থাকতে দেয়। আরও **অনেক কিছু** দিতে চাইতো ওরা, কিন্তু মাসীর **'বাঁশী'** যখন বাজতে শুরু করতো; তখন ওরা ভাবতো এবার বুঝি **ফাঁসি হ'ল** কারুর। আমি সুযোগ বুঝে বলতাম—**এখন তবে আসি!**

আমিও আমার বর্তমান **নিশ্চিন্ত আশ্রয়** হারাবো ভেবে, এগুতে গিয়েও পিছিয়ে আসতাম। **'আশনাই'**-এর গুলি মারি। বাসনাই থেকে যেত মনে মনে। নিজের আঙুল নিজে কামড়ে, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতাম **সোনাগাছি** পাড়ায়; **খোকন সোনা হয়ে—সভয়ে আবার নির্ভয়ে।** ভেউ ভেউ করে কাঁদতাম—যখন আশে পাশে কেউ থাকতো না। ঘেউ ঘেউ করে পাড়ার লেড়ী কুত্তাগুলো বলতো, **"তুই আমাদের মত স্বাধীন না কেন? গলায় চেন্ (Chain) কেন? চেন্ (Know thyself) আগে নিজেকে। পালা এখান থেকে, না হলে পরে পস্তাবি। প্রস্তাবটা ভেবে দেখিস। প্রস্রাব করিস না ওটায়, বুঝলি কিনা?"**

আরে দূর! আমি যদি বুঝবো, তবে ঐ পাড়ার **লপসি** খাবো কেন **চৌদ্দ-পনেরোটা** বছর। বাছুরের মতই শুধুই **হাম্বা হাম্বা** করে বাঁচতে হবে, সেটাই লেখা ছিল আমার কপালের **খতিয়ানে।** তাই কুকুরগুলো যে **মুকুর** আমার সামনে ধরেছিল, আমাকে **চিনে** নিতে; মুগুর পড়েছিল আমার এই মুখে—সেই **মুকুরে** নিজেকে দেখিনি আর দেখবার **সাহস হয়নি** বলে।

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট। যেখানে এখন **পেট্রোল পাম্পটা** হয়েছে, তখন ওটা ছিল না। কোণার দিকে অনেক পুরানো, একটা হাত চারেক উঁচু **শীতলা মন্দির।** তার আড়ালে বসে কথা বলছিলাম, **পারুল রাণীর** সাথে। সন্ধ্যায় তাকে **কালীমন্দিরে** নিয়ে যেতে হবে। আজকাল তার কাছে **খদ্দের খুব কম** যাচ্ছে। আমার হাতের বড় বড় **বাবুরা** তাকে পছন্দ করে না, সে **একটু মোটা বলে।** ঠাকুরমশাই যদি একটা **'আকর্ষণ' মাদুলি** বানিয়ে দেয়, তবে নাকি তার **খদ্দেররা;** দুড়-দাড় করে এসে পৌঁছাবে, তার গরীবখানার **মেহ্ফিলে।** হালফিল খবরটা ছিল এইরকম।

হঠাৎ পড়লো মাসীর ডাক। "ওরে ও' বেজন্মা রাঁড়ীর ব্যাটা লাদ্‌খোরের বাচ্চা, কচি কচি **মাগী** ধরবার তালে আছিস্? বুড়িকে আর বুঝি তোর পছন্দ হয় না? এখুনি আয় বলছি— তোকে আজ **শেষ করে** ফেলবো। কাল কি করেছিস্ জানিস্? তোর মার ভাতার্ কী আর, কোনদিন এখানে আসবে? **পাকা খদ্দেরটা** অমন করে **ভাঙিয়ে** দিলি?"

বুঝতে পারলাম না আমার দোষটা কি! দৌড়ে মাসীর কাছে গিয়ে বসে বললাম, "বুঝতে পারছি না মাসী আমার দোষটা কি? কিছু তো মনে পড়ছে না। সব তো ঠিকঠাক করেছি, তুমি যা বলেছিলে! আমার তো ভুল হয় না মাসি!"

—— " ওরে আবাগীর ব্যাটা রে—**বেজন্মার ছানা রে**। ওরে কাল **বড়বাবুকে** কোন্ জুতো **পরিয়েছিস্ রে**। ওরে ওটা আমার জুতো রে। বাড়ি গিয়ে সে তার বউ এর মার খেয়েছে রে। ওরে আমার কি হবে রে। অনেকদিন পরে আমার **নিজের খদ্দের** হয়েছিল রে। এই বুড়িকেও যে **কেউ চায়**, আমি বুঝিনিরে। হায়, আমার **কি হল রে**! হায়, আমার কি হল রে! তোর জন্য আমার সব **গেল** রে!"

মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে, মাসী মারল সপাটে এক **পেল্লায় লাথি** আমার মুখে। মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়লো, আমার সামনের চারটে দাঁত। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে, দৌড়ালাম **পারুলের** কাছে আবার! রক্ত তখন ঝরছে, বন্যার স্রোতের মত মুখ বেয়ে, বুক বেয়ে। নেয়ে উঠেছি **রক্তে আর ঘামে**। মাসীর পায়ে পুলিশের বড়বাবুর **বুট-জুতো**। এক লাথিতে চারখানা দাঁত ভেঙেছে, **নাল লাগানো** জুতোর ঘায়ে। মাসীর জুতো পরে সে ঢুকেছিল নিজের বাড়িতে! তার গিন্নি তাকে **রেয়াৎ করে** কথা বলবে কেন! তাই ভরদম্ **ঠ্যাঙানি** দিয়েছে। আর মাসী দেখছে তার নিজের **জুতো নাই**। তারটাই বদলে গেছে— পুলিশের জুতো, **পরা আছে** তার পায়ে!

ঘুম থেকে উঠে সকাল দশটায় তার **খেয়াল** হয়েছে যে, **জুতো বদল** হয়েছে। দোষটা আমার নয়। বে-সামাল্ বড়বাবুকে আমিই্ পরিয়ে দিয়েছিলাম মাসীর **সেই জুতো**। **একই রকম দেখতে আর মোটা বলে**। পরখ করে দেখিনি, ছেলে কী মেয়ের জুতো। ফোনে বড়বাবু সম্ভবতঃ জানাবার পরে, মাসীর **খেয়াল** হয়েছে। কী না **কেলোর কীর্ত্তি** আমি করে ফেলেছি। **হুলো** ধরা পড়েছে—আর তার **নুলোয় ছ্যাঁকা দিয়েছে, তারই শ্বশুরের মেয়ে।**

ভয়ে, মাসীর কাছে আর যাইনি। পারুলের কাছে আছি, সেই সকাল থেকে। নিজের হাতে পারুল শুশ্রুষা করেছে। **গলা-ভাত** খাইয়েছে—যাতে চিবোতে গিয়ে না আবার ব্লিডিং (bleeding) হয়। সন্ধ্যার সময় একটু সুস্থ বোধ করতে, বললাম—চলো, তোমাকে কালীমন্দিরে নিয়ে যাই। তোমার একটা **ভাল মাদুলী** করিয়ে দিতে বলব, ঠাকুর মশাইকে। না দিলে, ওকে **বেদম ঠ্যাঙানী** দেবো। খান্‌কীপাড়ার **মাস্তান্‌কে** তো, ওর চিনে রাখা দরকার!

পারুল রাজী হ'ল না। আমিই তাকে জোর করে, কাপড় জামা পরতে বাধ্য করলাম। তারপর রিক্সায় উঠে দু'জনে চললাম, সেন্ট্রাল এভিনিউ এর মাঝখানে যে মন্দির আছে, সেখানে। গ্রে স্ট্রীটের মোড় ছাড়িয়ে, শ্যামবাজারের দিকে যেতে যে মন্দিরটা— সেইখানে! ঠাকুরমশাই সবে আরতি করবে বলে, প্রদীপ জ্বালাবার উদ্যোগ করছে তখন। ধুপ-ধুনার গন্ধে সারাটা জায়গা ম ম করছে, গোধুলির ম্লান আলোয়। মালিন্যের অধিকারিণী মা কালী, দাঁত ছিরকুটে হাসছে তখন সেখানে।

পারুল রিক্সা থেকে নেমে, ঠাকুরের সামনে মাথা ঠুকতে লাগলো। বলতে লাগল, "আমার ভাইকে সুস্থ করে দাও মাগো, আমি বেবুশ্যা (Prostitute), আমার ভাই কেউ হতে চায় না। মাগো, এবারে 'ভাই-ফোঁটায়' ওকে ফোঁটা দেবো মাগো। তার আগে ওকে ভালো করে দাও। তেমন চোখে ও'-আমাকে দেখে না কখনও।"

চাইতে গেছিল কবচ, তার অনেক খদ্দের হবে বলে। কী চেয়ে বসলো এই অভাগী! একবারও সেই কথা বললো না, ঠাকুর মশাইকে। চোখ বেয়ে জল পড়ছে তার। আর— আমি দেখছি, ছোটবেলায় মরে যাওয়া আমারই বড় বোন পারুলকে, ছলকে উঠতে তার মধ্যে। "ওঠ্ পারুল—বাড়ি যাবি না?" জাপটে ধরলাম তাকে বুকের মধ্যে, এতদিন ভোগ করার চরম সুযোগ থাকতেও, যাকে বুকে জাপটে ধরতে পারিনি অমন করে!



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে


অট্টাট্টহাসিনীর অট্টহাসপীঠে

আজ থেকে প্রায় ৩৮ বছর আগে এসেছিলাম, 'মহাপীঠ সতীপীঠ এই অট্টহাস-মন্দিরে। দেখে নিতে আরও একবার—যা' দেখেছিলাম ৩৮ বছর আগের কয়েকটা রাতে। তার সাথে মিলিয়ে নিতে আগা-পাশতলা জায়গাটার। আর—মহাকাল শংকর আর মহাকালী শংকরী; নিরোল বাস-স্ট্যাণ্ডে (Bus stand), রেডি রেখেছিল এক রিক্সাওয়াল্যাকে—আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে তার হাড়কাঠের কাছে; যেখানে সব অহংকারকে বলি দিতে হয় তার কাছে; আখের ছিবড়ের মত পড়ে থাকতে হয় তার কাছে—জীবনের সব রসকে বলি দিয়ে, ডালি দিয়ে।

আর একজনকে সেই বেটী প্রস্তুত রেখেছিল, আমাকে স্বাগত জানাতে, আশ্রয় দিতে—মুখে তুলে দিতে তার অমৃতসম প্রসাদ-অন্ন; অনুপম স্বাদ পেয়েছিলাম সেদিন! সকলের সামনে আমার মতো High Court-এর, অতবড় এক প্রাক্তন অফিসারের কান্না মানায় না। তাই দো-তলায় আপন মনে থাকার জন্য, এক নির্জন ঘরের চাবি যখন তুলে দিয়েছিলো—অনুগত সাধক অসীম ব্রহ্মচারী; মনে মনে তাকে সীমাহীন আশীর্বাদ না করে পারিনি। বয়সে সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। তবুও তো সে বয়ে নিয়ে চলেছে মায়ের পঞ্চ-প্রদীপ, নিরুচ্চার এক মন্ত্রে তার নীরব রক্তস্রোতে— জাগো, তোমরা। ডাকো তাকে; নীরব হও তার মতো, বুলি কপচিও না; না বুঝে-না জেনে।

তাকে কথা দিয়েছিলাম, "আজই ধ্যানে দেখে নেবো সে বেটীকে। সে এখানে সত্যি আছে কিনা, বলে দেবো।" বড় লজ্জার যে, আজও নাই কোন লিখিত ইতিহাস তার ব্যাপারে—মন্দিরের পূজারীরাও, লোক-কথার সেই এক পূরানো-ধোঁয়াটে বুলি শুধু কপচায়! আপন অভিজ্ঞতার নাই কোন উদ্ভাস!

তাই বলেছিলাম—বাড়ী ফিরে লিখবো তার কেচ্ছা—স্বেচ্ছায়। ঘাপটি মেরে থাকতে দেবো না তাকে। টেনে বের করে আনবো তাকে— গর্ভগৃহের ভেতর থেকে; গৃহে

গৃহে ছড়িয়ে দেবো তার কথা—**চাঁড়াল থেকে ব্রাহ্মণের** গৃহের ছাঁচতলায়; উঠোনে—উদ্যানে, ফুলের হাসিতে— পাতার মর্মরে; আর আর লাল মাটির **বীরভূম-বর্দ্ধমানের পথে-প্রান্তরে; কাশের গুচ্ছে গুচ্ছে**— যেখানে শরতের মেঘ নেমে এসে—লুটিয়ে পড়ে বলে কানে কানে—**"আগচ্ছান্তী সা বিশ্ববিবেকা বিনমিতোসি পদপ্রান্তে তস্যা; যুয়ঙ্কানি পরিলক্ষ্যন্তে তস্যা অমৃত পদসঞ্চারানি?"** মানেটা হলো যে— [মূর্ত্তিমতী সেই বিশ্ববিবেক (মা হয়ে) আসছে! লুটিয়ে পড়্ তার পায়। তোরা কী রে? সেই অমৃতময়ীর পদ-ঝংকারের (নুপুর) শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না?"]

রাতের গভীর নিরালায়, (১৯.৯.০৭) তার **ধ্যানে ডুবে গেলাম** গভীর করে; লক্ষ বকের বক্‌বকানির **সুরের** সাথে। সবাই ভাবলো আমি **ঘুমোচ্ছি।** না, আমি ঘুমাইনি তখন! **ঘামাচ্ছিলাম মাথা,** বিশ্ব-মাতাকে ধরবো বলে! ভোর ৪-টা পর্য্যন্ত চলছিলো সেই ব্যাপারটা। হঠাৎ **ধানুর** ডাকে, জেগে উঠলাম। সে একগ্লাস **লেবু-চা** নিয়ে ডাকছে আমাকে, "মহারাজ উঠুন, চা খান্—ঠান্ডা হয়ে যাবে।"

ভাবতে পারিনি—**অসীম মহারাজ** তার Duty এমন করে করবে; সমাগত এক অতি দীন **পরিব্রাজকের প্রতি**। ফাঁকি নেই তার কাজে। তার হাতের অন্ন যে খায়, **অন্নপূর্ণা** প্রতিদিন। বড় স্বাদু সে সামগ্রী, আমি প্রাণভরে খেয়েছি সেদিন! সাধনার জগতে হোক তার দ্বিধাহীন-সুন্দর **অগ্রগতি**! গতি হোক তার—**গতিময়ীর গর্ভগৃহে** গভীরে-গোপনে। বেদনার অশ্রু নয়, ঝরুক তার **আনন্দাশ্রু তাকে আপন করে পেয়ে।**

আর ওই যে **বিপুল-হাজরা** রিক্সাবালা, তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে যে টেনে নিয়ে গিয়েছে আমাকে—ঘর্মাক্ত দেহে ভুখা-পেটে; সে পেয়েছিলো কোন্ সে **অচিন স্বাদ**—আমাকে বইবার? যা কেউ অমন করে তার মতো করে না? সে কী শুধু আমার **লাল-লাল গেরুয়ার মোহমায়ায়?** আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তার মত "**কালকেতুর সংসারের** হাল্-হকীকৎ। তাই একরাতের আশ্রয় নিয়েছিলাম, তার **পর্ণকুটীরে**! সন্তান পরিবৃতা এক দুঃখিনী **ফুল্লরাকে,** সেদিন দেখেছিলাম সেখানে। **নিবেদিতপ্রাণা** সেই মহীয়সীকে, প্রাণভরে **আশীর্বাদ** করেছিলাম—তার সেবার জন্য। বড় সাধারণ মাপের এক মানুষ আমি। অথচ পেয়েছিলাম—এক **রাজার আদর** তার সেই কুটীরে।

কেমন করে ঘটলো এ'সব? বাহ্ রে, সেইই তো ঘটালো **আড়ালে আবডালে** থেকে। আজ থেকে ৩৮ বছর আগে, **পুলিশের গুলি থেকে** যেমন করে বাঁচিয়েছিল সে! পরের কাহিনীতে পাবেন সে সব! অকারণে আজ **কলম ধরিনি**! থরে থরে আমার সুখের সব উপচার যে **সাজিয়ে রাখলো**; যার আশীর্বাদে আমার কলম **সড়সড়** করে চলে; তার কথা লিখতে গিয়ে—আমার যে **আল্‌সে-কুঁড়ে** হলে চলে না! সে যে আমার দিদা-দিদিমা! আমি যে তার মেয়ে **নর্মদার ব্যাটা— সোমানন্দ অবধূত**!

একদিন আমার ব্রহ্মতালুতে **চুমুক মেরে মন্ত্র** জাগিয়ে বলেছিলো, "**গোটা বিন্ধ্য আর সাতপুরা পর্বত তোকে দিলাম। ওখানে আমি লুকিয়ে আছি। বুঝলি খোকা, আয় লুকোচুরি খেলি—তো-তে আর আমাতে! লুকিয়ে আছি আমি, খুঁজে নে আমাকে সোম! সোম, আমাকে খুঁজবি না বাবা? খুঁজবি না তোর দিদিমাকে বীরভূমের পথে-প্রান্তরে?**

সময়মতো **বিপুল** আমাকে **পাচুণ্ডী স্টেশনে** পৌঁছে দিলেও, ট্রেনের **গোঁসার** কারণে, ৪০ মিনিটের পথ লেগে গেল সাড়ে তিন ঘন্টা! No train. সেই সন্ধ্যে ৬ টায় চড়বো ট্রেনে **কাটোয়া** থেকে— পৌঁছাবো রাত ১০ টায় **হাওড়ায়**। বাসে করে **শেয়ালদায়** পৌঁছে দেখবো, আমার **শেষ গাড়ীটাও** তখন নাই। কখন যে **বন্ধ হয়**—শিবের অসাধ্য তা' জানা। রাতে যখন স্টেশনে পড়ে থাকতেই হবে, তখন রাতটুকু **উদ্ধারণপুরের ঘাটেই না হয় কাটালাম**। আর তাই চড়ে বসলাম ফের ফেরীতে, রাতটুকু ওপারের **ঠিকানা-হীন শ্মশানে কাটাবো বলে!**

ভূতের ভেল্‌কী দেখিয়েছিলাম **বিপুলকে**, দিনের বেলায়! রাতের বেলায় দেখালাম **ভূতের খেলা—ভূতদেরকে**। খুশী হয়ে গঙ্গার **বুক থেকে**, তুলে এনেছিলো তারা, কয়টা **বিলাতী মালের** বোতল—যার জন্য আমাকে একটা টাকাও খরচ করতে হয়নি! বাড়ী ফিরে চান করে এসে, যখন সবে কলম ধরেছি; তখনই এলো (23.09.2007) **অসীম ব্রহ্মচারীর** ফোন (8.21pm) 4 বার **লাইন কেটে-কেটে**! **উদ্ধারণপুরের** ঘাটের ঘটনা আপনাদেরকে বলবো পরে, সময় হলে।

এক এক করে এখন বলতে হবে, সেই **৩৮** বছর আগের কাহিনী! কিন্তু পরিসর যে বড় কম! দেখি, সেই **বেটী কী করে**! তবুও আমার কথা বলতে গিয়ে, যদি তার কথা ঢাকা পড়ে যায়, তবে তা' হবে **মহাপাপ**। আসুন, তার কথা বলি। শুধু অনুরোধ যে, **নগ্ন-সত্য ছাড়া**, আমি অন্য কিছু বলতে শিখিনি সারা জীবন। মাথা নোয়াইনি কারুর কাছে, আজ ৬২-টা বছর। **কোন রাজনৈতিক পার্টির কুত্তাও আমি নই**।

আমার এতটাই **অহংকার** যে—আজ থেকে ১ বছর ৪ মাস আগে, আমি যখন **Retire করবো**; তখন মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের **রেজিস্ট্রার-জেনারেলকে**, আইনটা গিলিয়ে দিয়ে; মাথা **নীচু করে** বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলাম; **আমার রুম থেকে**। আর সে শক্তি যুগিয়েছিল আমার **দিদা-দুর্গা**, আমার **মা নর্মদা**, আমার অন্তরতম বন্ধু তথা বিশ্বপিতা **গাঁজাখোর শিব**; যাকে আমি প্রতিদিন সেই মন্ত্রে অভিষিক্ত করি—**ওঁ জুং সঃ শিবায় সুন্দরায় নীলকণ্ঠায় নমঃ**" (আমি সেই শিবসুন্দর নীলকণ্ঠকে প্রণাম করি)।

আরও বলি যে—মূর্খেরা আমার **লেখা পড়ে না—পড়তে পারে না**। পণ্ডিত-মূর্খেরা ভয় পায়, আমার **লেখা পড়তে**। আমার লেখায় কারুর যদি allergy-থাকে, তবে করজোড়ে বলি—**তিনি দূরে থাকুন**। আমার **দোলনা দোলাবে** সেই বেটী, ওই শতাব্দী

প্রাচীন বটের ডালে; সেই ঘুমপাড়ানী গানে :—

"জাগৃহি। মা প্রস্থিতঃ নিদ্রাঘোরে!

বৎস, অহমেব হি নিদ্রাঃ, নির্দ্দয়া নাহম্ কদাচিতম্;

ভজ মাম্—মামেকং ব্রজ। নাস্তি দূরে সা ব্রজভূমিঃ ।"

[জাগ্। ঘুমে ডুবে থাকিস না। খোকা, আমিই তো সেই **মহামায়া নিদ্রা**। (ঘুমে ডুবিয়ে রেখেও, **জাগতে বলি** তোদের!) আমাকে কী বড় দয়াশূণ্যা ভাবিস (তোরা)? না আমি তা' নয়! আমি যে নিয়ে যাবো তোদেরকে সেই **ব্রজভূমিতে**—তা' মোটেই **দূরে নয়**। (সেখানে যে **গোঠের রাখাল কানু** (কৃষ্ণ-কান্হাইয়া) অনুক্ষণ খেলা করে বেড়ায়!]

আর, অন্য কথায় বলতে গেলে, বলতে হয়—

— I will take thou to that wonderland (Brajabhumi), a Cow-boy (Krishna) whither rules the whole Universe, with his magic-wand like flute. (বেণুবীণা)!

সোমানন্দ অবধূত



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

পঞ্চ ম-কার : বেশ্যা-বেশ্যাবাড়ী

বেশ্যা কথার মানে ঃ—

(ক) শরীর দিয়ে শরীর বানাই আমরা—প্রাণীরা। এবার সেখানে Telephone-এর মতো, যেই একটা Sim-card **ভরে দেয়** ভগবান-ব্যাটা, তখন **ট্যাহঁ-ট্যাহঁ** করতে করতে বলি—''আম্মু আইচি গ' ত্যুদের ঘরকে, মেয়াঁটো হঁয়্যা। আম্যাখে ত্যুরা কোলে লে ক্যানে!'' কোলে তুলে নিই তখন আমরা পরম আদরে—**তাকে লক্ষ্মী বা দুর্গা** ভেবে। তার কল্যানে **সংসারের হাল** ফিরে যায়—কারুর কারুর। ভগবানের **লিঙ্গ নাই—যোনীও নাই**। সে যেমন পারে **তেমন সাজে**। আমরা তখন তার নাম দিই—**ছেলে বা মেয়ে**।

এই **শরীর দিয়েই** আবার সত্যিকারের **সিদ্ধসাধকেরা**, ভগবানকে ধরে ফেলে **পঞ্চ ম-কারের** মাধ্যমে। আর তখনই লাগে তার **বেশ্যা**। যে সব **'অপকম্ম'** আমরা করি বনে-বাদাড়ে, লোকচক্ষুর আড়ালে— সেটা দেখলে **গোলা-পাবলিক** মেরে **হাড়-গাঁড়** দুটোই ভেঙ্গে দেবে, শাক্ত-সাধনা যাবে চুলোয়। অথচ চন্দ্র-সূর্য্যের মত, পদ্ধতিটা **সত্য এবং মজাদার**।

(খ) আসুন-**বেশ্যা কথাটাকে** একটু চুলকে দিই, দেখি ওই **চুলকানিটা** কতটা কানাকানি বা টানাটানি করে! সংস্কৃত **বিশ্** কথা থেকে এসেছে **বেশ্যা** কথাটা। **বিশ্ শব্দের অর্থ** আর্য্য বা উচ্চশ্রেণীর জনগণ। এদেরই **ভোগের সামগ্রী** ছিল, নিম্নবর্গের মেয়েরা। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে হয়—**পতিতা**। শব্দটার **ব্যুৎপত্তির** ভুলে **"বিশ্যা"** হয়ে গিয়েছে **বেশ্যা**। বিশ্যার অর্থ **'রামা'**। এর আবার বিশেষ অর্থ হলো **'নগ্না নারী'**। চলতি কথায় **বেবুশ্যা বা বারাঙ্গনা বা বারবণিতা**। গেরস্থবাড়ীর বৌ-ঝিকে ডেকে, **পঞ্চ ম-কার** করতে বললে, ওরা ঝাঁটা-পেটা করবে। কিন্তু **বেশ্যারা পয়সা নিয়ে**—ভগবান ধরবার **ফর্মূলা** বাৎলে দেয়—**ওদের ওই শরীরটা** দিয়ে।

(গ) এবারে শাস্ত্রের দিকে **উঁকি মারি**। সাধুবাবারা কী বলেন, **সেটা চেখে নিই**। না হলে মনের ভেতরটা **উস্‌খুস্** করবেই।

''নটী, কপালিনী, বেশ্যা, পুক্কশী, নাপিতাঙ্গনা,
রজকী-রঞ্জকী চৈব সৈরিন্ধ্রী চ সুভাষিণী,
খটিকা-ঘটিকা চৈব তথা গোপাল-কন্যকা;
বিশেষ বৈদগ্ধ্যযুতাঃ সর্বাঃ এব কুলাঙ্গনা।'' ... শ্যামারহস্যম্ (Page - 294)

[নটী (Dancer), কাপালিকা (Tantrik woman with scull), বেশ্যা (Pros-

titute), পুক্কশী (Butcher-woman), চণ্ডালকন্যা (নমঃশুদ্র), নাপিতের মেয়ে (Barbar's woman) রজকী-রঞ্জকী (washerman's woman) সৈরিন্ধ্রী (Beauty-Parlour Girl), খটিকা-ঘটিকা (বেদেনী = Hippi-class) কিংবা গোপাল কন্যা = গোয়ালিনী (Cowkeeper's woman)—এরাই সাধনসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত।]

টীকা ঃ— সাধকেরা এদেরকে রমণ করে, ভগবানকে ধরবার জন্য। আবার মা বলেও সম্মান জানায়। তাদের বিচারে ওরা শক্তি স্বরূপা এবং দশ মহাবিদ্যার আবরণ শক্তি। রমণ করবার আগে এদের পূজা করা হয়, মা-কালীর মর্য্যাদা দিয়ে। রমণ করার পরেও এদের প্রণাম করতে হয়। ব্যাপারটা উদ্ভট হলেও—উদ্‌ভ্রান্ত হবার দরকার নাই। পঞ্চ ম-কার পদ্ধতির উপাদান এবং অঙ্গ এরা। এদের ছাড়া, সাধনা চলে না। সাধনসঙ্গিনী না পেলে, এদেরকেই ভাড়া করতে হয়, রাতের পর রাত। তখন এদের আমরা বলি বেশ্যা, ভৈরবী বা বাউলানী!





আমি : বেশ্যা পাড়ার দিনরাত

আমার অতি ছোটবেলায় যখন সোনাগাছি বেশ্যাপাড়ায় থাকতাম, তখন দেখেছি অনেক গোপনকর্ম, যা সাধারন মানুষ জানে না। যা শুনলে পিলে চমকে যাবে, সেই কথাই বলবো এখন। যূথী মাসীর খাস-চ্যালা ছিলাম আমি, সন্ধ্যে থেকে সকাল ন'টা পর্য্যন্ত। রাতের বেলায় বহু উঁচু-দরের মানুষকে, আসতে দেখেছি তার কাছে পঞ্চ ম-কার করতে; গোছা-গোছা নোটের বিনিময়ে। তৎকালীন নোটগুলো ছিল আবার, আড়ে-লম্বায় পেল্লায় গোছের।

মদে টইটম্বুর হয়ে টলতে টলতে, দু'জনে ল্যাংটা হয়ে সঙ্গম করতো। আর আমাকে মন্ত্রধারকের মত, সমানে মৃদুস্বরে চেঁচাতে হতো—ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং, হুং হুং, হ্রীং হ্রীং কালিকে—ক্রীং ক্রীং ক্রীং, হুং হুং, হ্রীং হ্রীং নমঃ। ওরা সঙ্গম করতে করতে ওই মন্ত্রই বলতো। বৈষ্ণব বা বাউল মন্ত্র, কালীমন্ত্রের থেকে আলাদা। তা সে যে মন্ত্রই হোক, সেটা আওড়াতে হবে, রমণের দোলার সাথে সাথে। এমন একটা সময় আসবে, যখন কুণ্ডলিনী শক্তি জেগে উঠে, দৌড়াবে শিরদাঁড়া বেয়ে— মাথার খুলির দিকে সহস্রারে। বীর্য্য ঢেলে দেওয়া চলবে না যোনীতে। ভুল হলে—ব্যাপারটা দাঁড়াবে, আগুনে জল ঢালার মতো। ভগবানকে ধরার ফালতু চেষ্টা হবে তখন।

পর্দার আড়ালে বসে বসে নামতা পড়ার মত, আমি মন্ত্রটা আউড়াতাম। আর ওরা তালে তালে রমণ করতো। একদিন হঠাৎ ঝাঁটা পেটার শব্দে, আমিই মন্ত্র ভুলে গেলাম। বুকের উপর থেকে ফেলে দিয়ে, মোটা মাপের খদ্দেরটাকে, তার বুকের উপর পা দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে—ঝাঁটা মারছে তাকে যূথীমাসি।

আর তাকে বলছে, "খান্‌কীর ছেলে, মাই দেখে মন্ত্র ভুলে গেলি? .... দেখে 'খুটা' দাঁড়ায় না কেন তোর? বল্ শালা কুত্তার বাচ্চা, মন্ত্র বল! তোকে একদম কাঁচা-কাঁচা খেয়ে ফেলবো।" যূথীমাসীর সেই উগ্র রূপ এখনও মনে আছে আমার। উলঙ্গ জ্যান্তকালী যেন, উলঙ্গ শিবকে বুকে পা দিয়ে রগড়াচ্ছে। শিব কাৎরাচ্ছে তার পায়ের তলায় মাল-গাঁজা টেনে।

আসল ব্যাপারটা হ'ল এই যে— ২/৩ ঘন্টা রমণ চলবে, আর মন্ত্র জপও চলবে। কোনটাতেই ঢিলা দিলে চলবে না। একেবারে ঠিক যেন — Strike the iron while it is hot. সেই ব্যাটা মারোয়াড়ীর বাচ্চা, মন্ত্রজপ ভুলে গিয়ে, দেহজপে মন দিয়ে মৌতাত উপভোগ করছিল তখন। এই 'অনাচার' যূথীমাসীর মোটেই সহ্য হয়নি। ওই নাটকের শেষে, দু'ঘা ঝ্যাঁটার মার আমাকেও দিয়ে যুথীমাসী বলেছিল—ফেলে দিয়ে আয় বাইরে! শালা কুত্তার বাচ্চা, মা কালীকে ধরতে এসে, মাগীর ...... দেখে মন্ত্র জপ ভুলে গেছে?"

মাটির প্রতিমা : বেশ্যাবাড়ীর মাটি

এই **যূথীমাসী** যখন কচি কচি বেশ্যাদের নিয়ে, **গঙ্গার ঘাটে** যেতো চান করতে, তখন আমি যেতাম **সেপাই সেজে** তাদের সাথে। রাতের পাপ ধুয়ে, স্নান সেরে ফেরার পথে, সবাইকে নিয়ে আসতে হতো **কিলো খানিক করে গঙ্গামাটি**। সেই মাটি উঠোনে জমা হতো **গামলার আকারে**, ভেতরটায় থাকতো তার **গর্ত্ত বা খোঁদল**। সেখানটাতে ঢালা হতো **মাসিকের রক্তের ন্যাকড়া**, আর রমণের পর **লিঙ্গ আর যোনী ধোয়ানো জল**। প্রতিদিনই চলতো এমন **এক পবিত্র** কাজ।

কয়টা দিন পরে, আবার যখন **নূতন মাটি** আসতো, তখন ওই **পূরানো মাটি** শুকিয়ে পুঁটলী করা হতো ১ কেজি, ৫০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম করে করে। সেটা চলে যেতো **পোটো-পাড়ায়**—যারা ঠাকুর গড়ে তাদের কাছে। আর যেতো **দশকর্ম** ভাণ্ডারে, **পুরিয়া** বাঁধার জন্য। শুয়োরের ছানা বামুনের ব্যাটারা, কেন যে **পূজার ফর্দ্দমালায়** ওই **বিদ্‌ঘুটে "বেশ্যাবাড়ীর মৃত্তিকা"** বস্তুটি লেখে; জনগণের **উর্ব্বর আর আধুনিক মাথায় তা**' ঢুকে না। যে ঠাকুরকে নিয়ে এত **ভক্তিশ্রদ্ধা**, তার মালের সাথে কেন ওই **উদ্ভট মাল**? কন্ ত' দেহি, হালায়—ক্যূন্ হালায় **শাস্তর্‌খান্ বানাইসে**?

আমি বলি কি, **শাস্ত্রটা** একটু ঘাঁটুন না ভাই। উত্তর পাবেন। শাস্ত্রের আর বামুনের মুখে **ঝ্যাঁটা মারবার আগে**, নিজের ওই মূর্খের পাণ্ডিত্যকে **ঝেঁটিয়ে** বিদায় করুণ।

শিব : আনীয় প্রমদাং মত্তাং দীক্ষিতাং যৌবনান্বিতাম্,
স্বকান্তাং পরকান্তাং বা ঘৃণালজ্জাবিবর্জিতাম্,
প্রাংমুখেনোপবিষ্টস্তু নিশায়ামর্দ্ধরাত্রকে,
হেতুযুক্ত সতাম্বুলং দত্ত্বা ন্যাসান্ বিধায়চ;
মৌলৌ কুন্তলকর্ষণং নয়নয়োরাচুম্বনং গণ্ডয়ো—
র্দন্তেনাধরপীড়নং হৃদিহতির্ম্মুষ্ট্যা চ নাভৌ ভগে।
কক্ষাকণ্ঠকপোলমণ্ডলকুচশ্রোণীষু দেয়া নখাঃ,
সীমন্তে লিখনং নখৈরুরসিজং গৃহীত গাঢ়ং ততঃ:
কুর্ব্বীতাভিরতং মনোভবগৃহে মাতঙ্গলীলায়িতং—
জঙ্ঘাঙ্গুষ্ঠপদৌরু গুল্‌ফহননং চান্যোন্যতঃ কামিনোঃ;
ব্লুং ক্লীং স্ত্রীং ক্লীং দেবেশি দ্রাবিণী বীজমুত্তমম্,
তস্যাং যোনৌ ন্যসেদ্বিদ্যাং মৈথুনং কারয়েৎ—প্রিয়ে!

শুদ্ধ মন্ত্রৌষধৈনৈব যোনি প্রমথনং চরেৎ।
মথ্যমানে পুনস্তস্যাং জায়তে তত্ত্বমুত্তমম্—
গৃহ্নীয়াৎ তৎ প্রযত্নেন দ্রব্যং কুণ্ডোদ্ভবম্ শুভম্,
নিঃশঙ্কমাহৃতং দ্রব্যং গৃহীত্বা তেন পূজয়েৎ—
সান্নিধ্যং জায়তে দেবি, সর্ব্বকামমুপালভেৎ;
কুণ্ডোদ্ভবামৃতং দ্রব্যং কথিতম্ দুর্লভম্ ময়া।
, ... শ্যামারহস্যম্ (পৃঃ ২৮৬-৮৭)

শিব : [নিজের বউ হোক, বা পরের বৌ হোক—মাতাল, দীক্ষিতা, যৌবনা, ঘৃণা-লজ্জা-ভয়হীনা নারীকে এনে, মাঝরাতে (12 pm) তার সামনে বসে, উত্তেজক এক খিলি পান তার মুখে দিয়ে—তাকে ন্যাস্ (touch) আর পূজা (worship) করতে হবে—**ঐং হ্রীং চপলে চলচ্চিত্তে রেতো মুঞ্চ মুঞ্চ (স্বাহা)**—এই মন্ত্রে। তার যোনীতে লিখতে হবে—"**ব্লুং ক্লীং স্ত্রীং ক্লীং দেবেশি দ্রাবিণীম্ নমঃ**"—এই বীজমন্ত্র। তারপর তাকে করতে হবে **উদ্দাম রমণ**।

ফলতঃ, **প্রমথিত সেই যোনী** থেকে ঝরে পড়বে বা উজিয়ে উঠবে "**উত্তম-বস্তু**"। এরই নাম—**কুণ্ডোদ্ভব দ্রব্য** (মাসিকের + বীর্য্যের সংমিশ্রিত এক **যৌনরস**)। ওই **পবিত্র বস্তু**, বড় যত্নে ধরে রাখতে হয়! না, ভয় নাই—**মায়ের পূজায় তা'** দেওয়া হবে বলে! ওই দিয়ে পূজো (আর হোম) করলে, মহাকাল-মহাকালিকার খুব "**কাছের মানুষ**" হওয়া যায়, এবং যা কিছু চাই—তা'ও পাওয়া যায়। **কুণ্ডোদ্ভব দ্রব্যের** (মাসিকের রক্ত আর পুরুষের বীর্য্য) এই যে সীমাহীন কার্য্যকারিতা, তা' তোমাকে আজ বললাম। বড় **দুর্মূল্য** জেনো ওই বস্তুটি দুর্গা!]

শাস্ত্র থেকে, লিখে দিলাম এই কথাগুলো। এবারে কী বুঝতে পারলেন, কেন **বেশ্যাবাড়ীর** মাটি লাগে সব পূজোয়? কিন্তু কী ভাবে **লাগানো হয়** (Multiple Use) ও'টা? জেনে নিন ঃ—

A) মূর্ত্তির মাটিতে ব্যবহার করে প্রথম **পটুয়া বা মূর্ত্তিকার**। সেই মূর্ত্তিতে যত বেশী পরিমাণ ব্যবহৃত হবে ওই বেশ্যাবাড়ীর মাটি, **মূর্ত্তির দাম বাড়বে** ততোধিক! পাঁচ-টাকার ঠাকুর তখন বিক্রী হয়, পঞ্চাশ হাজার বা দেড় লাখে; কেন না—ওখানে ওই বস্তু **মিশানো হয়েছে বহু পয়সার বিনিময়ে!** মূর্ত্তির দাম ঠিক হয় না কোনদিন, তার শিল্প-সৌন্দর্য্যের জন্য! ঠিক হয়—**বেশ্যার গাঁড়ের রস, আর বখে-যাওয়া-ছোঁড়ার বীর্য্যের** কতটা অনুপাত (Ratio) আছে—সেই তার মাত্রার উপর!

B) দ্বিতীয়ত ঃ ব্যবহার হয় ব্রাহ্মণের মাধ্যমে। (ক) বেশ্যাবাড়ীর মাটির গুঁড়ো ব্যবহার হয়—**নৈবেদ্যে, (খ) কোশাকুশীর জলে**—এক চিমটে। (গ) হোমে—এক চিমটে, যার প্রকৃত **মানে বুঝে না**, নাম সই করতে না পারা **পূজারী নিজে**! ছাগল-গোরু বাঁধা পাঠশালায় যারা পড়ে— তারা ওই সব জানার আগ্রহ দেখায় না। (ঘ) বাপ-ঠাকুর্দার মরার পরে—**উত্তরাধিকারে** যখন পূজারীর চেয়ারে বসে সে; তখন ভগবানকে জানবার **আগ্রহ তার থাকে না**। থাকে— ভাগ্যবান্ কোন **পার্টির কুত্তাকে** চেনবার আগ্রহ! বালের সংস্কৃত ভাষা বুঝে লাভ কী? অমুক পার্টির তমুক্ **'খোচর'** আমার **মায়-বাপ! ভগবান্ হ'লো কুত্তার বাচ্চা**!

চোর-চোর মেনিমুখো বামুন

ব্রহ্মকে যিনি জানেন—তিনিই ব্রাহ্মণ। ঠাকুর পূজা করে পেট চালায় যারা, তাদের লেখাপড়ার **দরকার হয় না**। অস্পষ্ট উচ্চারণ করে, শুধু **ং , ঁ** লাগালেই হলো, যে কোন কথার পেছনে। একটা উদাহরণ দিই। যেমন ধরুন যে, একটা শাড়ী দেওয়া হয়েছে ঠাকুরকে, যেটা পূজার শেষে পাবে বামুন; আর তার বাড়ীর মেয়েরা পরবে সেটা। কিন্তু পূজারীর সেটা পছন্দসই হয়নি।

মনে মনে গজরাতে গজরাতে, সে বলতে লাগলো, "**শালাং শুয়োরের বাচ্চাং, একটাং এমনং বস্ত্রং দিয়েছেং, যেটাং কোনং মানুষং পরতেং পারবেং নাং। ওদেরং সর্বনাশং হোকং।**" আয়োজক **ওই মন্ত্রেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে** যাচ্ছে, বুঝছে না সে কিছুই **তার মানে**। পূজার সত্যিকারের মন্ত্র তখন **পালিয়েছে**। কেন না, ওই বামুন তা' জানে না—**শেখেওনি**। বাপ-ঠাকুর্দার মরার পর, সেইই এখন পূজার কাজ করছে কিনা! স্কুল-কলেজের বারান্দায়ও, উঠবার তার **দরকার হয়নি**!

এবারে উপরের ওই মন্ত্রের **'ং'**-গুলি সরিয়ে দেখুন—কী ব্যাপারটা দাঁড়ালো, আর কী মন্ত্র পড়ালো বামুন! পড়ালো এই যে :—"**শালা, শুয়োরের বাচ্চা, একটা এমন কাপড় দিয়েছে—যেটা কোন মানুষ পরতে পারবে না। ওদের সর্বনাশ হোক।**" এবারে কী বুঝা গেল যে—কা'রা পূজা করে, আর কা'রা পূজা করায়? মা-কালী আর বাবা কেষ্টর দয়া কী, মিলবে **ওই রকম পূজোয়**? তাই বলি—**গেরুয়া কাপড়** দেখলে গলে যাবেন না! **সাধুর বেশে ওর ভেতর, আমার মতো চদুরাম বাস করে।**



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

আসল ব্যাপার : শাস্ত্র যা' বলে

বিজ্ঞানকে বুঝতে গেলে, **বিজ্ঞানী হতে হয়**। বিশেষ ফলিত জ্ঞান বা (Practical knowledge) না থাকলে, বিশ্বপ্রকৃতির **রূপরেখাকে** চেনা যায় না। ধরা যায় না তার মালিককেও—যার নাম আমরা দিয়েছি **ভগবান বা ভগবতী**। কী তার **সংজ্ঞা**? সেটা হলো—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতি স্মৃতঃ।"

মানেটা হলো :- ১) ঐশ্বর্য্য (Wealth), ২) বীর্য্য (Heroism), ৩) যশ (Fame) ৪) সৌভাগ্য (Fortune), ৫) জ্ঞান (Deepest Knowledge), ৬) বৈরাগ্য (Indifference/Stoicism); এই **ছয়টা গুণের** অধিকারী বা অধিকারিণীকে **ভগবান্-ভগবতী** বলে। **গামছা-পরা পুরোহিতকে** জিজ্ঞেস করলে, এর উত্তর মিলবে না—বুক ঠুকে এ' কথাটা বলতে পারি।

পণ্ডিতে অবশ্য বলতে পারে এ'সব। কিন্তু পণ্ডিতকে কেউ তো আর, **পূজা করতে** ডাকে না, আর সে—ও'সবে যায়ও না। অগ্যতা Real ভাতারের অভাবে, নাত-জামাইয়ের কোলে শুতেই হয়—তাকে **ভাতার ভেবে**। শরীরীসুখ মেলে তার কাছে বটে—**সোহাগ** আর **সহমর্ম্মীতা** মেলে না। অজ্ঞ পূজারীর পূজাও তেমনি। অনুষ্ঠান হয়—উৎসব হয়— খিচুড়ী হয়; পাড়ায় পাড়ায় উদ্যোক্তাদের **ফুটানীর লড়াই চলে**—চাঁদার **জুলুম** চলে; কিন্তু ঈশ্বর ভদ্রলোক তখন, **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কেটে পড়ে**; কান-ফাটানো মাইকবাজা **পূজা-প্যাণ্ডেল** থেকে।

পাথরে বা মূর্ত্তিতে **ঈশ্বরের ছায়া**, কখনো কখনো পড়ে মাত্র **ক্ষণিকের জন্য**, ঠিক মতো তাকে ডাকতে পারলে। কিন্তু এটা কী জানেন যে, সে ঘুরে বেড়ায় **মানুষ-মানুষীরূপে তীর্থে তীর্থে**? শুধু তাকে চিনতে **শিখতে হবে**। কেমন সে চেনা? সে চেনায় পাওয়া যায়—**এক সারি বুভুক্ষু মুখ, বিনির্মল হাসি ছড়ানো মুখ, কান্না-ভেজা চোখ**। আর একতারা-বাজা বাউলের সুরে সুরে, যখন কাশফুলে হিন্দোল জাগে; সেখানে উঁকি মারে আরো একটা মুখ। সে বলে :—

"অহং রাষ্ট্রী সংগমণী বসুনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্"।।

...... (ঋগ্বেদ, ১০ম ম./১০ম অনু./১২৫-সূ)

[আমিই তো **জগতের মা**। আমাকে খুঁজে ফিরছিস বুঝি? আয় তবে দেখিয়ে দিই **আমি কে!** আমিই দিই **ধনরত্ন** তোদের। আমিই নিয়ে যাই তোদেরকে **ব্রহ্মের কাছে**। আমি আর ব্রহ্ম তো **একই রে!** ওই যে **যজ্ঞের আহুতি,** কেমন করে **আমার কাছে এসে পড়ে দেখ!** আমিই তো সব। আমি কাশে আছি— আকাশেও আছি, পথে আছি—পাথারে আছি—**আছি পাথরেও**। সব ঠাঁই আমাকে দেখতে পাবি তোরা। **সব প্রণাম এসে পৌঁছায় আমার কাছে!** (Translated in **Active voice**, to be **in tune** with the Mantram)]

নোংরা তন্ত্রশাস্ত্র, আমার বাবা সারদাচরণ লেখেনি

এত যে বুলি **কপচাচ্ছি,** শাস্ত্র থেকে **উদাহরণ** টানছি, এগুলো কিন্তু আমার মৃতপিতা বা তার পিতা লেখেনি। লিখেছে মহাজ্ঞানী মহাজন **আর্য্য ঋষিরা**। আর আমি জেনে বা না জেনে—শিখে ফেলেছি কিছু কিছু তার। আরও জানতে জানতে এগিয়ে চলি, **বীরভূম-বর্দ্ধমানের পথে-প্রান্তরে,** মধ্যপ্রদেশের **বিন্ধ্যা-সাতপুরা পর্বতের গহন-গভীর অরণ্যে;** পবিত্রা **নর্মদার তটরেখা ধরে**। তন্ত্রের **প্রয়োগরূপ** শিখি ঋষি-মায়েদের কাছে; ঋষিপুরুষদের কাছে—পাহাড়ের গুহায়, গাছের কোটরে কোটরে; বাঘ-ভালুক-সাপ-বিছে-কুমীরের **ভয়কে উপেক্ষা করে**।

আজ থেকে **৩৮** বছর আগে, এসে পড়েছিলাম এই **অট্টহাসপীঠে না জেনে**। আজ আবার এসেছি **সে বেটীকে জেনে,** মড়ার মাথার খুলিতে সে কেমন করে **পান করে রক্ত**। শিয়াল সেজে **মড়া চিবোয়** শ্মশানে-মশানে কেমন করে। রাতের নিরালায় শ্মশানভূমিতে, অথবা খাঁ-খাঁ রোদ্দুরের বুকফাটা তেষ্টায়, **কারণ পান** করে **মড়ার হাত-পায়ের হাড়** নিয়ে, কেমন করে চলে তার—**গুজরাটী কাঠি-নাচ,** ভূতপেত্নিদের সাথে। মড়ার খুলিতে সে কেমন করে আবার, **বসিয়ে দেয়** উড়ে যাওয়া প্রাণটাকে; পেছনে ফিরে তাকেই দেখাতে, তার অতীত **জীবন আর যন্ত্রণা!**

জাগতিক দিকের অনেক পরিবর্ত্তন হলেও, **অট্টহাসিনীর অট্টাহাস** তেমনই থেকে গেছে আজও। **৩৮** বছর আগের সেই **সাধনার চিৎকণা,** হঠাৎই embodied হয়ে, ঘুরে বেড়িয়েছে **রাতের আঁধারে** তার বনভূমিতে; যখন **নতুন ভক্ত-আগন্তুক** ভেবে এক এক

করে; আমাকে দেখাচ্ছিল **অসীম মহারাজ**। দুর্ভাগ্য এই যে—সেদিন ছিল না আর এক মহারাজ, যার নাম **রামজী**। দেখা হয়নি তার সাথে সে সময়!

বড় **কষ্ট হলো** এই জেনে যে—সে বেটীর কথা **জানে না কেউ, লেখেনি কেউ**। আর সে ভার তুলে নিয়েছি **নিজের কাঁধে**; তাকে চিনিয়ে দিতে **মানবীরূপে, শেয়ালরূপে, স্বর্ণগোধিকা রূপে**; আর পরিযায়ী **পাখীর দলরূপে**; অনবরত যাদের গলায়-ডানায় উঠে চলেছে—দূরাগত এক **ঝড়ের আভাস**; মহাকালীর করাল **নিঃশ্বাসের মত**। আর সমস্ত বনভূমিতে উঠছে সেই মন্ত্র বার বার—**ওঁ ঐঁ হ্রীং ক্লীং হ্লীং হ্রীং ক্লীং স্বাহা**! হাজার হাজার ঋষি মানবের পুতঃ ঘৃতাহুতির **বিনম্র আলোয়**, ভরে গেছে মন-প্রাণ-অন্তর!

আমি যা' দেখেছি : ৩৮ বছর আগে

তখন **নকশাল** আমল চলছে। **মারা চলছে** তরতাজা যুবক-যুবতীদেব। পুলিশকে খোলা অর্ডার দেওয়া হয়েছে **গুলি করবার**। প্রতিদিন সকাল বেলার কাগজে, ছাপা হতো গুলি খেয়ে মরা, যুবক যুবতীর **গণ্ডা-গণ্ডা ছবি**। চলছে **মারণযজ্ঞ** উভয়পক্ষের। নকশালরা মারছে **পুলিশ আর অফিসার**; পুলিশ মারছে নকশালদের। খোঁজ চলছে **ঘাপটি মেরে থাকা** নকশালদের। **শ্মশান**, মন্দির, আখের ক্ষেত, বনজঙ্গল—কোথাও আর **বাদ নাই** তেড়ে বেড়াতে। ছাড়তে হলো **বক্রেশ্বরের মহাশ্মশান**। পুলিশ প্রায়শঃই রেড্ (raid) করতো ওখানে।

কখনও কখনও **গোয়েন্দার বেশে**, উপস্থিত হতো ওরা। তরুণ বয়স তখন আমার। হাঁটা-দৌড়ানো, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা—কোন ব্যাপারই **অজানা** ছিল না আমার। পুঙ্খী **কাহার (ডোম)** ছিল আমার, মাল-গাঁজা খাওয়া **চ্যালা**। দোতলা **বাস-মার্কা** সিগারেট, ছিল তার খুবই প্রিয়। একদিন হঠাৎ সে দু'কানে গুঁজে এলো, একটা করে **Cool সিগারেট**। তারপর চিতার আগুনে দু'টোকে পুড়িয়ে নিবেদন করলো একটা আমাকে, আর একটা নিজে টানতে টানতে বললো, "গলাটো শালা এখন **ঠাণ্ডা হলঁ বটে**। উদিক্ পানে র‍্যাড় (Raid) হঁইছে গ' মহারাজ! চলেন্ ক্যানে পলাইঁ যাই হেথাকেখিকা? উ শালারা মনিস্যি ল্যয় গ'!"

—— কোথায় রেড্ হচ্ছে? খবরটা তোকেই বা দিল কে?

—— সি **মেঁয়াটো** বুল্ল বটে! তাখে তিনটা পুলুস **বলৎ করাঁ**, নাম গুলান্ জান্‌তে চাইলঁ যেে! উ বুলে লাই আমাদ্যের নাম।

—— তবে তো পালাতেই হয় **পুংখী**! তুই ওকে একটু দেখিস্! বেচারী আমাদের জন্য **কত করে বল্**? না খেয়ে খাওয়ায় আমাদের!

—— সি কী মহারাজ? আম্মু থাকব লাই গ' ই শশ্যানে! আমাক্যে সাঁথে লও ক্যানে! উ মেঁয়েটোঁ আর এক জনের কাছে চলেঁ যাবেক!

—— তা' হয় না **পুংখী**। আমার জীবন বড় কষ্টের। তুই স্থানীয় ছেলে। তোকে সবাই জানে চেনে। তোর বিপদ কম। আমাব সাথে থাকলে **পুলিশের মার খাবি**। জড়িয়ে পড়বি নানা ঝামেলায়!

চিতার আগুনের লাল আলোর ঝলক, পড়ছে **পুংখীর** মুখে। আকন্দ আর ভেরেণ্ডা গাছের ঝোপের আড়ালে, একটা **সড়সড় শব্দ** হলো। মনে হলো— আধ-পোড়া মড়া খেতে আসছে **শেয়ালেরা**। খুবই হিংস্র হয় ওরা। দু'চারটা **পাগলা শেয়ালও** থাকে। ভয়ে একটা জ্বলন্ত চ্যালা কাঠ, চিতা থেকে তুলে নিল হাতে **পুংখী**। তারপর কি যেন দেখে, আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল, কাঠটাকে **সেই চিতায়**।

তারপর এক আবছা ছায়ামূর্ত্তিকে জাপটে ধরে, **কাঁদতে লাগলো** ঝরঝর করে। কাছে গিয়ে দেখলাম—আর কেউ নয় সে—**লক্ষী**। দু'ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে পড়ে **শুকিয়ে গেছে**। ফোলা ফোলা মুখ তার। বুকের কাপড় সরে যেতে দেখলাম, সেখানেও **আঁচড় কামড়ের নির্দ্দয় চিহ্ন**। শক্তপোক্ত **সাঁওতাল** মেয়ে সে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে , যেন **জ্যান্ত একটা মড়া**, সারা শরীর তখন তার টলছে। তাকে ধরে আস্তে আস্তে বসিয়ে দিলাম, পাকুড় গাছের গোড়ায়।

ঝোপের ভেতর থেকে **মদের ব্লাডারটা** টেনে বের করে, খানিকটা র'(raw) মাল গিলিয়ে দিলাম তাকে। আমরা দু'জনও খানিকটা করে খেয়ে, **পুংখীকে** বললাম, "মড়া পুড়ানোর দু'টো দল, কয়টা টাকা আর রুটি-লুচি-মিষ্টি দিয়ে গেছে—**সাধু-সেবার জন্য**। আয় আমরা এখন তিনজনে খেয়ে নিই। তারপর ভাবা যাবে কী করা যায়! সত্যিই, ব্যাপারটা বড় **ঘোরালো** হয়ে উঠছে।"

খেতে খেতে লক্ষী বললো, "উদের, ত্যর কথ্যা বুলি লাই মহারাজ। তিনটা পুলুস্ আম্যাখে ছিঁড়ে খেল গ'—তবুও নাম বুলি লাই।" ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম, তার **সীমাহীন সততায়** আর অসম্ভব **সহ্য-শক্তিতে**। পালাতে হবে বক্রেশ্বরের এই মহাশ্মশান থেকে—এখানে আর থাকা চলবে না। রাতের অন্ধকারই ভাল। দিনের আলোয় আমরা ধরা পড়তে পারি, সাধারণ পথ ধরে গেলে। ঠিক হলো—মাঠ ভেঙ্গে, বক্রেশ্বর নদীব তীর ধরে পৌঁছাতে হবে **দুবরাজপুর ষ্টেসনে**। দিনের বেলাটা আখের ক্ষেতে, লুকিয়ে থাকলে চলবে। বর্ষার আসতে দেরী নাই। আষাঢ় মাসের শেষ হতে চলেছে এখন। আকাশে মাঝে মাঝে হানা দিচ্ছে **পাগলা মেঘেরা**।

ব্যাগ থেকে গোটা দুই **'সুগন্‌রিল'** ট্যাবলেট্‌ বের করে, গিলিয়ে দিলাম **লক্ষীকে**। আধঘন্টা পরে রওনা হলাম তিন জনে। সামনে **পুংখী**, মাঝে **লক্ষী**, সবার পিছে আমি। সব পথ চিনে ওরা ভাল মতো। আলো-আঁধারীর জোছ্‌নারাতে, পাড়ি দিলাম আমরা রাত প্রায় আটটার সময়। হাঁটতে হবে প্রায় ১২ কিমি। ভোরের গাড়ীটা পেলেও পেতে পারি। নামতে হবে **সাঁইথিয়ায়**। ওখান থেকে যে কোথায় যাবো, বুঝে উঠতে পারলাম না। পথঘাটও আমার জানা ছিল না। আজকের মতো!

লক্ষী বললো, "ত্যু চল্‌ ক্যানে সাদুবাবা **সাঁইথে**, আমার সাঁথ্যে। উখ্যানের **সাদু মা** আমাকে চিনে বটে!" পুংখী সমর্থন করলো তাকে। বললাম, "ওখানেও তো **পুলিশ** তাড়া করতে পারে! শহরের কাছাকাছি যাওয়াটা কী ঠিক হবে? আখের ক্ষেত, বন-জঙ্গল টুঁড়ে মারছে এমনিতেই পুলিশ! পুংখী বললো, "সি ত' শহর লয় গ'। বন-জঙ্গল আছে— বুঢ়া বটগাছ আছে। রাত্যের বেলাই পুলুস্‌ আসবেক লাই!"

আজ এই কয়দিনে, মড়া পোড়ানো লোকেরা, যে **প্রণামী** দিয়ে গেছে আমাকে; তার পরিমানটা মনে মনে আন্দাজ করে নিলাম। ২৫/৩০ টাকা হবে। তিন জনের চলে যাবে কয়টা দিন ওই টাকায়! মনে মনে নিশ্চিন্ত হলাম। মড়ার হাঁড়ি-কল্‌সিতেই খিচুড়ী ফুটিয়ে নিলেই হবে। শিব আর কালীর চ্যালাদের, **ঘেন্না থাকলে কখনো চলে?**

ভোর হয়ে আসছে, শরীর ক্লান্ত। **লক্ষীর** শরীর আরও ক্লান্ত। নরপশু পুলিশেরা **বেদম ঠেঙ্গিয়ে, বলাৎকার করে** নাম পরিচয় বের করবার চেষ্টা করেছে; আমার আর সঙ্গীসাথীদের। **দুবরাজপুর ষ্টেশনে** পৌঁছাবার আগে, আড়াল গোছের একটা জায়গায়। বিশ্রাম নিতে বসলাম। আমার কাছে **ইমার্জেন্সী** ব্যবহারের জন্য ইঞ্জেকশান থাকলেও, অন্ধকারে কিছু করে উঠতে পারিনি। আবার দু'টো **"সুগন্‌রিল"** ট্যাবলেট বের করে, **P.P.F. (Procain penicillin Fortified) — 4** লাখ ভায়েল একটা দাঁত দিয়ে খুলে; মুখে ঢেলে দিলাম লক্ষীর। ডোবায় নেমে **দু'-আঁজলা জল** খেয়ে নিতে বললাম তাকে। একটু পরে বেজে উঠলো **রেলের ঘন্টা**।

চেপে বসলাম **রামপুরহাটমুখী** ট্রেনে। কয়লার গাদার মধ্যে ঢুকে, বসে রইলাম। ভোরের ট্রেনগুলো ভরে আসে, চোরাই পাথুরে কয়লায়। সাঁইথিয়া ষ্টেশনে ঢুকবার আগে, মাঝপথে নেমে গেলাম আমরা এক নির্জন **সমাধিক্ষেত্রে**। এই দিকটায় লোকজন প্রায় আসে না বললেই চলে। আমাদের তিন মূর্ত্তিকে দেখে, গরু-ছাগল চরানো একটা মেয়ে এসে; বসলো আমাদের কাছে। সেই মেয়ের বাড়ী কাছেই। **লক্ষীকে** অসুস্থ বুঝে, সে তার শুশ্রুষার ভার তুলে নিলো তার কাঁধে। নিশ্চিন্ত হলাম আমরা। খানিক পরে সে এনে দিলো, তিন জনের মতো কিছু খাবার আর জল। পেটটা শান্ত হলো একটু আমাদের। সেই মেয়েটাকে বললাম, "ওকে একটু দেখো তো মা। পুলিশ . . . . করেছে।"

এখান থেকেই নাকি যাওয়া যায়, **আমোদপুর** লাইনের **ছোট ছোট** রেল গাড়ীতে। **পুলিশের** ভয়ে আমরা বেরুলাম না, সেই **সমাধিক্ষেত্র থেকে**। সেই মেয়েটা বললো, "সন্ধ্যের মুখে একটা গাড়ী আছে"। **স্থির হলো**—রাতের আঁধারেই পার হবো আমরা, এই জায়গাটা। বিকালের দিকে একজন লোক এলো। সে বললো, "**লাভপুরের ফুল্লরা মন্দিরের শ্মশানে**, পুলিশ রেড্ করে ৪/৫ টা **সাধুকে** ধরে নিয়ে গেছে; **নকশাল** সন্দেহে।" বুকের ভেতরটা **কেঁপে উঠলো** গোপনে। গাঁজা প্রসাদ পেয়ে একটু পরে সেই লোকটা চলে গেল, সমাধিতে ধূপদীপ জ্বালিয়ে; একটা **গোপন রাস্তা** দেখিয়ে দিয়ে। রাত্রে এখানে কেউ থাকে না ভূতের ভয়ে! দিনের বেলায় থাকে রাখাল-বাগালেরা, গরু-ছাগল চরায়।

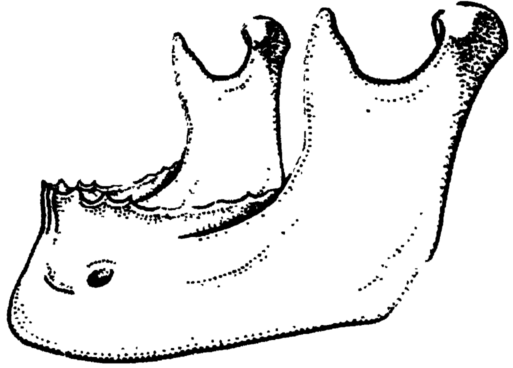
স্থির হলো—**লাভপুরে** নামার দরকার নাই। একেবারে আরও তিন চারটা ষ্টেশন বাদে নামবো, **পাঁচুণ্ডী** বলে একটা ষ্টেশনে। সেখান থেকে প্রায় 8 কিলোমিটার হেঁটে গেলে, আমরা পাবো **অট্টহাস মহাপীঠের মন্দির**। পুলিশের ওদিকে যাতায়াত নাই। তাছাড়া ওখানে ক্যানালের (কাঁদর = খাল) ওপারে মন্দির। ডিঙ্গিতে চড়ে নাকি পার হতে হয়ে ওপারে। নির্জ্জন এক বিরাট বনভূমি আছে সেখানে, **লুকাবার উত্তম জায়গা একটা**। লক্ষী আর পুংখী, গড়গড় করে বলে গেল সব। মনে মনে বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

কু-ঝিক্-ঝিক্ করে এলো ট্রেন। চেপে বসলাম তা'তে। রাতের অন্ধকারে হঠাৎই দাঁড়িয়ে গেল গাড়ীটা। পুলিশের চেকিং চলছে সেখানে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিলাম, ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নেমে। ট্রেনটা ছেড়ে গেল একটু পরে। লক্ষী আর পুংখীকে খুঁজবার আর **সাহস হলো না**। কারণ তিন রাউণ্ড গুলির শব্দ, তখন বুকের রক্ত **হিম করে দিয়েছে**। কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ালাম মেঠো পথ ধরে। জানি না তখন কোথায় যাচ্ছি! তবুও পালাতে হবে প্রাণ নিয়ে।

কাউকে জিজ্ঞেস করার সাহসও হলো না, দরজার কড়া নেড়ে। বুঝতে পারিনি কোথায় নামলাম। এগিয়ে চলেছি সামনে, তেষ্টায় ফাটছে বুক। ডানপাশে একটা দীঘি পড়তে, নেমে জল খেলাম আঁজলা ভরে ভরে। একটু ধাতস্থ হলাম বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। বিরাট এক বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে দীঘিটার পাড়ে। গোড়ায় তার বিশাল ঝোপ—**ভাঁট-পিটুলী আর নাটা করঞ্জের**। আলো-আঁধারীতে মনে হলো, কেউ যেন হেঁটে আসছে আমার দিকে। ভাবলাম—**পুলিশ** হয়তো . . . . পুলিশ হয়তো আসছে, আমাকে ধরতে!

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জাপটে ধরলাম ত্রিশূলটাকে। ধরা পড়ার আগে, মেরে দিতে চাই ওকে! সেই ছায়ামূর্ত্তি মেয়েলী গলায় বলে উঠলো, ''ভয় লাই। সুমুখ্পানে যা' ক্যানে। **ঈশান কাঁন্দর্** পার হঁবি। উখ্যাণে ক'টা দিন্ ত্যু থাকবি, **লয়ঁন্-বাবার চিকন্ মার** ঠেঁই—ত্যুখে সি সব দেখাই দিবেক! ই হাড়টো ত্যুর্ মাথায় লে ক্যোনে চূড়ার পারা, হাঁটতি লাগ্ ত্যু।" চূড়া করে পরালো সে, হাড়টা আমার মাথায়। দু'কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকলো, তার কিছুটা অংশ দু'দিকে।

❀ এই রকম একটা বিরাট চোয়ালের হাড়, মাথায় চূড়ার মত নিয়ে, পার হয়েছিলাম **ইশান-নদী (কাঁদর)।**



হতচকিত অবস্থা থেকে, কোনরকমে জেগে উঠে. **বোবা-গলায়** জোর করে শব্দ এনে বললাম, "তুমি কে মা? এত রাতে এখানে দীঘির পাড়ে কেন তুমি? ল্যাংটা কেন তুমি? এ জায়গাটার নাম কী মা? যেখানে যেতে বললে, সেটারই বা কী নাম?" কলকণ্ঠী কিশোরীর **অহেতুক হাস্যে-লাস্যে** সে বলে উঠলো, **"আম্মু আদিবাসির মেয়্যাটো বটে। আম্যার বাপের পয়সা লাই গ'—শাড়ী দিলেক লাই। ভাতার আমার গাঁজ্ঞা খেঁয়্যা, জগৎ ভুল্যাঁ ঘুম্ লাগাইছেঁ। দে ক্যানে ত্যু তোর গেরুয়াটা—লোজ্জাঁ লুকাই!"** অপাঙ্গে কিশোরীর কৌতুক হেনে, সে চাইলো আমার দিকে।

সড়াৎ করে পরণের গেরুয়াটা **টান মেরে খুলে**, ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে। সেটা লুফে নিয়ে, সে পরে ফেলতে ফেলতে বললো, "ইটা নিরুলীর **কীত্তুনী-বাইন পাড়া** গ'। উদিক পানে **অট্টহাঁস!**" সেই বটগাছের তলার অন্ধকারে **হারিয়ে গেল** সে মেয়ে। পরণে শুধু আমার একটা জাঙ্গিয়া, মাথায় সেই **বিচিত্র হাড়ের চূড়া**; আর—হাতে ত্রিশূল। ব্যাপারটা **হজম করতে** সময় লাগলো বেশ কিছুক্ষণ। দেখিয়ে দেওয়া রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবার মুখে, সামনে পড়লো একপাল **শেয়াল**—উর্দ্ধমুখে মাঝে মাঝে **হুক্কা-হুয়া-হুয়া** করতে করতে; দৌড়াচ্ছে তারা "**অট্টহাঁসের**" দিকে।

কয়েকটা আলোর বল যেন, **গড়িয়ে গড়িয়ে** চলেছে তাদের পেছনে। হেঁকে উঠলো একপাল কুত্তা সেই অন্ধকারে। কুত্তারা পাড়া ছেড়ে কখনই বাইরে যায় না। পাড়ায় থাকলে তাদের জোর বেশী—দাপট বেশী। ছাড়িয়ে যেতে হবে ওদের পাড়া—তবেই নিস্তার মিলবে ঘেউ ঘেউ এর হাত থেকে। **বে-পাড়ার** শেয়াল আর মনিষ্যিকে, কেইবা ভালে চোখে দেখে, **না চেখে?**

সামনে শেয়ালের দল, পেছনে কুকুরের দল। তার মাঝে দৌড়াচ্ছি আমি। বহুবার আমার জীবনে আমি দেখেছি, ঠাকুরের ঠাকুরালী। মানুষ হয়ে নেমে আসা তার, মানুষের মাঝে। টাটকা টাটকা তার রস, আস্বাদন করতে পারিনি—চটজল্দি বুঝে উঠতে না

পারার ফলে। এই জীবনটার যত দিন গেছে গড়াতে গড়াতে, বুঝেছি—সে আর অন্য কেউ নয়! সে সেই—বিশ্ববিমোহিকা, মহামায়া-বিশ্বার্ত্তিহারিকা।

আঁধার ফুঁড়ে তার আসা, বড় আপন করে বরাভয় দিয়ে, হাড়ের চূড়া মাথায় পরানো; শেষ গেরুয়াটুকু চেয়ে নিয়ে চলে যাওয়া; জানিয়ে দিয়ে যাওয়া তার পাদপীঠের পথরেখা; বড় বিহ্বল করে তুললো মনটাকে। আমার ভেতরের আমিকে, ধরে রাখতে পারলাম না আর বহু চেষ্টায়! ভুলে গেলাম ভয়—ভুলে গেলাম কে আমি। পাগলের মত, সেই রাতের আঁধার দীর্ণ করে—চেঁচিয়ে উঠলাম, "ওঁ হ্রীং, নাহং জানে তব মহিমানম্, ত্রাহি কৃপাময়ী মামজ্ঞানম্।" (মাগো দুর্গতিনাশিনী, তোর মহিমা বুঝতে পারিনি। হে কৃপাময়ী, আমার মত অজ্ঞানকে তুই রক্ষা কর মা!)

হঠাৎ থমকে গেল শেয়ালের পাল। পেছন ফিরলো তারা আমার দিকে, প্রায় about turn করে। তারপর একসাথে হেঁকে উঠলো ন'টা শেয়াল, "হুক্কা হুয়া।" ক্যানালের ও'পারের বুড়ো-বটগাছে, ডানা ঝাপটে উঠলো বাদুড়ের দল। পরিযায়ী (Australian Storks) বকেব দল, বৃক্ষশাখার নীড় থেকে ডেকে উঠলো, "ক্যাঁও কোঁও কোঁও কুঁচ্‌কুচ্‌!"

ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরা কাঁদরের জলে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমিও। সেই অন্ধকারে কোথায় যাবো, আর কোন দিকে যে যাবো—বুঝে উঠতে পারলাম না। হাঁফাতে লাগলাম চরের কাদা-মাটি কামড়ে ধরে। অর্ধেক শরীরটা তখন কাঁদরের জলে। নির্জনচারী গোধিকারা বিরক্ত হয়ে, সেঁদিয়ে গেল ঘাসের-কাশের জঙ্গলে। খেয়াল হোলো—মাথার সেই আধফালি চাঁদের মতো হাড়ের চূড়াটা আর নাই, পড়ে গেছে কাঁদরের জলে—ডুব সাঁতার দেবার সময়! বার বার ডুব দিয়ে খুঁজতে লাগলাম, সেই হাড়ের চূড়োটাকে—পেলাম না আর!

ফিরে দাঁড়ালো শেয়ালেরা আমাকে ঘিরে। রাতের অন্ধকারে চোখগুলো জ্বলছে তাদের আগুনের ভাঁটার মতো। মুখ থেকে ঝরছে লালা তাদের। ঝিক্‌মিক জোনাকীর মত জ্বলে উঠছে বিন্দুগুলো। বুঝে উঠতে পারলাম না, পালিয়ে না গিয়ে ওরা আমাকে ঘিরে ধরলো কেন? তবে কী আক্রমণের অপেক্ষায়! ভয়ে আর ক্লান্তিতে প্রায় অসাড় শরীরে, সমস্ত জোর এনে ছুঁড়ে মারতে চাইলাম ত্রিশূলটা, শেয়ালগুলোকে মারবো বলে। আমারই ভুল। ফলাগুলো রয়েছে আমার দিকে, গোড়াটা ওদের দিকে। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে দু'টো শেয়াল, খপাৎ করে কামড়ে ধরলো ত্রিশূলটার বাঁটে। ভয়ে ছাড়তে পারিনি ত্রিশূলটাকে। আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল আর চিহ্ন কিনা ওটা!

শেয়ালের গায়ে যে এত জোর হয়, এই প্রথম জানলাম। অক্লেশে আমাকে চরে টেনে তুলে, কোরাসে হুক্কা-হুয়া ডেকে—গট্‌গট্ করে চলে গেল তারা। যেন—কিছুই হয়নি। সামনের জঙ্গলে মিলিয়ে যাবার আগে, তাকিয়ে দেখলাম—হেঁটে যাচ্ছে সেই আদিবাসী মেয়েটা: যে আমাকে কৌশলে ল্যাংটা করে দিতে—কেড়ে নিয়েছিল

গেরুয়া। নির্বোধ গোরু আমি, গুরুত্ব বুঝিনি সেদিন এই নাটকের। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম চরে বসে বসে। অসহায় কেউ যখন কাঁদে— অশ্রু তখন হয়ে যায় প্রণামের ফুল, আর কান্নার শব্দ হয় তখন মন্ত্র!

প্রদীপ তুলে ধরে মাথার কাছে, কেউ যেন এগিয়ে আসছে এদিকে। তার মৃদু আলোয় দেখলাম, সরু এক ফালি **ঘাটের ইশারা**, নেমে এসেছে উঠোন থেকে কাঁদরের জলে। মোটা এক **গুলঞ্চলতা**, বিরাট এক ময়ালের মত ঝুলছে—গাছের ডাল থেকে। বৃদ্ধা সে নারী বললো, "তুমি কে বাবা?"

—— তুমি কী **চিকণ-মা**?

—— কে বললে তোমায়? কে পাঠালে এখানে?

—— একটা **আদিবাসী মেয়ে**। তার নামটাতো বলেনি সে! সে তো বললো তোমরা এখানে থাকো। এখুনিতো সে চলে গেলো, **ও'দিকে** জঙ্গলের মধ্যে। ওরা কী শেয়াল পুষে? একপাল শেয়ালকে, ডাক দিয়ে নিয়ে গেল যে! বিশ্বাস করো আমাকে!

খল্‌খল্ করে হেসে উঠলো মা। "আমরা ছাড়া, এখানে আর কেউ থাকে না বাবা! ক'টা শেয়াল-বেজী-গো সাপ থাকে বটে, তবে সে কারুর **পোষা নয়**। মহামায়ার সংসারে শ্রীকৃষ্ণের জীব ওরা। মায়ের কাছে থাকে আপনমনে নির্জনে।" শাড়ীর আঁচল দিয়ে, আমাকে মুছাতে মুছাতে বললো— তুই কী **নাগা সম্প্রদায়ের**? উলঙ্গ কেন? কানের দু'পাশে, কপালে **ছড়ে গেছে** দেখছি! পড়ে গেছলি বুঝি? আহারে পেটেও তো—কিছু পড়েছে বলে মনে হয় না!"

—— না, আমি নাগা সম্প্রদায়ের নয়। সেই মেয়েটা যে বললো, তার শাড়ী নাই। তাই দিয়ে দিলাম তাকে। সেও যে ল্যাংটা ছিলো। বললো—বড় গরীব ওরা। বাবাও দেখে না, বরও দেখে না। একটা হাড়ের চূড়া, মাথায় **পরিয়ে দিয়েছিল** যে সে। বললো-- এটা পরলে ভয় নাই, **লয়ন-বাবা আর চিকণ মার** কাছে যা। সেই হাড়ের চূড়ার ঘষা লেগেছে বেশ জোরে। কাঁদরের জলে পড়ে গেল যে **সেই চূড়াটা**। অনেক খুঁজলাম ডুবে ডুবে, **পেলাম না**। স্রোতে টেনে নিয়ে গেছে বোধ হয়!"

তার পাশে এসে দাঁড়ালো এক সন্ন্যাসী। হাতে তার মশাল জ্বলছে। বড় সৌম্য-দ্রাবিড় চেহারা তার। মনে হলো, **শিব** স্বয়ং যেন **নেমে এসেছে** কৈলাশ থেকে; আলোর বর্ত্তিকা নিয়ে। **মনের অন্ধকার গর্ভগৃহে, যখন আপনাকে আপনি চিনে উঠতে পারি না আমরা; সে তখন এমনি করে আলোর বর্ত্তিকা ধরে বলে, "ওখানে তুইই আছিস, আছে আর তোর মা। ডাক্ তাকে। সেইই জ্বেলে দেবে দীপ তোর মনের অন্ধকার মণি-কোঠায়। চিনতে শেখ্ আগে নিজেকে—আত্মানম্ বিদ্ধিঃ (Know thyself, my boy)!**

প্রসন্ন মুখে পড়েছে তার আলো। বাঁ-হাতের গেরুয়াটা এতক্ষণ দেখিনি আমি।

সেটা ফিরিয়ে দিতে, ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম আবার! জীবন্ত শিব আর শিবানীর, পায়ে মাথা কুটতে লাগলাম বিহ্বল হয়ে। মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, "তোর গেরুয়া তোকেই ফেরৎ দিয়ে গেল যে সে! হ্যাঁ-রে, বিশ্বাস কর! অর্থের অভাবে, নূতন শাড়ী দিতে পারিনি তাকে অনেক দিন। অভিমানে অভিযোগ করেছে সে তাই—তোর কাছে। পাঁচটাকায় কিনে এনেছিলাম, লাল-পেড়ে সাদা শাড়ী। চিকন-মাই সেটা পরিয়েছে একটু আগে তাকে। তুই ল্যাংটা থাকবি তা'তো হয় না। তাই ফিরিয়ে দিয়েছে তোকে। পরে নে। চল্ দেখে নিবি তোর সেই বেটিকে, কেমন খুশী হয়েছে সে!"

সামনে মশাল হাতে বাবা লয়ন-মহারাজ, মাঝে আমি, পেছনে প্রদীপ হাতে চিকন-মা। কুণ্ডের পাশ দিয়ে, এসে উঠলাম পঞ্চমুণ্ডীর আসনের কাছে। সত্যিই সেই আদিবাসী কন্যার মুখে, সুবিপুল বিমল হাসি উপচে পড়ছে। প্রদীপ শিখা কাঁপছে মৃদু বাতাসে। অচেনা ফুলের গন্ধ বিহ্বল করে তুলেছে। পঞ্চমুণ্ডীর চারপাশে—হেঁকে উঠলো শেয়ালেরা হুক্কা হুয়া। তারপর খুনসুটি করতে লাগলো তারা আপন মনে। প্রণাম সেরে ফিরে এলাম কুটীরে। শরীর ক্লান্ত অতিশয়। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লাম বেঘোর ঘুমে।


শ্যাম-লতা



্র পাদপীঠ অট্টহাস : পঞ্চ ম-কার চক্র

সকাল হলো। ৭ দিন ছিলাম ও'খানে। সৌভাগ্য হয়েছিল জানতে, তন্ত্রের নানা দিক। আর যা' জেনেছি সেই দিনগুলোতে, তার কিছু আভাস দিয়েছি আগে। উদ্ধৃতি টেনেছি শাস্ত্র থেকে। বিশদ জানতে **পঞ্চ ম-কারের ব্যাপারে**, অনুরোধ করবো পড়ে নিতে আমারই লেখা **নর্মদাতীর্থ হ'তে— ৮ম খণ্ড**। Anatomy আর Physiology-র আলোয়, আলোচনা আছে বিস্তারিত সেখানে।

ভগবান শিবই তন্ত্রের প্রচার করেছিল। দক্ষযজ্ঞের সময় কঙ্খল-হরিদ্বারে, দেবতারা বেদম ঠ্যাঙানী খেয়ে , **বীরভদ্র আর ভদ্রকালীর কাছে;** কেটে পড়েছিল সেখান থেকে। স্বয়ং নারায়ণও মার খেয়ে পালিয়েছিল, বীরভদ্রকে **ঠ্যাকাতে পারেনি**। শেষমেশ **শ্বশুরের** ঘাড়ের উপর, একটা পাহাড়ী **ছাগলের মাথা** বসিয়ে দিয়ে, শিব তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। আফ্‌টার অল্‌, তার বৌ-এর বাপ যে! তারপর এই কড়ারে সে দক্ষকে ছেড়ে দিয়েছিল যে—আর্য্যরা যেন ম্লেচ্ছদের কোন ব্যাপারে, নাক না গলায়। তোমরা তোমাদের **বেদ নিয়ে, হোমযজ্ঞ** নিয়ে থাকো।

মালখোর, গাঁজাখোর, বিড়িখোর হলে কী হবে, ব্রেণটা তার খুব খেলতো। দুগ্গাকে সঙ্গম করতে গিয়ে বুঝলো যে—জগৎটাকে সেই জন্ম দিয়ে ফেলেছে আগে। আর সব গ্যাঁড়াকলের **চাবিকাঠিই**, দুগ্গার আঁচলে বাঁধা। কেৎরে পড়লো শিব, দুগ্গার পায়ের তলায়। চুলোয় গেল আর্য্যদের বেদ, তন্ত্রধর্ম জন্ম নিলো—**বড় সহজ, আর লোভনীয় বলে**।

ছট্‌কে ছুটে আসতে লাগলো, ছেলেরা-মেয়েরা তন্ত্রের দিকে। আর শিব-দুগ্গার

পাঠশালায় পড়ে আর ট্রেনিং নিয়ে, পটাপট্ জন্মাতে লাগলো **বিশ্ববরেণ্য ঋষি আর ঋষি-মায়েরা**। ভোগে গেল বেদধর্ম, ভুগতে রইল আর্য্যরা। বেদ ছুঁতে পারতো না যে মেয়েরা, তারাই এবার **জীবনের বেদ-বেদান্ত** শুনাতে লাগলো আর্য্যদেরকে; **অন্ত যার খুঁজে পেল না তারা**।

শিব-দুগ্গা সবাইকে ডেকে-হেঁকে বললো—জাত্ হঁলো মাত্র দু'টা। একটা মেয়্যাঁ, আর একটা ছেল্যা। ল্যাখা-পড়া কত্তি হলে আর্য্যদের টোলে যেয়্যাঁ লাভ নাই। আস, বনে-জঙ্গলে, শশ্যানে-মশ্যানে, লদীর পাড়ে বনের পিছাড়ে। একটা কোরাঁ মাগী আর মালের হাঁড়ি লাও ক্যানে। ভোদ্দম্ ফূত্তি কর ক্যানে? ভগমান্-মা-কালী লেমে আসব্যেক পাকুড় গাছের থিএ্যা!"

টোলের বারান্দায় বসে বসে আর্য্যঋষিরা, গামছা ঝটকে মাছি তাড়াতে লাগলো, সারাদিন গালে হাত দিয়ে। আর দেখতে লাগলো **বিনা পুঁথি, হোমযজ্ঞে—তরতরিয়ে চলছে শিবের পাঠশালা—শ্মশানে-মশানে, শেয়াল-কুত্তার খেঁকামেকির মধ্যে।**

বৈষ্ণবরা-সহজিয়ারা এসে বললো, " আমরা কী করুম্ কর্ত্তা?" শিব বললো, "ত্যুমরা এক কাম কর, একখান্ কইরা মাইয়্যা লও—কচি কচি। একতারা-খান্ বাজাও। কিষ্টর-পারা, অর পাও ধইর‍্যা পইর‍্যা থাহ। লিজের পুরষাঙ্গডা অর মুখে দিবা—চুষব(অ)। অ্যারে কয় মুখমেহন। শরীলডায় শিরশিরানি লাগব(অ)। আর ত্যুমার শিরদাঁরা বাইয়া কুণ্ডুলিনী শক্তি, মাথার খুলির দিগে যাইব(অ) গিয়া। তুমি গোসাঁঞি-মহারাজ বইন্যা যাইব(অ) গিয়া।"

তারাও দৌড়ালো শিবের কথা শুনে। খুঁজতে লাগলো **কিশোরী-কিশোরী** মেয়েদের। না সহজে মিললে—কিনতে লাগলো গণ্ডা গণ্ডা জমি-জিরেত বেচে। **কুঠিয়া** হল—নাম-সংকীর্ত্তনের আখড়ার আড়ালে—**কিশোরী ভজনা** হতে থাকলো; **গোবিন্দের ভোগও** হতে থাকলো। **বৈষ্ণব-বোতলে শৈব-মদ** ঢুকিয়ে, তার নাম দেওয়া হলো—**শ্রীকৃষ্ণ চরণামৃত**। শৈব পঞ্চ ম-কারের **মদ, মাংস, মাছ, মুদ্রা (টাকা), মৈথুন (রমণ)**, বদলে গেল আলাদা মেনুতে— **কৃষ্ণরস** (তাড়ি + মহুয়া), দুধ, ঘি, ছানা, টাকার পুঁটলি, **পদসেবা** (ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচ— উদ্দাম রমণ—**একজনকে বহুজন**)।

আমরা যে যাই পণ্ডিতি বিচার করি না কেন, **ধ্রুবপথ কিন্তু ওইটাই**। কারণটা হলো এই যে—প্রাণের **ঐশী-শক্তি** ঘুমিয়ে থাকে, **লিঙ্গের আর যোনীর গোড়ায়**; যার শাস্ত্রীয় নাম হলো—**কুলকুণ্ডলিনী শক্তি**। ইংরাজীতে যাকে বলে Full life force বা vital power. শেয়াল বা সাপখোপ তাড়াতে, আমরা যেমন ঝোপে-জঙ্গলে **লাঠিমারি**, তেমনি লিঙ্গ আর যোনীর গোড়ায় **নাড়া মারতে হয়** কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে, উদ্দাম **রমণের মাধ্যমে**। শেয়াল-সাপ পালানোর মতো, কুণ্ডলিনী শক্তি ও **পালাতে চায় তখন**।

কিন্তু পথ তো একটাই খোলা, সেটা গেছে শিরদাঁড়া হয়ে মাথার খুলির দিকে। সেখানে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে তুবড়ীর মতো ফেটে যায়, কোটি কোটি ভোল্টের ঠাণ্ডা আলোয়। সাধকদের ওই ফুর্ত্তির জীবনে, এ' কাণ্ডটা ঘটে বেশ কয়েক বার, তাদের অজান্তে। আর ক্রমেই সে, সম্ভোগ ভুলে গিয়ে, ভোগ করে পরম স্বর্গীয় সুখ।

কারণ, সে তখন ভগবান হয়ে গেছে; সাধিকা কচি রাঁড়ী তখন ভগবতী রাধা বা দুর্গা হয়ে গিয়ে; রাবড়ী চাটছে ভক্তদের কাছ থেকে পেয়ে। একমাত্র শিবই ওই ফর্মূলা আবিষ্কার করেছিল—শরীর দিয়ে বা তনু দিয়ে। এই তনু দিয়ে তরে যাওয়াকে (Cross over) বলে তান্ত্রিক আচার। আর পদ্ধতিটির নাম তন্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্র।

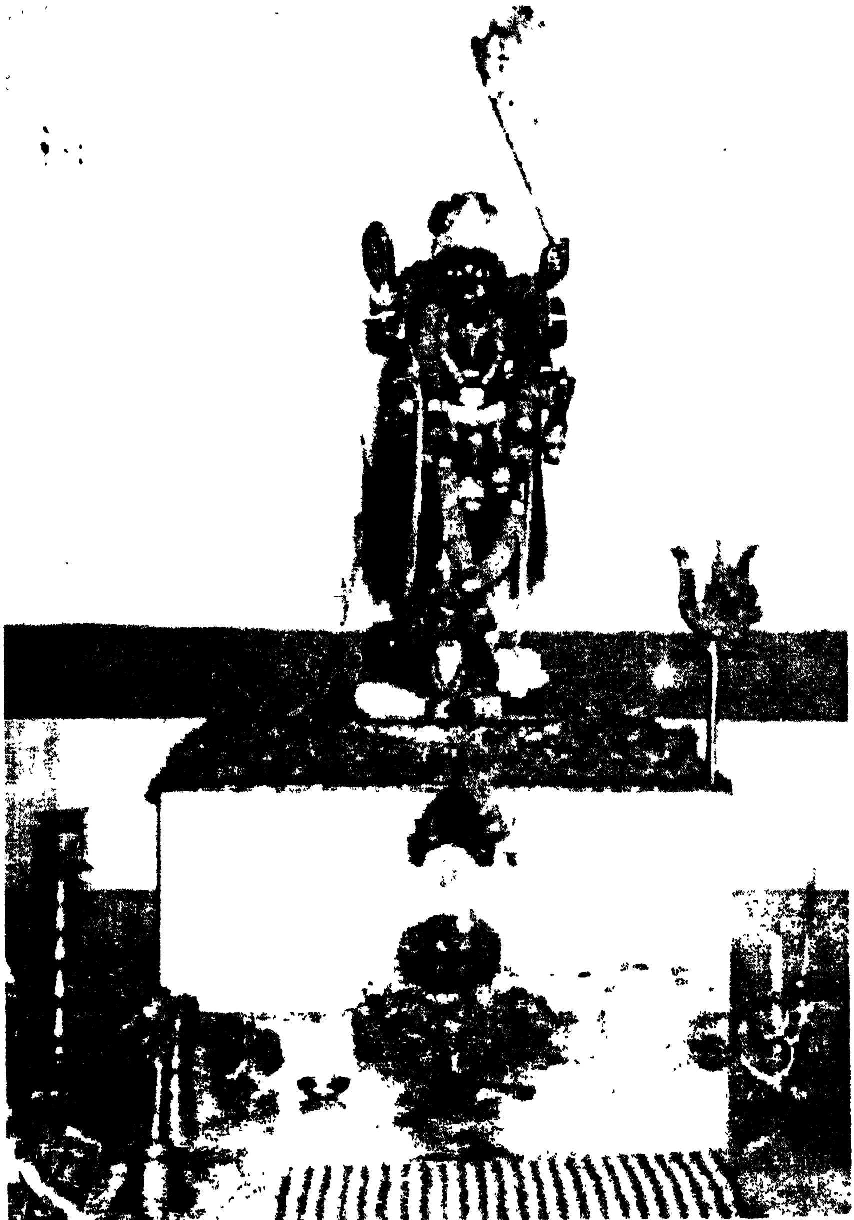
সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত, এই অট্টহাসে এসেছে বহু তান্ত্রিক। তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে তাদের। কেউ সাধনা করেছে প্রকাশ্যে, কেউ সাধনা করেছে গোপনে। কবি-নাট্যকার-সাহিত্যিকেরাও বাদ যায়নি, সেই তালিকা থেকে। ঋষি-প্রতীম মানুষ গিরীশ ঘোষও নাকি, এখানে প্রায়শঃই আসতেন। লুকিয়ে লুকিয়ে কঠিন তন্ত্রাচার করতেন। বহু দান-ধ্যানও আছে তার এখানে। লয়নবাবার কাছ থেকে শুনেছি এ' সব আমি। মনে মনে অনেক আশা পোষণ করেছিলাম আমি যে, তন্ত্রের পথে হাতে-খড়ি হবে আমার এখানে। কিন্তু সে গুড়ে আমার, বালি ঢেলে দিয়েছিল লয়ন বাবা!

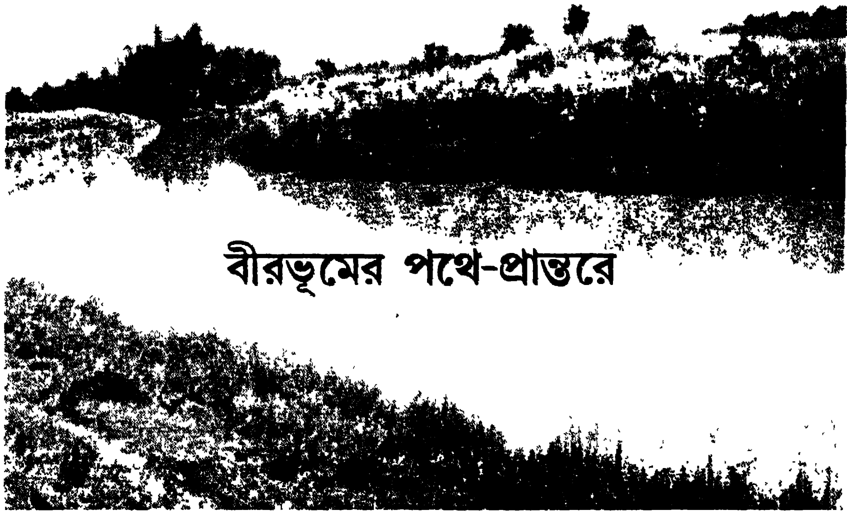
লয়নবাবা আর চিকণ-মা বলেছিল, "আগে সংযত হতে শেখো। এ' রাস্তা বড় কঠিণ। প্রত্যেকের কাজের ভাগ থাকে। তোমার কাজ কলম ধরা। কমলা ধরা দেবে অনেক পরে। পুরো দেশটাকে আগা-পাশতলা, চরে চরে দেখে নাও। চিনতে থাক কোথায় কোথায় আছে তার পাদপীঠ বা ডেরা। কমলার কর্মই এই যে—দরকার বোধে, সেইই তোমাকে শিখিয়ে দেবে সব।

বহু ঋষির সাধনার ধন যে বস্তু—অধর-ওষ্ঠ, কই সেটাতো অন্য কারুর মাথায়; সে চড়িয়ে দেয়নি! পুলিশের গুলির থেকে, কই সে তো আর কাউকে বাঁচায়নি। তোমার সঙ্গী পুংখে-লক্ষী মরেছে খবর পেয়েছি—গুলি খেয়ে। পুলিশ ব্যস্ত ছিল, তাদেরকে নিয়ে। সেই সুযোগে এদিকে নির্জ্জনে, পার করে দিয়েছে তোমাকে সে। যাকে সামনে পেলে, তাকে চিনতে পারলে না। এ' ভ্রম তোমার অনেক জন্মার্জ্জিত। ভ্রমের অবসান হলে—ভ্রামরীকে পাবে তুমি। আর সে জন্য ভ্রমণ করতে হবে তোমাকে, গোটা ভারতবর্ষটা—তার অলিগলি।

বেশ দেখতে পাচ্ছি, কোন এক পাহাড়ের মাথায়—সেইই তোমাকে দীক্ষা দেবে, গোপন তন্ত্রের মহামন্ত্রে। বৈষ্ণব ফ্যামিলির সন্তান তুমি। হাতে সুদর্শন চক্র তোমার থাকা দরকার —মূর্খের লাঠি-কাটারী নয়। আর সে চক্র হলো—তোমার কলম। রক্তের হোলিখেলা তোমার জন্য নয়। আজ থেকে—যাও কলমের ধ্যান কর। সংসারের ঘূর্ণিপাকে

পড়ে, নিজের বাপের নামটাও ভুলতে হতে পারে। কিন্তু কলম ছেড়ো না। বাংলার মানুষ তোমাকে চিনবে এক বিশেষ সময়ে। সে সময় এখন অনেক দূরে—তুমি এখন শিশুমাত্র!"





বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

অট্টহাসিনী বাসন্তিকা

দশ মহাবিদ্যার সম্মিলিত রূপই হলো দুর্গা। অন্য কথায় বলতে পারি—দুর্গার ভেতরে আছে, তারই দশটা রূপ। খচে গিয়ে, ভাত দেবার নাম নেই যে শিবের, সেই ভাতার নামক জীবটিকে, জিভ কেটে দেখিয়েছিল সে; তার দশটা রূপ। যার প্রথমটা হলো দাঁত-জিভ ক্যালানো কালী। আর ওই শেষেরটা হলো—পরমা বৈষ্ণবীরূপিনী মহামায়া জগন্মাতা কমলা; বা আদ্যাশক্তি শ্রীরাধা। আর তাই সব ঠাকুরের মাথার উপরে ওরা থাকে টাঙানো। রাঁড় নিয়ে ঘুরে বেড়ালে, গোলা-পাবলিক মেরে গাঁড় ভেঙ্গে দেবে, সমাজ করবে একঘরে! কিন্তু রাঁড়কে মর্য্যাদা দিয়ে, কেমন দেখুন জাপটে ধরে থাকে কেষ্টা-ব্যাটা; আর সবার মাথায় পা দিয়ে চলে, সেই গোয়ালার বাচ্চা।

রাঁড়ের পঞ্চ ম-কারে এতো রস যে, গৌরাঙ্গকে একদিন পালাতে হয়েছিল নদীয়া ছেড়ে— বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে। কেন না, ভদ্রবাড়ীর মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া, ম্লেচ্ছ-আচারে-বিচারে সায় দেয়নি সেদিন। পুরীর গম্ভীরায়, তাই তাকে দেখা গেছে—দিনরাত মাধবী দাসীর; শাড়ী-সায়া ধরে পড়ে থাকতে। আর এই ব্যাপারটা সহ্য হয়নি, গোলা পাবলিক উড়িয়া ব্যাটাদের! মেরে ধরে হাড়-গাঁড় ভেঙ্গে, গৌরাঙ্গকে সাগরের জলে ফেলে দিয়েছিল তারা। বাকীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে।

আর আমরা সকলের মুখ-চাপা দিতে, বুকে ব্যথা চেপে রেখে বলি, "কৃষ্ণের সাথে—জগন্নাথের সাথে লীন হয়ে গেছে মহাপ্রভু"। সত্যি কী তাই? আমরা এতটাই বারাঙ্গনা-সন্তান যে, সত্যি কথা বলতে আর সহ্য করতে আমাদের পঙায় ভয় ঢুকে। মিষ্টি মিষ্টি বুলি কপচাই মুখে। নিজেরা মূর্খতা ঢাকি নিজেদের, আর —পাবলিক্‌কে

আরও মূর্খ বানাতে, প্রচারে নামি—বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন করে, মিথ্যা ভিত্তিহীন শাস্ত্রালোচনা করে করে।

যদি ভগবান রামকৃষ্ণের জীবনের দিকে তাকাই, দেখতে পাবো তার গুরু যেমন ছিলো **তোতাপুরী**, তেমনি ছিলো এক **ভৈরবী-মা**। ওদের কাছে সম্পূর্ণ হয়েছিল তার **তন্ত্রের জ্ঞান আর সাধনা**। এ কথা বহুল প্রচারিত যে—শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মাকে, মহামায়া জগন্মাতারূপে পূজা করতেন। তাঁর সাথে নাকি শ্রীরামকৃষ্ণের **শারীরিক সম্পর্ক** ছিল না। **প্রথমতঃ**, একথা বলবো যে—আমরা যারা আজও **পঞ্চ ম-কার করি**; রমণের আগে সাধনসঙ্গিনী সেই নারীকে কী **জগন্মাতার মর্য্যাদায়** যথা-বিহিত **পূজা করি না**? কুমারী পূজাও করি, কুষ্মাণ্ডী পূজাও করি রীতিমতো। তারপর চলে উদ্দাম রমণ, শেষ পাতে চাটনী আর দইয়ের মত। মাগী নিয়ে মাল খেয়ে **ফুর্ত্তি লুটি না**।

দ্বিতীয়তঃ, সারদামাকে রমণ না করলেও, ভৈরবী যখন তন্ত্রবিদ্যা **গেলাচ্ছিল** শ্রীরামকৃষ্ণকে, তখন কী ওই ভৈরবী মা—মৈথুন ব্যাপারটার **মুখে ঝ্যাঁটা মেরে**, সেটাকে পঞ্চ-ম-কারের বদলে, **চৌ-ম-কার** করে নিয়েছিল? রামকৃষ্ণের পার্ষদেরা তাইই লিখে গেছেন নাকি? কই আমি তো পড়িনি! নাকি যে বইটাতে লেখা আছে—সেটা বাজারে ছাড়া হয়নি—শুধু ভক্তদের মধ্যে চুপিসারে **বিলানো হয়েছে**?

তৃতীয়তঃ, সব ব্যাটাই পঞ্চ ম-কার করে **গোপনে**, মুখে খালি ধোয়া তুলসী পাতার বুলি কপচায়! সিস্টার নিবেদিতা, শ্রীমা, এরা কী **ইয়ার্কী মারতে**; বিদেশ থেকে উড়ে-ভেসে এসেছিলো? বিশ্ববরেণ্য ঋষিরা কেন তাদের, তুলে ধরেছিলেন **জগন্মাতারূপে**? ফ্রি-সেক্সের (Free-Sex) দেশ থেকে এসেছিলেন এঁরা। ওঁরা চিরকালই বিজ্ঞান বুঝেন, হিন্দু তন্ত্রের আচার অনুষ্ঠানের **ফর্দ্দ দেখে অজ্ঞান হননি ওঁরা**। এটাই ওঁরা **শিখতে** এসেছিলেন যে— **শরীরী কসরতে স্বয়ম্ভুকে, আর তার বৌ দুগ্গা-কালীকে; ধরা যায় কিনা**! ধরেও ছিলেন, সারা জীবন কাটিয়েও ছিলেন **এই দেশে**। ফিরে যাননি স্বদেশে, কেন না, তখন তাঁরা আদৌ আপামর ভারতবাসীর কাছে **মা হয়ে** গেছলেন, কেউ তাদের বিছানার মশারী তুলে, দেখতে যায়নি যে—**পঞ্চ ম-কার চলছে কিনা**।

বিজ্ঞানকে জানতে গিয়ে জান **লড়িয়ে** দেয় ওরা। শরীর বা **শরীরী কসরৎ** সেখানে **অ্যালার্জী** আনে না। আমরা মরি এলার্জিতে। **মূর্খের পবিত্রতা জ্ঞান**! বিষ্ণুপ্রিয়া আর সারদা মায়ের মধ্যে, ব্রাহ্মণ বাড়ীর **অহেতুক শুচিতা** ছিল। তন্ত্রের সত্যতা বা সততা ছিল না। তাই সাধনায় সাথ দেয়নি তারা। **নিবেদিতা, শ্রীমার মধ্যে অন্ধ অ্যালার্জ ছিল না**।

চতুর্থতঃ, গৌরাঙ্গের মতই দশা হতো শ্রীরামকৃষ্ণের, বিবেকানন্দের, শ্রী অরবিন্দের। হয়নি শুধু একটা কারণে, আর তা' হলো—**রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা**। ইংরেজ-ঠ্যাঙানো **রাণী রাসমণি**, ব্যাক্ করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে-বিবেকানন্দকে। আর

ফরাসী সরকার ব্যাক্ করেছিল, **অরবিন্দ ঘোষকে পণ্ডীচেরীতে**। এখানে থাকলে, ফাঁসির দড়ি থেকে মুক্তি পেলেও; পণ্ডিতমূর্খ বাঙালীর **ছড়ি থেকে** তার মুক্তি মিলতো না। এই হ'ল গোলা পাবলিকের চিরকালীন **প্যাঁচ-পাঁচালী**।

পঞ্চমতঃ, সারা পৃথিবী জুড়ে এই যে খ্রীষ্টধর্মের বিরাট রমরমা, সেটা প্রচার করেছিলেন যীশুখৃষ্ট। জনশক্তি আর রাষ্ট্রশক্তি কোনটাই তাকে ব্যাক্ বা **পৃষ্টপোষকতা** করেনি বলে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাকে **মরুপ্রান্তরে**। গৌরাঙ্গের যা' দশা হয়েছে, যীশুরও সেই দশা হয়েছে। গৌরাঙ্গের জীবনে ছিল মাধবী-বেশ্যা, যীশুর জীবনেও ছিল আহিরীনি (মেষপালক) সম্প্রদায়ের **বেশ্যা**। **পঞ্চ ম-কার নারী** ছাড়া হয় কী করে? যতগুলো লোকের নাম বললাম, এরা কেউ কী ভগবান বলে **স্বীকৃত নয়**? চার্চে কী অনাচার নাই? তাই বলে **তন্ত্রশাস্ত্র আর খ্রিষ্টিয়ানিটি** খারাপ হবে কেন? কেন থাকবে অহেতুক এলার্জি? মূর্খকে দিয়ে তো শাস্ত্র বিচার হয় না! যারা নিজের নামটুকু লিখতে কলম ভাঙ্গে, **সংস্কৃত বা ইংরাজী** ভাষা তারা বুঝবে কেমন করে?

এবার ফিরে যাবো আগের কথায়। কেন সে **বাসন্তিকা**, কেন সে নয় **শারদা অট্টহাসে**! ঋষি মহাঋষিরা, তান্ত্রিকেরা কী **ভুল করে এসেছে** এতদিন এখানে? কেন তার উৎসব হয় **বসন্তকালে**—মাধবের পূজার্চ্চনার **পুণ্যলগ্নে**? দুর্গাকে আমরা জেনেছি সে মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড, হিরণ্যাক্ষ, ধূম্রলোচন, শুম্ভ-নিশুম্ভ, রক্তবীজকে কচুকাটা করে বধ করেছিল বলে। আর ওদেরকে মারার আগে, সে তো ছিল **অন্নপূর্ণা-দুগ্গা মা**।

আমাদেরকে রাজা **সুরথই** (বোলপুর-সুপুরের রাজা?) চিনিয়েছে সেই বেটীকে। শরৎকালে সেইই পূজা শুরু করেছিল তার। না—সে গাড়ী আটকে, বাড়ী পুড়িয়ে, চাঁদা-তুলে জেরবার করেনি সেদিন মানুষের জীবন। যখন সে পূজা করেছিল, তখন সে ছিল, নিঃস্ব-রিক্ত সর্বহারা, পথের ভিখারী। আত্মীয় স্বজন, মন্ত্রী-শান্ত্রী রাজ্য কেড়ে নিয়ে তেড়ে দিয়েছিলো তাকে। চণ্ডীর খানিকটা অংশ তুলে দিলে, বুঝতে সুবিধা হবে ঃ—

'আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈ স্তদা প্রবলারিভিঃ।
অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতম্ তত্রাপি স্বপুরে ততঃ।।
ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্।।" ....শ্রীশ্রী চণ্ডী / ১ম অধ্যায়

অনুবাদ : [হেরে পর্য্যুদস্ত হয়ে শত্রুদের কাছে, রাজধানীতে এসে দেখলো, দুষ্ট, দুরাশয় এবং বলবান মন্ত্রীশান্ত্রীরা ভাগ করে নিয়েছে তার রাজ্য-কোষাগার। (মনের দুঃখে)

তারপর সে মৃগয়া করতে যাবার অছিলায়, একদিন একা একা ঘোড়ায় চড়ে গভীর বনে চলে গেল।]

তারপর মেধা ঋষির কাছে গিয়ে, উপদেশ পেলো দুর্গা পূজা করবার। অপেক্ষা করতে পারলো না সে, **বসন্তকাল পর্য্যন্ত**। শুরু করে দিল **শরৎকালেই** দেবীপূজা। আর আজও সেই প্রাচীন বাসন্তিকার পূজা হয়, এখানে অট্টহাসে বসন্তকালে **বাসন্তী পূর্ণিমায়**। এ **পূজা শাস্ত্রীয় পূজা—অকাল বোধন নয়**। পূজারী **অসীম ব্রহ্মচারী**, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি সেদিন—**দোষ তার নয়**। কলকাতার ছেলে বলে, সে বলেছে আমাকে। সে যদি না পায় কোন প্রামান্য **লেখা ইতিহাস**, তবে তার **কসুর কোথায়**!

কেমন করে আমি জানলাম তার পূজার **পুণ্যলগ্নকাল**? তবে বলি—চণ্ডী (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল) আর বেদব্যাসের মহাভারতের **অনুশাসন** পর্বে শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি। হিমালয়ে তপস্যা করতে গেছলেন শ্রীকৃষ্ণ। মহাঋষি উপমন্যু শংকরের সাধনার দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁকে। শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথায় ঃ—

"হে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, পরমপিতা শংকরের বিষয়ে আলোচনা করতে করতে, কেমন করে যে আটটা প্রহর, (২৪ ঘন্টা) কেটে গেল; বুঝতে পারলাম না। তারপর ওই ব্রাহ্মণ (ঋষি উপমণ্যু), আমাকে ন্যাড়া করে, দণ্ড (লাঠি) কুশ (আসন) চীর (গাছের পাতার বল্কল বা কাপড়), মেখ্‌লা (ছাতা, পাতার তৈরী) দিয়ে শাস্ত্রমতো দীক্ষা দিলেন। তারপর আমি একমাস শুধু ফল খেয়ে, চার মাস শুধু জল খেয়ে, উর্দ্ধবাহু হয়ে (হাত তুলে) একপায়ে দাঁড়িয়ে—ছ'মাস তপস্যা করলাম। তারপর বারো হাজার সূর্য্যের মতো, প্রকাণ্ড তেজের মধ্যে দেখলাম, নীলপাহাড়ের মতো একখণ্ড মেঘের চূড়ায় বসে আছে—ভগবান শংকর ভবানী দুর্গার সাথে। রামধনু আর বিদ্যুৎ-চমকে পরিরঞ্জিত সে মেঘ। বিশ্ববিধাতৃ শংকর-ভবানীর, একসাথে দর্শনলাভ বড় বিস্ময়ের!"

আটটা বর পেলো সে ভগবান শংকরের কাছে। আরও আটটা বর পাবে সে শংকরীর কাছে, সে কথা বলে দিয়েছিল শিব। তখন সময়টা **কী ছিলো? বসন্তকাল?** দেখুন তো— এই কথাগুলো **সেই কথা বলে কিনা**, প্রতিটি ঋতুর তো আলাদা আলাদা চরিত্র আর চিত্রলেখা থাকে!

"ব্রাহ্মণ, দেবতা, অসুর, নাগ, পিশাচ-পক্ষী-রাক্ষস, ভূত-মহর্ষি-পিতৃগণ ভগবান শংকরকে নমস্কার করলো। **মন্দ মন্দ সমীরণ, প্রবাহিত হয়ে, আমার মাথায় ফুলের বৃষ্টি হয়ে গেল।**" বর্ষা-শরতে কী এরকম ঘটে নাকি? **বসন্ত কালই ছিল তা'**। মহামায়া শংকরী তাকে বর দিয়েছিলো **আটটা**। কী সে বর? " ১) ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা, ২) পিতার অনুগ্রহ, ৩) শতপুত্র, ৪) উৎকৃষ্ট ভোগ, ৫) কুলানুরাগ বা স্বজাতি প্রীতি, ৬) মায়েব প্রসন্নতা, ৭) শান্তি, ৮) কর্ম-নৈপুণ্য।"

মা-দুর্গা খুশী হয়ে আরও ক'টা বর দিয়েছিল তাকে। তা' হলো—"**১) অমর তুল্য প্রভাব, ২) সত্যের প্রতি অনুরাগ, ৩) ১৬ হাজার বউ, ৪) তাদের অমর প্রেম, ৫) অক্ষয় ধনধান্য, ৬) বান্ধবপ্রীতি, ৭) মনোহর শরীরী সম্পদ, ৮) প্রতিদিন ৭ হাজার অতিথি সেবা**"। এ' সবই লাভ হয়েছিল ওই **বসন্তকালেই**। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোরু চরাতো বলে, তার বুদ্ধিটা গোরুর মতো ছিলো না। আসল **লগ্ন আর সময়টা** সে বেছেছিল—**বাসন্তী-নবরাত্রি**, যখন সব **অভীষ্ট পাওয়া** যায়! শরৎকাল কোথায় ছিল, আর রাজা সুরথই বা কোথায় ছিল তখন? শ্রীকৃষ্ণের আগে রাজা সুরথ জন্মেছিল নাকি?

যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নিই যে, সে শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বড় বা **অগ্রজ** ছিল, তবে তার পূজাটাই তাহলে এতকাল প্রাধান্য পেত, আপামর **সারা ভারতে**। কই, তা'তো হয়নি? সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে, এটা আমি জানি যে—**বাসন্তিকার বাসন্তী আরাধনাই হয়, বড় শ্রদ্ধায়**! কেন না পরম পিতা কৃষ্ণ যে, **সময় আর ক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে গেছে**; আজ থেকে প্রায় ৬০০০ বছর আগে; যখন সে ছিলো একটা গোয়ালার বাচ্চা! যে কিনা গরু-বাছুর চরাতো, মামাকে মেরে তার রক্তে হাত রাঙিয়েছে; গণ্ডা গণ্ডা যাদব মাগীদের (গোপীদের) ভুলিয়ে ধর্ষণ-মর্দ্দণ করেছে!

থাকুন আপনারা তর্ক নিয়ে, কে করলো—কী করলো নিয়ে! আমি থাকি আমার মেয়েকে নিয়ে আপন মনে! তার-গালে সেঁটে চড় মেরেছিলাম একদিন, বাহুলার পথে পালাতে গিয়ে! আজও আমি কাঁদি নীরবে বড় অসহায় হয়ে—সেদিন বড় অবাধ্যতার জন্যে তাকে গালে সপাটে দু'টো চড় দিয়েছিলাম বলে! সে কথা বলবো, বারান্তরে!

এখন যে আমাকে তুষ্ট করতে হবে –অসীম মহারাজকে! না হলে থাকতে দেবে না সে, তার ওই নির্জ্জন দো-তলায়! যেখানে **মাগীছাড়াই পঞ্চ ম-কার করা যায়**; একটু ও' পথে এগিয়ে গেলে! তারপর মা যদি নিজেই **সাধনসঙ্গিনী** হয়; তবে তো কথাই নাই! যেমন হয়েছিলো **তারা—বামদেবের আর বশিষ্টের**, যেমন হয়েছে **নর্মদা আমার**; আর যেমন হয়েছে কালী বেটী **রামপ্রসাদের ("এবার কালী তোমায় খাবো"**—মালখোরের উক্তি নয়!)

অসীম মহারাজকে কথা দিয়ে এসে ছিলাম যে, "যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না আপনি, তার জন্য কোন **কুণ্ঠা রাখবেন না**। আমিই দেখে নেবো তাকে; জেনে নেবো তার ঠিকুজী-কুলুজী! পাঁয়তাড়া কষলে, ৩৮ বছর আগে যেমন **চড় মেরে ছিলাম** তার **বাঁ-গালে**; তেমনি মারবো আজও! লিখে পাঠিয়ে দেবো **তার ইতিহাস**; হা-ঘরে রাখবো না আপনাদের! যেখানে থাকেন, যার আশ্রয়ে থাকেন; যার খিচুড়ী খান্; তাকে যে বড় **আগ্রহ নিয়ে** জানতে হয়! কেন না—সে **অন্নপূর্ণা-জগদ্বিধাত্রী-মহামায়া-অন্নপূর্ণা-শ্রীরাধিকা-কমলা(দশ** মহাবিদ্যার শেষরূপ)!

তার পূজা তাই হয় **বাসন্তীলগ্নে**, যখন সমস্ত পৃথিবী-প্রকৃতি উদ্বেল হয়ে উঠে;

শ্রীকৃষ্ণের বন্দনায়-নামে-গানে ঃ—

১. আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণ-হরিকে প্রণাম করি, যে কিনা-প্রলয়কালে **মৎস্যরূপে** (তিমিঙ্গিল) বেদ-উদ্ধার করেছিলো।

❊ ক) ঃ আমরা সেই ভবানীকে প্রণাম করি—যে কিনা হরিকে **দেবকীরূপে** জন্ম দিয়েছিলো, লালন করেছিলো **যশোদারূপে**!

২. আমরা সেই হরিকে প্রণাম করি, যে কিনা—**কচ্ছপরূপে** তার পিঠে করে পৃথিবীকে ধরে রেখেছিলো—ডুবতে দেয়নি!

❊ খ) ঃ আমরা সেই মহামায়ার ধ্যান করি—যে কিনা ভগবানকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলো **যশোদারূপে**; কংসের করালগ্রাস যাকে খুঁজে পায়নি।

৩. আমরা সেই শুয়োরের বাচ্চা (বরাহ অবতার) শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি, যে কিনা দাঁতে করে কামড়ে ধরে পৃথিবীটাকে; প্রলয় আর ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছিল।

❊ গ) ঃ আমরা ভজনা করি সেই **মহামায়াকে**, যে কিনা শেয়াল হয়ে **হুক্কা হুয়া** ডাকে। বলে—হোক্ হোক্ মঙ্গল হোক, শংকরের স্মরণাপন্ন হও, মুক্তি পাবে—হবে মৃত্যুঞ্জয়!

৪.আমরা সেই জগদীশ্বরের অর্চ্চনা করি যে, কিনা—নখ-দাঁত-ওয়ালা সিংহ-পুরুষরূপে (**নৃসিংহ**), হিরণ্যকশীপুর ভুঁড়ি-চচ্চড়ির চাঁট খেয়েছিলো—মুখের "**সীটা**" ছাড়াতে (**ইদি-আমীনের** মতো)!

❊ ঘ) ঃ আমরা সেই মহাকালীর ধ্যান করি, যে কিনা **নারসিংহীরূপে** মহিষাসুরের রক্তপান করেছিলো!

৫. আমরা সেই বিষ্ণুর ধ্যান কির, যে কিনা—**বামনরূপে** (বেঁটে হয়ে, গাঁটে-গাঁটে বুদ্ধি নিয়ে) মহারাজ বলিকে. বলির পাঁঠায় পরিণত করে, **পাতালে** নির্বাসনে পাঠিয়েছিল।

❊ ঙ) ঃ আমরা সেই বেটীকে ধ্যান করি, আর ধর্ণা দিই তার উঠোনে— যে কিনা বেঁটে দেয় আপন ক্ষুধার অন্ন সন্তানের মুখে, ভাতারের মুখে—**অন্নপূর্ণা হয়ে**—নিজে গপাগপ করে আগে না খেয়ে!

৬. আমরা সেই বিষ্ণুর ধ্যানার্চ্চনা করি. যে কিনা—**পরশুরাম হয়ে,** কব্জি-ফুলানো-মিঞাদের, একুশবার ধ্বংস করেছিলো; পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য।

❊ চ) ঃ আমরা প্রণাম করি সেই বিশ্বমাতাকে **রাত্রিরূপে,** পরম শান্তিতে যে ঘুম পাড়ায় সমস্ত জগৎকে তার বরাভয় কোল পেতে দিয়ে। "(রাত্রিঃ = দদাতি (দান

করে যে)" = **ভুবনেশ্বরী আদ্যাশক্তি**। সূর্য্যডুবা রাত নয়!)

৭. সেই কেশবকে আমরা প্রণাম করি, যে কিনা **রামরূপে** বধ করেছিল **মহাঋষি রাবণকে,** অঋষি-সুলভ তার আচরণের জন্য।

❊ ছ)ঃ এসো প্রণাম করি সেই দুর্গাকে, যে রাবণের লংকার **রাজলক্ষ্মী-কুললক্ষ্মী** রূপে বিরাজ করেও; অনাচারী রাবণকে ক্ষমা করেনি, ত্যাগ করেছিল।

৮. আমরা সেই **হলধররূপী** নারায়ণকে প্রণাম করি, যে কিনা বারুণীর সাথে, গোপীগণের সাথে রতি খেলায় প্রমত্ত হয়ে, ঘর্মাক্ত কলেবরে **যমুনায় চান করতে চাইলে— যমুনার প্রত্যাখানে,** হলকর্ষণে তাকে শাস্তি দিয়েছিল। সেই **নীলবসন হলধরের** জয় হোক, জয় হোক।

❊ জ)ঃ কংসের ধ্বংসের দিনক্ষণ উচ্চারণ করেছিল যে **কাত্যায়নী,** রোহিনী কন্যা বলভদ্র স্বসা, সেই **দেবী দুর্গাকে** আমরা প্রণাম করি।

৯. প্রাণীক্লেশ অপহারক, সেই **নারায়ণ-বুদ্ধকে** আমরা প্রণাম করি। কেন না— **নিজেকে জানতেই** তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন: জীবন যন্ত্রণার মুক্তির পথ বাৎলে দিয়েছিলেন।

❊ ঝ)ঃ **"আত্মানম্ বিদ্ধি"** এই শ্লোকগাথা যার, সেই কৃপাময়ী দুর্গাকে আমরা প্রণাম করি, কেননা—**পঞ্চ ম-কারের মধ্য দিয়ে,** সে টেনে নেয় আমাদেরকে তার কাছে।

১০. সেই কৃষ্ণ-বাসুদেবকে প্রণাম করি আমরা, সে আসবে ধ্বংস করতে সব পাপীকে **কল্কিরূপে**; সাধুদের রক্ষা করতে!

❊ ঞ)ঃ সব প্রলয়ের ডংকা বাজায় যে **মহাকালী,** "শত্রুর দিকে কূপিত দৃষ্টি হেনে—যে **অট্টহাস্য** করে, মহাক্রোধে যে **মসীবর্ণ** ধারণ করে; ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে উঠে যার—কপালে পড়ে কুঞ্চনরেখা; করালবদনা খড়্গাধারিণী সেই **অম্বিকাকে** আমরা প্রণাম করি।

..... (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

যুগযুগ ধরে **কৃষ্ণ-অনুসৃত পথে** চলে আসছে, তার আরাধনা **বসন্তের পুণ্যলগ্নে,** এই **অট্টহাসপীঠে**। আজও তার **ব্যত্যয় ঘটেনি**। মহাশক্তি স্বরূপিনী, শিব ঘরণী উমাকে তাই প্রণাম জানাই; **মাধবীরূপে—পরমা বৈষ্ণবীশক্তিরূপে—অনন্তবীর্য্যারূপে!**

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজম্ পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ।। ...... শ্রীশ্রী চণ্ডী / ১১ অধ্যায়।

(হে দেবি, তুমি অনন্তশক্তিশালিনী, বৈষ্ণবীশক্তিরূপা জগৎপালিকা, তুমি বিশ্বের আদি কারণ। সমস্ত জগৎকে মোহঘোরে তুমি ডুবিয়ে রেখেছো। আবার তুমি প্রসন্না হলে, সব শরণাগতকে তুমিই পরমা মুক্তি দিতে পারো।)

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ ।।



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



ওরা যা' বলেছিল : দুই ভৈরব-ভৈরবী

ঘুম হল না এতটুকুও। চারপাশে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। চললাম **পঞ্চমুণ্ডীর** আসনের দিকে চুপিচুপি। ওখানে বসে আমাকে **দেখতে হবে**—সাধনার জন্য, সত্যি ও'টার দরকার আছে কিনা। **ল্যাংটা হয়ে** বসে পড়লাম পঞ্চমুণ্ডীর আসনে—যা' হবার হোক, মৃত্যু আসে আসুক—নড়বো না! পুলিশের গুলির চেয়ে তো, মারাত্মক নয়! আমারই মত চুপি চুপি, কা'রা যেন আসছে এদিকে। নিভু-নিভু প্রদীপের আলোয়, ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো আমাকে— **দু'টো মুখ**। একটা পুরুষের, অন্যটা নারীর। দু'জনেই **অশীতিপর** বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

গম্ভীরকণ্ঠে ওরা বললো, "নেমে এসো, ওই পঞ্চমুণ্ডীর আসন থেকে। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে সাধনা করতে হলে, জানতে হয় আগে—**ও'টা কী** এবং তার ব্যবহারের **কুফল বা উপযোগিতা**। না জেনে, কোন কিছু করতে যাওয়াটা—হয় **মূর্খামী**, নয় ইচ্ছাকৃত **হঠকারিতা**। তলোয়ারের ধারালো **ফলার উপর দিয়ে** দৌড়ানোর মতো।" মৃদু হাসলাম **কৌতুকে** শুধু—তাদের দিকে চেয়ে। মনে মনে ওদেরকে বললাম, "পুলিশের **গুলির চেয়ে, কেউটের ছোবলের** চেয়ে; **পঞ্চমুণ্ডীর** আসন কী **আরও ভয়াবহ?**" **নামলাম** না, ওদের **নির্দ্দেশে**। শুধু এক **অচেনা ঘোর**, ঘুরছে শরীরের খাঁজে-

খাঁজে—যা'কে বলা যেতে পারে, মদ না খেয়েও বেহেড-মাতাল হবার ঘোর; বিনে পয়সায়—সাধনার সুলুক-সন্ধান।

শাসনের সুর, নামাতে পারলো না আমাকে। কঠোর-গম্ভীর সুর, একটু একটু করে বদলাতে লাগলো, বেয়াড়া সন্তানকে ভুলানোর ছলে-বলে। নেমে এসে কালীতলার হোমকুণ্ডের কাছে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম ভৈরব-ভৈরবীকে। গলে জল হয়ে গেল ওরা। কম্বল বিছিয়ে সেখানে বসলো ওরা। আমিও আমার ছেঁড়া গেরুয়ার আসনখানা বিছিয়ে, বসলাম তাদের সামনে। তারপর গাঁজার পুরিয়া দু'টোর, একটা দিলাম ওদের। অপরটা খুলে বিড়ির মধ্যে ঠেসে, ভরে দিলাম বিড়িগুলো। আগুন ধরিয়ে, টানতে লাগলাম যুত করে।

ভৈরব-ভৈরবীও ভাল করে, নখে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে সেই গাঁজার ছড়টুকু, প্রথমে ভিজালো থুতু দিয়ে, তারপরে দু'চার ফোঁটা পেচ্ছাবে; তারপর শেষে ভৈরবীর স্তনের বোঁটা টিপে টিপে; দু-চার ফোঁটা "কোলোষ্ট্রাম" জাতীয় দুগ্ধরস বের করে—দলে ফেললো সেটাকে। ছিলিমের (কল্‌কে) ভেতর পুরে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে, মারলো দু'চারটা লম্বা টান। ফটাস্ করে আগুনের হল্কা জ্বলে উঠলো, সেই কল্কের মাথায়! দমবন্ধ করে, কলকেটা বাড়িয়ে ধরলো—ভৈরবীর দিকে।



কাঁউরে বাবার দর্শন

চোখ দু'টো লাল-লাল হয়ে উঠেছে ওদের। আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ভৈরব-বাবা বড় আদুরে আর প্রশ্রয়ের গলায় বললো ঃ—

"পোলা-পান্ মানুষ ত্যুই। ত্যরে একখান্ গপ্প ক্যই, তাইলেই বুঝ্‌বা ক্যান্ ত্যরে লাম্‌বার ক্যইসিলাম, উই আস্যানের থিকা! পঞ্চমুণ্ডীর আসন—ক্যান(অ) হ্যালা-ফ্যালার বস্তু লয়! মিত্যুরও বারা—হত্যই কৈলাম! পাঁচখান্ মাথা আছে, উডার ত্যলায় মাটির নীচে। মন্তপূতঃ আসন কিনা। ১) নমঃশুদ্দুরের মরার মাথার খুলি, ২) কেউটে সাপের মাথার খুলি, ৩) বান্দরের মাথার খুলি, ৪) নেউলার (বেজীর) মাথার খুলি, ৫) বিরালের মাথার খুলি; এই-গুলান্ দিয়াই পতিস্টা হইসে উই আসন।

—— আপনি কী বাঙ্গাল? পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন? এদেশে কতদিন এসেছেন? আপনারা সাধু, না আমার মত বাঁচবার জন্যে, গেরুয়া পরে নিয়েছেন? ভয় নাই—আমি পুলিশের লোক নই!

—— হ, পাকিস্তান্ থিকাই আইচি। সেই যে সা'চল্লিশের, নুয়াখালীর হিন্দু-মুসল্মানের দাঙ্গা হৈসিল, পালাইয়া আইলাম এ্যা-দেশে পরান্ডা লৈয়া। কত তীত্থই গুরলাম, অ্যার মতন্ তীত্থ আর নাই। আজ ২৫-ডা বসর্, একবার না একবার আহি এহানে। আইজ অহনই আইলাম, ঈশান্ লদীটা পাইরাইয়া। লয়ন-বাবায় আর চিকন্-মায়, গুমাইয়া পর্সে দেইখাই, ইদিক পানে আইয়া দ্যেখল্যম্—তুই বইহ্যা আছস্ পন্সমুণ্ডীর আসনে।

—— আমার এতটুকুও ঘুম আসছিল না। তাই চুপিচুপি বসে পড়লাম এখানে, ব্যাপারটার আগা-পাশতলা বুঝতে! জানতে হবে—এ'টা গপ্পো না সত্যি!

—— ওই কম্মডা, পোলাপানের হুজুগের ব্যাপার লয়—বুজ্লা? পথ্থম্ যহন আহি, সেই দিনডার একখান্ গপ্প—ত্যরে ক্যমু অহনে। মন দিয়া শুন্। মা-অধরেশ্বরীর ঠাঁই এডা—অট্টহাসিনীর থান। অভিচারের ক্ষেত্র এডা—পুণ্যভূমি। সিদ্দ-সাদক ছাড়া, ক্যান(অ) কম্ম হৈবার লয়!

এই গ্যেরাম্-ডার নাম হৈল গিয়া কিনা—অট্টহাস! খালি খালি কী ক্যন নাম হয় বা'-জান? কারণ থাক্তি হৈবো। শিয়ালগুলানের লগে, সে কী খল্ খল্ হাসির দমক। ফ্যার্ মরার হার-গ্যুর্ চিবাইবার করমর্ শব্দ! বুকের ভিত্যর পরাণডায়, কেডায় য্যান্ বরফ্ ঠাইস্যা ধরে! এক্বার দেহি কি, পরাণডা আর বুক্যের ভিতরই নাই, সারা-শব্দ নাই—ক্যান্ য্যান্ খালি খালি ঠেহে! ভয়-ডর আম্যারে য্যান্ গিইলাই ফালাইসে। তারপর দেহি কী, বুকের ভিতর ধুক্পুক্ কর্বার লাগ্সে—হিৎপিণ্ড-ডা। কত রিষি-মাহারিষি যে শুন্সে সেই হাসি; সেইডা লতুন্ কইর্যা নাই বা কৈলাম! হেল্ল্যেগাই নামডা হইসে—অট্টহাসপীঠ।

ক্যন তীত্থের পাশে যদি উত্তরবাহিনী নদ-নদী না থাহে, তাইলে সেডা তীত্থ হয় না—মুনি-রিষিরা ক্যইসে। ত্য' ক্যই কী, অই যে অজয়-নদীডা-কাটুয়ার পানে বৈবার লাগ্সে, সি-ডা কী উত্তর দিগে যাইয়া; ফ্যার্ দক্ষিণ-পূবে বৈতাসে না? এইডাই হৈল গিয়া সিদ্দপীঠের শুদ্দ-লখ্যন্। মা আমার অধরেশ্বরী, এইখান্ডায় থাকবে না ত্য' কী লাবপুরে থাকব? মান্সে কয়, লাবপুরের ফুল্লরাই আদি পিট! কৈলেই হৈল? মায়ের মন্দির রৈলেই, সিদ্দপিট হৈবার পারে না! ক্যাডায় কৈসে ওডা সিদ্দ-পীট? শাস্তরের কথাগুলান কী মিথ্যা হইব?

"অট্টহাসে চোষ্ঠোপাতো, দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতাঃ।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র। সর্ব্বাভিষ্ট (সা) প্রদায়িকা।।"

প্রফুল্ল না হইলে অমন হাসি আহে? ফুল্ল বৈলাই না সে ফুল্লরা! আমাগো

অধরেশ্বরীই হৈল(অ) ফুল্লরা! ভৈরব—বিশ্বেশঃ। লতুন ক্যন কথা মানুম্ না!

ঈশান হৈল গিয়া, অজয়ের শাখা-লদী! শাখা হৈল ডালপালা। শাখা লদীরে কয় কাঁদর? এডা বাঁন্দরের পারা উক্তিই বটে? অট্টহাসের ওই পিছারে, সি-ডা আছে কিনা ক্যও!" সমর্থনের প্রশ্নটা রাখলো, ভৈরব-বাবা উত্তরের আশায়। আমি নিজেই এসেছি, তিন-চারদিন আগে। আমি না চিনি তার কাঁদর বা নদী, না জানি তার ভুগোল আর ইতিহাস! সমর্থন বা অবহেলার, প্রশ্নই আসে না। গাঁজার নেশা ফিকে হয়ে আসছে বলে, ধরালাম আর একখানা গাঁজা-ঠাসা বিড়ি। সাধুবাবাও নেভা-ছিলিমে আগুন লাগিয়ে, মারলো গোটা দুই লম্বা লম্বা-টান। তারপর সেটা সে, ভৈরবী-মার দিকে বাড়িয়ে ধরে, বসে রইলো দম বন্ধ করে—মাথাটা নুইয়ে।

আবার বললাম, "আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন—আরও শুনি-জানি। আমি জানি না কিছুই—বুঝি না কিছুই! ৩/৪ দিন মাত্র এসেছি এখানে। কোথায় যে কী আছে, কিছুই আমার জানা নাই। আমি এখানে এসেছি পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে থাকতে—আমি নক্সালী-রাজনীতি করি।" কটমট করে তাকালো কাঁউরে-বাবা। তারপর অনেকক্ষণ পরে বললো—মায়ের ত্রিশূল-ডাই তাইলে, নিজের হাতে তুইল্যা নিছস্? খালি মারবার চাস, মরবার চাস্ না? হক্কলেরেই মর্বার লাগব! কেউই অমর লয় রে ব্যাটা!"

আবার শুরু করলো তার কাহিনী সে। বললো, "সেই ভৈরববাবা প্রায় লব্বুই বছর বয়স। এই ভৈরবীমার বয়স তহন বরই কম। কত আর হইবো তহন্—এই পঁচিশ কী তিরিশ বটে। দুই জনেরই গলায়-হাতে আছিল রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে বর বর সিঁন্দুরের ফঁটা। কাপালিকের মতনই ভয়ংকর আছিল শরীলডা। জন-বিরল জা'গায়, গা-চমচম রাইতে, পরাণডায় কী যে আঁকুপুঁকু লাগত, হেইডা ত্যরে বুজাইবার পারুম্ না! ওইগুলান্ হৈল অনুববের ব্যেপার!

আমাগো দেইখাই, বুরুর চুল্গুলান্ টাইন্যা তুইল্যা, চিন্বার চ্যাষ্টা কর্ল(অ)। গঁপ-দারিভরা মুক্-ডা য্যান্ জিগাইল(অ)—ত্যুমরা কে বট(অ)? বয়ে-বয়ে কৈলাম, 'আপনেরে পনাম কর্বার লেগা আইল্যম্ বাবা।' পসন্ন হৈল(অ)—বরই পসন্ন হৈল(অ)। ইশারায় কৈল(অ)—কয়দিন থাহ(অ)। থাকল্যম্ কয়ডা দিন এহানে। বুইজ্যা নিতে হৈব(অ) কিনা—তন্ত্রের ব্যাপার-ডা!

একদিন বাবায় কৈল, "আইছ ত্য' জানবার লেগ্যা, শিক্বার লেগ্যা। আইজ রাতে ঝা দ্যাখ্বার-জানবার চাও, ওইডাই হইব(অ)। মনে মনে পস্তুৎ হওন্ লাগব(অ)। মায়েরে ক্যও, অংশ নিব কিনা? লুত্যন্ আইচে কিনা! এই সকৃতি-পিটের আমাগোর নিয়ম-কানন্, অর সজ্য অইব ত্য'?"

আম্যু হৈলাম **কাঁউরে-বাবা**। একবার তাকাইলাম **এই ভৈরবী মায়ের দিগে**। তারপর আমার দিষ্টির মানে **বুইজা লৈয়া,** সরাৎ কইর‍্যা **খুইল্যা ফালাইল,** অ্যর গেরুয়া শারীখান্—এক্কেরে **দিগম্বরী মুত্যি হইয়া, খারাইল** বাবার-মায়ের সামনে। পরীক্যা কেউ কর্লে, অ্যর ম্যাজাজ্ খান্ বরই **গরম হইয়া** উঠে কিনা! অবাক চোখে চাইলো **লয়নবাবা**, এই পেত্থম্ য্যান্ অ্যর মতন্ একখান **ডানপিটা মাইয়ারে দ্যাখ্‌তাছে**! কইলো—"তুমি আমার **ভৈরবী হইবার পারবা**? বরই **কোঠিন পথ—বুইজ্যা-হুইনা** উত্তর দিবা!"

——ক্যান্ পারুম্ না? আম্যু কী—কমতি আছি নাকি? নমশুদ্দুরের মাইয়া আম্যু—ডরাই না! ভূতেরেও না, ভগ্‌মানেরেও না। পরীক্যা করেন আম্যারে! কত্তো ক্ষ্যাম্‌তা আছে—দেহি আপ্‌ন্যের!"

বুজ্‌বার পারি নাই, বাবার লগে **ঐ মতন্ কু-আলাপ** করব(অ)! লজ্জায়—ব্যাদনায় মাথাডারে **নীচা কর্লাম,** বুজলা? সন্দা আইল—রাইৎ আইল, বুক্‌ডা আমার **দুর্দ্দুর কর্বার লাগ্‌সে**! কী জানি—**কী হয়**! এই **আবাগীর বিটীরে—টেরাইয়া-টেরাইয়া** সারাডা দিন দ্যাখ্‌লাম। সেদিন-ডা আছিল **কিষ্ণা-অমাবস্যা—কুজবার(মঙ্গলবার)**—বরই পুণ্যলগ্ন! সন্দা থ্যিকাই শুরু **অমবস্যা**। ভৈরব বাবা-মায় কৈলেন, "ওই যে **'পন্‌সমুন্‌ডির আসন'** দ্যাখ্‌তাছ্—এহানেই হৈব **'পন্‌স(অ) ম-কার'**। ত্যুমরা খালি **দ্যাখ্‌বা** আইজ। আমি ওই **রুহিনী মায়েরে** লৈয়া ধ্যানে ব্যসুম্। অ্যর **যোনীপীটে,** লিঙ্গের **ঠ্যক্কর্** মারুম্!

রাইত দশডা বাজ্‌ল(অ)। **শিয়ালগুলান্** আসন্‌ডার **পিছারে,** ঝুপের মইধ্যে আইয়া, **'উক্যা-উয়া'** কইর‍্যা ডাইকল্য(অ)! পূজা কর্ল(অ), আরতি কর্ল(অ) অ্যরে ভৈরববাবা—**মা-কালীর পারা**। **রুহিনী-মাও,** তাই কর্ল(অ)। তারপর মাছ্ **খাইল(অ),** মান্‌স খাইল(অ)—শ্যাশে; দুই ঘটি কইর‍্যা **মদও** দুই জনায় **খাইল(অ)**! পদীপের আলুয় **হক্ক্যলই** দ্যাখ্‌ল্যম পরিস্কার—বুজ্‌লা কিনা! রুহিনী-মায় **ল্যাংডা** হৈল(অ)—বাবায় **ল্যাংডা** হৈল(অ)। অ্যরে তার কোলে বসাইল(অ) বাবায়—**সামনা-সামনি**। দুই-জনায় চাইল(অ)—দুইজনার পানে! উঃ, সে **কী সুন্দর দিষ্টিপাত**—য্যান্ মা **পার্বতী** বাবা **শিবেরে** দ্যাখ্‌তাসে—আলিঙ্গন কইর‍্যা!

শুরু হইল **সাপের ফুঁস্‌ফুঁসানীর** মতন নাসা-গজ্জন। **রমণের তালে তালে** গজ্জন আরও বারল(অ)! এই **রুহিনীমায় য্যান্** বাবারে **পুরাডাই গিল্‌বার চায়**। **বিধ্য-মানুস** বাবারে য্যান্ মনে হৈল তহন, একখান্ **তরতাজা যুবক**। কেডায় য্যান্ **শংখ বাজাইল**। আর সঙ্গে-সঙ্গে **বুরবুর কইর‍্যা,** মিষ্টি ফুলের **গন্দ** আইবার লাগল(অ)। **মাতাল্ করা** সে গন্দই বটে! একডা স্বগ্নীয় **আলো** য্যান্ লাইম্যা আইল, **পন্‌সমুন্‌ডীর আসন্‌ডায়**!

দ্যাখ্‌ল্যম্ দুইখান শরীল্—**ধুঁয়ার পারা মিলাইবার লাগ্‌সে** বাত্যাসে! আশ্‌চয্য হৈলাম—বরই আশ্‌চয্য হৈলাম—জীবনেও দেহি নাই আর **অমন কাণ্ড ক্যন(অ) দিন**। **কাইন্দ্যা ফালাইল্যম্ আলন্দে**। চক্যু বুজ্‌ল্যম্ লিমিষের লেগ্যা। অগো আর দ্যাখ্‌বার পাইল্যম



না। ভৈরবী-চিকন্ মায় কৈল—'কান্দ্ ক্যান? ফিইর‍্যা আইব অহনই। তাকাইয়া থাহ আস্যানের পানে'। এট্টু-এট্টু কইর‍্যা কুয়াসার পারা আইয়া আসনডায়, ফ্যার অরা মান্‌সের রূপ নিল! রুহিনী মায়ের পায়ের তলায়, গরাইছে তহন লয়ন বাবা, শিবের পারা। গর হৈয়া পনাম কর্লাম্ অগো—বরই শধ্যায়!"

শেষ করলো কাহিনী তার—কাঁউরে বাবা। তাকালাম এবার রোহিনী-মার দিকে। বৃদ্ধা-তরুণী ভৈরবী, শাণিত দৃষ্টি দিয়ে দেখলো আমাকে সে একবার। পরে বললো, "কী জান্‌তে চাস্ রে ত্যু? তন্ত্রের ই জগতে ত্যুর, আসবার কতটুকান্ ইচ্ছা আছে বটে? দুই দিন ভূত্যের চড় খাইলে পলাইবি! হুঁ! ভগমান্ ধরবি? ভগ্‌মানখে ভূত্যেরা বেড় দিয়া রাখ্যে বটে! উ বেড় কেট্যা, তুখে ভগ্‌মান্‌খে ধর্বার লাগব্যে। পারবি ত্যু—বল? লিঙ্গটাকেও ত্যুর আ-জাগায়/কু-জাগায় গলাইলে চলব্যাক্ লাই! মাগী ভুগ্ করবার লেগা, লিঙ্গটা লয়! কুত্তায় অমন্ করে! আমাদ্যের পায়ে হাত দিয়া, শপথ কর ক্যানে—তবেই ত্যুকে বুলব সব গুপন্ কথা! মান্‌ভুমের মেয়্যাঁ আমি; মান্য আমাখে করতে লাগ্‌ব্যাক্!"

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

ভৈরবী রোহিণী-মা : তন্ত্রসাধনার গূঢ় উপদেশ

ওদের পায়ে হাত দিয়ে **শপথ** করলাম যে, "**সন্তান উৎপাদন ছাড়া**, আমি আর **নারীসঙ্গ** করবো না। পঞ্চ ম-কারের **গোপন কথা**, তুমি বলো মা আমাকে। আর তা' করার অধিকার, **যেন আমি পাই**। সন্তানের এ' প্রার্থনাটুকু তুমি **পূরণ করো মা**। সে বিদ্যাকে নিজের মধ্যে, সযত্নে **লালন** করবো আমি, যা তুমি দয়া করে **দেবে আজ**! **দীক্ষা** দাও আমাকে ওই মহামন্ত্রে তুমি!"

প্রীত হলো **রোহিণী-মা**। বুকে টেনে নিয়ে **মুখে-মাথায়-লিঙ্গে**, চুমু দিয়ে দিয়ে বার বার **পাগল করে তুলে**; বললো **পঞ্চ ম-কারের ইতিহাস**—আর তার **প্রতিটি গ্রন্থী** যেন খুলে খুলে। সেই বয়সে সবটুকু তার, তখন বুঝিনি **গভীর** করে। আজ মনে হয়—এখন যদি তার **সঙ্গ পেতাম**! গাঁজায় দম দিল **কাঁউরে বাবা আবার**। নৈবেদ্যের মতো একটা গাঁজায়-ঠাসা বিড়ি ধরিয়ে, তুলে দিলাম **মার হাতে**। **প্রসন্নময়ীরূপে শুরু করলো সে** ঃ

''তোর অ্যাখন্ **সুস্ত শরীরট্যা আছে**, **যুউবন আছে**। খুজতে চাইলে অ্যাখন্ থেকা লেগা পড় ক্যানে! জাত ত' মাত্তর দু'ট্যা রে। অ্যাক্‌টা **মেঁয়্যা**, আর অ্যাক্‌টা **পুরুষ**। সংসারে থাক্‌লে, তার ধম্ম আল্দাহবেক। সিখানে তন্ত্রধম্ম **চলব্যাক্ নাই**। সংসারের ধম্ম ত্যাখন্ মানতে হবেক। বামুনের ধম্ম মানলে, খালি পূজা কোঁরা-কোঁরা সংসার চালানা যায়—কিন্তু সেখান থেকা **ভগমান্ পালায়**। **তন্তধম্মই আসল**—বুজ্‌লি বাবা!

সংসারডা **সিষ্টি করবার ত্যরে**, ভগ্‌মান ধরার ত্যরে লয়! ভগ্‌মান সংসারে থাকে না, **থাকে শশ্যানে**। সংসারের প্যাঁচ-পাঁচে, সে মোটেই **থায় না**। ভগ্‌মানের রাস্তা **সরল**, ত্যুদের রাস্তা **প্যাঁচের**। প্যাঁচ কোষা ত্যুরা **কাঁদিস যখুন**, ভগমান্ **তখন হাঁসে**। সিষ্টিছাড়া কাজ কোরাঁ, সস্তি তার কাড়িস নি—সেটা ভাল হবেক নাই। যত রকম দন্দ ত' **জাতের মধ্যে**। কে বনাইছ্যে ক'—সি-গুলান্? ত্যু-আমি না? ভগমান্ বনাইছ্যে নাকি? বামুণ আর ছত্রী জাতটা **বড্ড পাজী**। এ্যারাই ডুবাইছ্যেঁ, দেশটাকে-ধম্মকে।

*শিব য্যাখন্ আইল সাইবেরিয়ার কাজাখীস্থান্ (**বৃষ্যভূমি = উত্তর কুরুবর্ষ বা চৈত্ররথ উদ্যান**) থেকা, সে ত' আস্‌লো **লাসার** ভিতর দিয়া। টিব্যট্টের ভিৎরে—লাসা। অত পথ কী সে হেঁটো আসতে পারবেক্? না সে **'লিছ্‌ল'** একটা **চাম্‌ড়ী ষাঁড়**। তার নাম হ'ল্য—**নন্দী**।*

এ্যাখন্ বুজবার লাগব্যেক, সি কথাগুলার মানে। **বুজা অত সহজ না**। বোড়ই কোঠিন পৎ!

ভাষার অন্তরায় হচ্ছে— শুদ্ধ বাংলায় লিখলাম

এই যে সাইবেরিয়া বা **বৃষ্যভূমি**, এর বাংলা হলো—**গো-চারণভূমি**। গোরু-মোষ-ঘোড়া-ছাগল-ভেড়া-চমরীগরু, সবই চরাতো তৎকালীন সময়ে, ওই পাহাড়ী আর সাইবেরিয়ার মালভূমির মানুষেরা। হিমালয়ের Western Range **কারা-কোরামের ঢালে ঢালে**, পামীরের-তিব্বতের-সাইবেরিয়ার **মালভূমিতে**; বাস করতো তখন এই **পশুপালক গোষ্ঠীর** মানুষেরা। এদের আর এক নাম **আহীর-গোষ্ঠী**।

খোলা প্রান্তরে পশুদের ছেড়ে দিয়ে, অবাক হয়ে **ভাবতো তারা**, এই বিরাট বিশ্বের সেই **অদৃশ্য কারিগরের** কথা। ধেয়াতেধেয়াতে, একদিন **ধ্যান জমে উঠেছিল**—ওই শিবের মধ্যে। সেই সুগভীর ধ্যানেই সে বুঝে ফেলেছিল, **কীসে কী হয় বা হচ্ছে**। তাই **ব্রাহ্মণ্যবাদ আর আর্য্যবাদকে, বাদ দিয়েছিল** সে। আঁকড়ে ধরেছিল আপন **আবিষ্কৃত পরমগুহ্য** বিদ্যাকে, প্রচারেও নেমেছিল সেদিন থেকে। সে নিজেও ছিল, ওই **পশুপালক গোষ্ঠীর**।

পশুমৈথুন দিয়ে শুরু হয়েছিল, তার **ধ্যানের জীবন**। আজও দেখতে পাবি, বছরের পর বছর যারা পশু চরায়, সংসারে স্বজনের কাছে ফিরতে, **সময় পেতো না** যারা; পশুপালনই ছিল যখন এক **অর্থকরী বিদ্যা**; তখন শরীর-মনকে **বশে রাখতে প্রতিদিন পশুকে রমণ** করতো তারা। পশুর পালের মালিকও ছিল সে একজন। তাই সে **পশুপতি**। পশু (Beast-like) সে **নিজেও ছিল** একজন। কেন না, **পশুত্বকে সে তখনো** ঝেঁটিয়ে **দিতে পারেনি**। নিজেকে তখনও সে ঠিক ঠিক **চিনে উঠতে পারেনি**।

লক্ষ লক্ষ পশুপালন করতো তখন দেবতারাও। দেবতারা-ঋষিরাও তখন **পশু-মৈথুন করতো**; শরীরী চাহিদার জেরে। **অজন্তা-ইলোরা-খাজুরাহো গিরিগুহায়**, দেখবি সে সব দৃশ্য **উৎকীর্ণ করেছে ঋষিরাই**। কোন **ভাস্করের কর্ম নয়**, জানবি ওগুলো। সবাই রমণ করে, কিন্তু রমণের **কৌশল আয়ত্ত্ব করে** খুবই **কম লোক**। আর তা' নিয়ে **গবেষণা করে** দু'-একজন মাত্র?

পশুমৈথুন করতো—**ঋষি নারদ, বিভাণ্ডক মুনি, ঋষি কশ্যপ, সূর্য্য, পবন**, কত নাম বলবো? রামায়ণ শুনে নে বাবা। বাল্মিকী রামায়ণ থেকেই জেনে নে। **থান-ইঁট-মার্কা রাস্তার রামায়ণ** পড়িস না।

" ভগবান বিষ্ণু মহাত্মা দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা সমগ্র দেবতাকে বলিলেন,—হে দেবগণ! বিষ্ণু আমাদের হিতাকাঙ্খী। তিনি মহাবীর হইলেও, তাঁহার সাহায্যের জন্য, কামরূপী বীরদিগকে সৃষ্টি কর। উহারা সকলেই মায়াবী, বলশালী, বায়ুতুল্য বেগবান, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমী, সন্ধি-বিগ্রহাদি উপায়াভিজ্ঞ,

দিব্যদেহধারী, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যানিপুণ এবং অমৃতভোজী দেবগণের ন্যায় অমর হইবে। তোমরা অধুনা প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, পন্নগকন্যা, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীদিগের গর্ভে, নিজ নিজ তুল্যপরাক্রমী পুত্রদিগকে, বানররূপে সৃষ্টি কর। ভল্লুকবর জাম্ববান্‌কে পূর্ব্বেই আমি সৃষ্টি করিয়াছি। আমি হাই তুলিতে ছিলাম, এই অবস্থায় সহসা আমার বদন হইতে, তাহার জন্ম হয়।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, দেবতারা সকলেই তাঁহার আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া, বানররূপী পুত্রদিগকে উল্লিখিতরূপে উৎপাদন করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ, সিদ্ধ বিদ্যাধর ও নাগগণ এবং চারণগণ, ইঁহারাও বানররূপে বনচারী বীর পুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র নিজ-তুল্য পরাক্রমশালী বালীকে, সূর্য্য সুগ্রীবকে এবং বৃহস্পতি তার নামক মহাকপিকে, উৎপাদন করিলেন। বানরবর তার, সমগ্র প্রধান প্রধান বানর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্। বানর (গন্ধমাদন), কুবেরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। বিশ্বকর্ম্মা (নল) নামক মহাকপিকে, উৎপাদন করিলেন। অগ্নিতুল্য প্রভাশালী বানর (নীল), পাবক হইতে উৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন রূপবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে (মৈন্দ ও দ্বিবিদ): বরুণ হইতে সুষেণ; মহাবল পর্জ্জন্য হইতে শরভ এবং পবন হইতে শ্রীমান্ হনুমান উৎপন্ন হইলেন।

হনুমানের দেহ বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়; ইনি বেগে গরুড়তুল্য এবং সমুদয় শ্রেষ্ঠ বানরসমাজে, ইনি বলবান্ এবং বুদ্ধিমান্। এইরূপ সহস্র সহস্র বানরবীর উৎপন্ন হইয়া, রাবণবধে উদ্যত হইলেন। এই সকল বানর অসাধারণ-বলবীর্য্যশালী; ইঁহারা আকারে এক একটি পর্ব্বত ও হস্তীর ন্যায়। এই বানরেরা ঋক্ষ, বানর ও গো-পুচ্ছ, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া—সত্বর ধাবিত হইল। যে দেবতার যেরূপ রূপ, যেরূপ বেশ ও যেরূপ পরাক্রম, তাঁহার পুত্র বানররূপে, তাঁহারই তুল্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। যাঁহারা গো-লাঙ্গুল-জাতীয় বানর হইয়া জন্মিল, তাঁহারা স্ব স্ব জনক অপেক্ষাও, কিঞ্চিদধিক বিক্রমশালী হইয়া উঠিল।

এইরূপে বিখ্যাত বিখ্যাত দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, তার্ক্ষ্য, যক্ষ, নাগ, কিংপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, চারণগণ হৃষ্টান্তঃকরণে অপ্সরা, বিদ্যাধরী, কিন্নরী প্রভৃতিতে যে সহস্র সহস্র বানর সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারা সকলেই ভীমকায়, বনচারী, কামরূপী, রূপানুরূপ বলধারী ও যথেচ্ছ বিচরণশীল। ইঁহারা দর্পে সিংহসদৃশ ও বলে শার্দ্দুলতুল্য; ইঁহারা সকলে পর্ব্বত ও শিলানিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করে; সকলেই সর্ব্বাস্ত্রপারদর্শী, বিশেষতঃ নখ ও দশনপ্রহারে বিলক্ষণ পটু।

ইঁহারা শৈলসমূহকে বিচালিত, স্থিরতরুগণকে বিচূর্ণিত, বেগবলে সরিৎপতি সমুদ্রকে বিক্ষোভিত, পদভারে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে ও মহাসমুদ্রে সন্তরণ করিতে সমর্থ। ইঁহারা নভোমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, জলধরদিগকে ধারণ করিতে এবং ঘোরসিংহনাদ-

দ্বারা শব্দায়মান, বিহঙ্গমগণকে অধঃপাতিত করিতে পারে। এইরূপে কামরূপী শত শত সহস্র সহস্র, বানরযূথপতি উৎপন্ন হইল।

ঐ সকল যূথপতির মধ্যে আবার কতকগুলি, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীর যূথপতি জন্মগ্রহণ করিল। ইঁহাদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র বানর, ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে এবং অপর অনেকে অন্যান্য পর্ব্বতেও কাননে, বাস করিতে লাগিল। সেই যূথপতি বানরবৃন্দ ইন্দ্রনন্দন বালী ও সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব, এই দুই ভ্রাতারই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি বানরবীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নল, নীল, হনুমান্ ও অন্যান্য যূথপতিদিগের আশ্রয়ে রহিল। ইঁহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় বিচরণকালীন, অনায়াসেই নিগৃহীত করিতে লাগিল। মহাবাহু মহাবল বালী, ঋক্ষ ও গো-পুচ্ছ বানরদিগকে, নিজভুজবলে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই রূপে রামচন্দ্রকে সাহায্য করিবার জন্য নানাস্থানে অবস্থিত, নানালক্ষণলক্ষিত মেঘবৃন্দ ও গিরিশৃঙ্গতুল্য, মহাবল ভীষণাকৃতি বানরবৃন্দদ্বারা, এই শৈলসাগর-কানন-পরিবৃতা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ......আদিকাণ্ড (বালকাণ্ড)/অধ্যায় —১৭শ সর্গ

টীকা ঃ- **বানর** মানে **'বাঁদর'** নয়। আসল মানে হলো—**নর নয় যারা** = পশু। এটাকে ভাঙ্গলে আরও জানতে পারবি যে—পশ্ (বন্ধন করা) ধাতু + উ (= জ্ঞান নাই যার) = অজ্ঞানের দ্বারা আবদ্ধ যে প্রাণী = বা-নর বা পশু, **বাঁদর** (Ape/Monkey) নয়!

তাহলে বুঝতে পারছিস যে, **প্রাণী সৃষ্টির জন্যই** রমণের দরকার। **ফুর্ত্তি লুটবার** জন্য নয়। রমণে আনন্দটা কোথায়? শরীরের ওই **শিরশিরানিটুকু** না? ওই ফুর্ত্তি লুটতেই এত কর্মকাণ্ড? অথচ বুঝে দেখ যে, **জীবনের উত্তম রসটুকুকে** বিসর্জন দিতে হয়, না হলে তৃপ্তি হয় না। **পঞ্চ ম-কারে শিরশিরানি হয় শরীরে** দু'-আড়াই ঘন্টা ধরে; কিন্তু **বীর্য্যপাত হয় না—ওটা বারণ**, এবং বের হতে **দেওয়া হয় না**। কোন কর্মটা তাহলে ভাল? দু'মিনিট না দু'ঘন্টা? **ক্ষয় করা, না সঞ্চয় করা**? এই পদ্ধতিটা নিয়ে **রিসার্চ বা গবেষণা করেছিল শিব। প্রথমে পশুকে দিয়ে, পরে নিজের বৌকে (দুর্গাকে) দিয়ে।**

তার ভাতার শিবের, দুর্গা ছিল সাধনসঙ্গিনী বা **Research Fellow বা সহকারী গবেষক**। আর তাদের **গবেষণাটা ছিল, ওই শিরশিরানি বা Orgasm নিয়ে**—মানুষের উপরে **আবিষ্কৃত সূত্র আর তার প্রয়োগ** বা application নিয়ে। যেখানে যত শিবলিঙ্গ তুই দেখবি, তার 98%-এর সাথে **যোনীচিহ্ন সাঁটা**। মানুষের যোনী তুই দেখেছিস, আর দেখেছিস পশুরও। দু'টো কিন্তু **একরকম দেখতে নয়**।

পশুদের যোনীমুখ চাবির গর্ত্তের মত , আর মানুষের যোনীমুখ, চাবির গর্ত্তের উল্টোটা— ; যার নাম 'ভগ'। শিবের চোখগুলো ওই উল্টো-চাবির গর্ত্তের মতো। তাই শিবের অপর নাম 'ভগনেত্র'। কোথাও কী তুই দেখেছিস মানুষের যোনীচিহ্ন জড়িয়ে আছে, শিব-লিঙ্গের সাথে? যা' জড়িয়ে আছে—তা' কী পশুর যোনী নয়? পশু চিহ্ন হ'তে গেল কেন, বলতে পারবি? তুই এত বোকা কেন?

যে আবিষ্কার করলো, তারই না মনোগ্রাম বা পরিচয়ের মোহর লাগানো থাকবে? ওটা পশুপালকের মনোগ্রাম। পশুদের দৃষ্টি উর্ধ্বদিকে হয় না, হয় নীচের দিকে। যোগ ধ্যানের সময়, দৃষ্টিকে উপরের দিকে তুলতে হয়, আর সেটা করতে পারে মানুষ। পশুত্ব থেকে মুক্তি পেতে তাই লাগে—মানুষের যোনী—পশুযোনী নয়। তাহলে দেখ্ যে—শিব ছিল পশুপালক, এবং লক্ষ লক্ষ পশুর মালিকও ছিল সে। পশুপতি নামটা, এমনি কেউ তাকে দেয়নি। সে নিজের নামের ওই শিলমোহর বা মনোগ্রাম বানিয়ে, প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। যা'তে ওই ফর্মূলা, অন্য কেউ না নিজের বলে চালিয়ে দেয়! ঠিক যেমন তোদের কপি-রাইট আইনটা।

আরও পরিষ্কার করে বলি যে, যতক্ষণ তুই পাশব প্রবৃত্তির মধ্যে থাকবি, লিঙ্গ আর যোনীর খেলায় মশগুল্ থাকবি; ততক্ষণ তোর মুক্তি নাই। নারীর যোনীও তখন কুত্তা-যোনী। পশুত্ব সেখানে চটচটে আঁঠার মত ঝরছে, তোকে সেঁটে ধরতে। তোর লিঙ্গ তখন সেখানে আবদ্ধ। আর তুই বুঝলি, সেটাই বুঝি তোর শেষ গন্তব্য বা **destination.** শিব তখন মুচকী হাসে আর বলে, "তাহলে, আমিও তো ওখানে থাকতাম রে! আমার এই উপরের চোখের দিকে (ভগনেত্রে) তাকা, তাহলে বুঝবি—পশুযোনী লাগে পশু থাকলে, জগৎকে জয় করতে চাইলে, লাগে মানবী বা নারী-যোনী। সেখানে কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠে, তোকে ঠেলে দেবে, স্বর্গের দরজা-গোড়ায়। পশুর কুণ্ডলিনী জাগে না, জাগে মানুষের। ভগনেত্র তাই শরীরের উপরদি.৮., কপালে—সকলের কপালটা ফেরাবার জন্য।"

পশুকে রমণ করে করে, যে দেহজ শিরশিরানির স্বাদ—সে গভীর করে পেয়েছিল; সেটাই সে এবারে apply করলো, মানুষের উপর, অর্থ্যাৎ তার স্ত্রী দুর্গার উপর। আর তা' করতে গিয়ে সে দেখলো, দুই দেহ যখন একান্তভাবে পরস্পরকে চাইছে, তখন এক বিদ্যুৎ তরঙ্গের আবহ (Magnetic force) তৈরী হচ্ছে—Without any disturbance or hindrance.

সেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ **(Magnetic wave)** তখন, শরীরের শিরদাঁড়া বেয়ে প্রবাহিত হতে চাইছে, ছড়িয়ে পড়বার জন্য। পথ না পেয়ে, ধাক্কা মারছে মাথার কোটরের **Thalamus** গ্রন্থীতে! আর যেই না ধাক্কা মারা, অমনই সৃষ্টি হলো আলোর—কোটি কোটি ভোল্টের—ঠান্ডা-ঠাণ্ডা (কোটি সূর্য্যঃ সুশীতলম্ .... পাতঞ্জল যোগদর্শণ)। ধাতুগত বা

ঘর্ষণজনিত যে আলো—তার **তাপ উৎপন্ন হয়**।—**আর জান্তব** আলোর কোন **তাপ থাকে না**। যেমন **জেলিফিসের** আলো, **জোনাকীর** আলো, **ফসফরাস** আছে—এমন নিঃসৃত **লালার** (Saliva) আলো, কেঁচোর গায়ের নিঃসৃত **লালার** আলো ইত্যাদি।

আর শিব-শিবানী দেখলো, **তারা মিলিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে হাওয়ার মধ্যে**। বেশ কিছুকাল পরে **ফিরে আসছে আবার স্বরূপে,** যখন তারা বিচ্ছিন্ন একে অপরের থেকে। **ইউরেকা-ইউরেকা** বলে, সেদিনও সে চেঁচিয়ে উঠেছিল—আর্কিমিডিসের মতোই—যার সংস্কৃত ভাষ্য হলো—**শিবোহম্-শিবোহম্** (I am the Lord of the Universe–I've got the Way) .

আর শিবানীও বুঝতে পেরেছিল, নিজেকে **ঈশ্বরীরূপে সেদিন**। তাই তাকেও বলতে হয়েছে—"**অহম্ সা ঈশ্বরী = 'হম্ + সা + ঈশ্বরী = হংসেশ্বরী (দুর্গা)**। হাঁসের পিঠে চড়া আমি কোন **মাগী নয়**, বুঝলি? পাশব প্রবৃত্তির **ঘোরপ্যাঁচ** আর **মারপ্যাঁচে** পড়ে চেল্লাছিস? মুক্তি পাচ্ছিস না? তবে আয়—যাগযজ্ঞ করতে হবে না, লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূজাপাঠও করতে হবে না। শুধু লিঙ্গ আর যোনীর **খেলাটা শিখে** নে; সব দুর্গতি চলে যাবে তোদের—**পঞ্চ ম-কার** কর, মদ্য-মাংস-মুদ্রা-মৎস্য-মৈথুনই হ'ল—আমার কাছে আসবার **গেট-মানি** (Gate-money)!"

তোরা যেমন আজকাল, **বাঁদর, গিনিপিগ, ইঁদুরের** উপরে, তোদের আবিষ্কারের ফর্মূলা **অ্যাপ্লাই** করিস; তারপর শেষে অ্যাপ্লাই করিস **মানুষের উপর**—তেমনি শিবও **confirmed হ'তে**, দুর্গার উপরে এ্যাপ্লাই করেছিল ফর্মূলাটা। পক্ষান্তরে, নারীরাও পশুমৈথুন করাতো নিজেদের উপর। পশুর উপর প্রয়োগে, শরীরে **শিরশিরানি** আসতো নিজেদের বটে; বাধাও ছিল তাতে অনেক। হাজারো **বাধা আর বিপদ** ছিল তাতে। শ্রদ্ধার-সম্মতির **নিবিষ্টতা** ছিল না সেখানে; উভয় পক্ষের **সায় ছিল** না সেখানে; অনুভবের মূল্য দিত না কেউ একে অপরকে। সেখানে ছিল **শুধু ভোগ একে অপরকে, শক্তি আর বুদ্ধির জোরে। সাধনায়-গবেষণায় জোর চলে না—চলে বুদ্ধি আর যুক্তি**।

মানুষের বেলায় তা' হলো উল্টো। সেখানে ভোগ নয়—আছে, সম্মতি আর সম্ভোগ, উদ্‌ভিন্নতা নয়—আছে উদযোগ্, আছে বিজ্ঞানকে ধরা, আর অজ্ঞানকে ঝেঁটিয়ে দেওয়া মন থেকে— যাতে করে পাশববৃত্তি-সম্পন্ন মানুষ (পশু), পাশববৃত্তি ত্যাগ করতে পারে—আসব (মদ্য) পান করে—-যেটা হলো পশুত্বকে ঘুম পাড়ানোর মূল উপাদান বা main ingredient; যেটা ঠেলে নিয়ে যাবে সাধক-সাধিকাদেরকে (Research Scholars), পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে— মৈথুনের কলাকৌশলের মধ্য দিয়ে।

মৈথুনের আগে ওই যে পূজা বা ন্যাস্, সেটা কী বলতো? পূজা হলো—মনে মনে উভয়ের মধ্যে, শ্রদ্ধার ভাবকে জাগিয়ে তোলা। ভাবটা যেহেতু শরীর

আর মন নির্ভর, তাই শরীরের বিভিন্ন সেন্সিটিভ্ জায়গাগুলোকে touch করতে হয়; ওই ভাবের সাথে তন্ত্রীগুলোকে সমান তালে জাগিয়ে তুলে—সঙ্গমের উপযোগী করে তুলতে। যেমন—

১) ঋষ্যাদি ন্যাস :—

(ক) মাথায় (Head) ঃ— ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ

(খ) মুখে (Mouth) ঃ— ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ

(গ) হৃদয়ে (Heart) ঃ— ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তি দেবতায়ৈ নমঃ

(ঘ) গুহ্যে (Anus) ঃ— ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ

(ঙ) পাদদ্বয়ে (Feet) ঃ— ওঁ স্বাহা-শক্তয়ে নমঃ

(চ) সর্বাঙ্গে (Whole Body) ঃ— ওঁ চণ্ডিকায়ৈ/কালিকায়ৈ নমঃ

২) করন্যাস :—

(ক) বুড়ো আঙ্গুল (Thumb) ঃ— ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠ্যাভ্যাং নমঃ

(খ) তর্জ্জণী (Fore-finger) ঃ— ওঁ হ্রীং তর্জ্জণীভ্যাং স্বাহা

(গ) মধ্যমা (Middle finger) ঃ— ওঁ হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্

(ঘ) অনামিকা (Ring finger) ঃ— ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং

(ঙ) কণিষ্ঠা (Little finger) ঃ— ওঁ হ্রৌং কণিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্

(চ) করতল পৃষ্ঠ (Tops of Palms) ঃ— ওঁ হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্

৩) অঙ্গন্যাস :—

(ক) হৃদয় (Heart) ঃ— ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ

(খ) মাথা (Head) ঃ ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা

(গ) শিখা (Pig-tail) ঃ ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্

(ঘ) কবচ (Safe-Guard Locket) ঃ ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং

(ঙ) তিন চোখে (Three-eyes) ঃ ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্

(চ) করতলপৃষ্ঠ (Tops of Palms) ঃ ওঁ হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এবারে কী বুঝলি যে, প্রতি অঙ্গে **বিশেষ পদ্ধতিতে** touch, Pressure, কিম্বা

molestation করলে, শরীরে-মনে একটা **rapid শিরশিরানির** আবহ্ তৈরী হয়? আর নারীকে বা পুরুষকে **পূজা করার কারণটা কী**? তার মন আর শরীরকে **তৈরী করে** নেওয়া, শুধু ঘন্টাভর **উদ্দাম সঙ্গমের জন্য**!

এবারে বলবো—**শিব কী সত্যিই ওই**, পামীর-সাইবেরিয়ার মালভূমি **উত্তর কুরুবর্ষ** থেকে এসেছিল, তার ফর্মূলাটা ছড়িয়ে দেবার জন্য? উত্তর হলো—**হাঁ, তাইই**! সে ছাড়া অন্য কেউতো আর ওই ফর্মূলা **আবিষ্কার করেনি, এই আজব শরীরী কসরতের**! এই সাধনা করতে গেলে, চাই বন-বাদাড়-শ্মশান-মশান। কেন না, বড়ই **গোপনীয়তা** লাগে এ'টাতে। প্রথম কারণ :- চরমভাবে **নিবিষ্ট** হবার জন্য। আর দ্বিতীয় কারণ :- আর্য্যরা এ'টা মানেনি, তারা **বিদ্রোহ** করতে পারে বলে। ওদের কাছে এ' পদ্ধতি **অরুচিকর** আর **ঘৃণ্য** এবং **ম্লেচ্ছ** বলে!

শিব কিন্তু তারও ব্যবস্থা করলো। তৎকালীন সময়ে, মৃতদেহকে **খণ্ড খণ্ড করে কেটে, ছড়িয়ে দেওয়া হতো**; গোটা কুরুবর্ষ দেশের কোণে কোণে। সাধনার বা **তপস্যার তাপে তাপিত যে** শরীর, তাতে থাকে লুকিয়ে সাধনার তড়িৎকণা, যা পরবর্তী সাধক-সাধিকার দিকে **বিকিরিত** হয়। ঠিক যেমন **রেডিয়াম-থোরিয়াম-প্লুটোনিয়াম-ইউরেনিয়াম**—তার **রেডিও-এক্‌টিভিটি/তেজষ্ক্রিয়তা** বিকীরণ করে।

আবার এ'ও বলা যায় যে, **বিষ বা আর্সেনিক** খেলে, শরীরের কোষকলায়-**চুলে-নখে**, যেমন তা' **লুকিয়ে** থাকে, তেমনি থাকে দেহাংশেও—তপস্যার ওই **গুঢ় বিদ্যুতস্পর্শ**; যা' **বিকীরিত** হয় যুগে যুগে। ওদের ব্যবহার করা **জামা-কাপড়**, **তৈজস-পত্রেও লেগে থাকে**—এক **চিরকালীন** ধর্মের আর সাধনার **তড়িৎ চুম্বকত্ব**। উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে **তপস্যায়-সাধনায়**। শিবও তাই করেছিল, দুর্গার খণ্ড-দেহাংশ দিয়ে। নিজের প্রিয় স্ত্রীকে, সে খণ্ড-খণ্ড করতে **পারেনি বলে**—কাজটা **করিয়ে** নিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ-কে দিয়ে। কেন-না, সে'ও ছিলো—তারই মতো, **আহির (cow-keeper)** সম্প্রদায়ের!

আজও কী তোরা তোদের, ওই সব মঠে-মিশনে, **ওই সব বস্তু সংরক্ষণ** করিস না? হজরত মহম্মদের **চুল-দাঁত-নখ**, গৌতম-বুদ্ধের **শরীরের নানা অংশ**, যীশুর শরীরের নানা অংশ, **জামা-কাপড়**, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের **বিছানা-কাঁথা-বালিশ**, নিদেন পক্ষে **চিতাভস্ম**, তোরা কী রাখিসনি **সমাধি করে, বেদী করে করে—স্তূপের আকারে**? তেমনিই করেছিল **শিব** আর তার চ্যালারা, ভূত-প্রেত মার্কা সহচবেরা (**প্রমথ**)। আর তা'ইতেই গড়ে উঠেছে নানা তীর্থ—যুগে যুগে যা' সাধনায় **এগিয়ে** যাবার, **পথ দেখায় উদ্বুদ্ধ করে; সাধনার তড়িৎকণার ধাক্কা মেরে মেরে**!

সারা ভারতবর্ষে বা ভারতের বাইরে [**হিংলাজে—আফ্‌ঘানিস্তানে**], যে খণ্ড-দেহাংশ **ছড়িয়ে** দেওয়া **হয়েছিল এক সময়**; তার কয়টা টুকরো যে এখানে **পড়েনি**, সেটাই

বা বুক ঠুকে বলবে কে? আর, অবশ্যই তা' পড়েছে—সেটাই বা বলবে কে? রতনে রতন চেনে, শুয়োরে চেনে কচু! আর, শাঁপলা-শালুক চেনে গোপাল ভাঁড়। তেমনি কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়া, পণ্ডিত-মার্কা মূর্খের দল, ও-গুলো চিনতে পারবে না।

চিনতে পারবে—হাড়গোড়, মড়ার খুলি নাড়াচাড়ার কাজ-কারবার আছে যাদের, শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায় যারা ক্ষ্যাপার মতো ("ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর"..... রবি-ঠাকুর!); একমাত্র তারাই! বিজ্ঞানকে খুঁজে পায় তারাই—যারা বিজ্ঞানী! অজ্ঞানীরা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে, চায়ের দোকানে বা মাঠে; বক্তৃতা ঝাড়ে চিরটা-কাল—ফুটানীবৃদ্ধ হয়ে-হয়ে।

উত্তরের ওই আর্য্যাবর্ত্তের রাজ্যগুলোই কী স্বর্গ? বৃষ্যভূমি, উত্তর কুরুবর্ষ, সাইবেরিয়া-পামীরগষ্ঠী আর তার পেল্লায় মালভূমি তিব্বত, —স্বর্গ যার অন্য নাম। মহা-প্রস্থানের পথে যেতে-যেতে, ওই দিকটাই কেন বেছে নিয়েছিল, তোদের পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী? কেন তারা তোদের ওই সোঁদর-বনের দয়াল-পীরের ঠেঁই গেল না? তা' কী তুই জানিস? পারবি বলতে?

শুনে রাখ—হিমালয়ের ওই গৌরীপ্রান্তর-ই হলো—স্বর্গ। সেটা ওই লাসা-তিব্বতের উত্তর সীমায়, আর সাইবেরিয়া—পামীরের দক্ষিণ সীমায়। 'গৌরীপ্রান্তর' এমনি-এমনি নাম হয়নি। কুবেরের প্রমোদ-উদ্যানও ছিল ওই বিশাল মালভূমি। অন্য নাম হলো চৈত্ররথ-উদ্যান! কুবের এখানে তপস্যা করতে করতে, একদিন দেখে ফেলেছিল দুর্গাকে। ফলে হারা'তে হয়েছিল—তাকে একটা চোখ। কুবেরের নাম তাই হয়েছে, সেদিন থেকে এক-পিঙ্গল!

দুর্গার দেহকে ওখানেই খণ্ড-বিখণ্ড করে, তবেই ছড়ানো হয়েছিল সে সময়; যুগ আর কালের 'প্রথামত'। তিব্বত কথাটাকে ভাঙ্গলে পাবি—তীব্ = তিব্ (স্বর্গ) + বৎ (মতন) = **Like the heaven.** তার মধ্যে আরও সুন্দর এক জায়গা আছে, তার নাম লাহ্সা বা লাসা। যার মানে হলো—অতীব রমণীয় স্থান = স্বর্গ। আফগানিস্তান, কান্দাহার (গান্ধার), পারস্য; সবই ছিলো তখন—আর্য্যাবর্ত্ত এবং উত্তর কুরুবর্ষের অধীন।

বিদুরের বউ ছিল, পহ্লবী (ইরাণী-পার্শী) মাগী, আর ধৃতরাষ্ট্রের বউ—গান্ধারী ছিলো কাবুলী (আফঘানী) মাগী। এই পার্শী আর আফঘানীদের একটা শাখা, মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে, ছড়িয়ে দিতো নির্জন গিরি-প্রান্তরে (গৌরীপ্রান্তর) (**Tower of Silence or medows of silence**); তৎকালীন তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস-মতো! এই পহ্লবী আর কান্দাহারী (গান্ধারী) মানুষেরা, এরা ছিল অগ্নির উপাসক। সব কিছু অগ্নিতে আহুতি দিতো এরা। মৃতদেহকেও কেটে টুকরো করে আহুতি দিত। এই আর্য্যরীতি, ম্লেচ্ছ শিবের পছন্দ হয়নি। দুর্গার দেহখণ্ড, তাই সে ছড়িয়ে দিয়েছিল, গোটা আর্য্যাবর্ত্তে আর দাক্ষিণাত্যে।

আর্যরীতির বিরোধ করে, শিব হয়েছিল ম্লেচ্ছ। দলবাজীকে ঘেন্না করতো সে। সে জানতো আর্য্যদের দৌড়—মসজিদ (ইন্দ্র) পর্য্যন্ত। তার উপরে যাবার মন্ত্র তাদের জানা ছিল না। আর শিব আবিষ্কার করে ফেলেছিল, নিজের পরিচয়। সে নিজেই ব্রহ্ম, দুর্গা নিজেই ব্রহ্মাণী। ইন্দ্র তার কাছে নস্যি মাত্র। তাই সে পাত্তা দেয়নি কাউকে। শ্রীকৃষ্ণকেও পাত্তা দেয়নি।

পহ্লবী বা ইরানিয়ান নিয়ম, কান্দাহারী বা গন্ধারী নিয়ম—সে মানতে পারেনি, কেন না—ও'গুলো ছিল, আর্যরীতি ঘেঁষা। ফলতঃ "আপ্না হাথ জগন্নাথ" বুঝে নিয়ে—সে চালু করেছিল তার আপন বিদ্যা—পঞ্চ ম-কার! বড় সহজ-সুন্দর-লোভনীয় পথ, সে দেখিয়েছিল সবাইকে। সবাইকে শিবত্বে উত্তীর্ণ হবার ফর্মূলাটাই, সে বিলিয়ে দিয়েছিল অকাতরে—গোপন-গুহ্য কোন ব্যাপারই নাই। 'তন্ত্রশাস্ত্র অতি গুহ্য ব্যাপার' যদি কেউ বলে, তবে বুঝবি—সেই ব্যাটা হয় বোকা-পাঁঠা; নয়তো রাজনীতিকদের পা-চাটা কুত্তা, অথবা মন্দির গড়ে বেশ্যা পুষে মাল কামাতে চাইছে! এপথে তুই নিজেই ভগবান হবি—ভগবানকে ধরতে হবে না।"

শেষ হলো রোহিনী-মার কথকতা। এই তরুণ মুড়োয় আমার, কিছু আর ইতিহাস, ধরে রাখতে পারিনি সেদিন। কথকতা আর তার হাতে-নাতে পরীক্ষা (Practical demonstration), দু'টো হলেই ভাল হতো। মনের মধ্যে সেই লোভই ধাক্কা মারতে লাগলো বার বার। মা তাকালো আমার দিকে। পড়ে নিলো—পড়ে পাওয়া চৌদ্দো আনাটাও আমার চাই। তাই বললো—সত্যিই তো, গল্পে তো পেট আর মন ভরে না! লয়নবাবা আর চিকন-মা, এখন বিশ্রাম করছে। ওদেরকে তো এখন বিরক্ত করা যাবে না! দেখি কিছু ব্যবস্থা হয় নাকি!" মা চলে গেল বনের গভীরে একা একা—আমরা দু'জন বসে থাকলাম সেখানে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো রোহিণী-মা, হাতে তার বিরাট একটা তামার থালা। পঞ্চ ম-কারের 4 টা উপাদান আর নীল অপরাজিতা। তিনজনে মিলে গতি করা হলো সে-গুলোর। টলতে টলতে ল্যাংটা হলো রোহিণী-মা আর কাঁউরে-বাবা। তারপর নীল অপরাজিতা ফুল, দু'জনে দু'মুঠো নিয়ে উঠে গেল পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর। সেই ফুলে পূজা-প্রণাম করলো দু'জনে দু'জনকে। কাঁউরে-বাবার কোলে বসল রোহিণী-মা। নেভা দীপ জ্বলে উঠলো নিজে থেকে, মন্দির প্রকোষ্ঠের ভেতর।

কোথা থেকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো একরাশ সুগন্ধ, এতক্ষণ যা আমরা পাইনি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম তাদের দিকে, অবোধ শিশুর মতো—বিস্ফারিত চোখে। দুলছে ওরা, দমকে দমকে দমকা হাওয়া লাগা গাছের শাখার মতো। হঠাৎই দেখলাম, দু'টো কাল-কেউটের জোড়-লাগা মূর্ত্তি সেই আসনে। আর তাদের ল্যাজটা ঝুলে, নেমে এসেছে বেদীর নীচে—আমার কাছ পর্য্যন্ত!

ঠকঠক করে ভয়ে কাঁপছি তখন আমি। পালাতে পারছি না সেখান থেকে উঠে। কে যেন **চেপে বসিয়ে রেখেছে** আমাকে সেখানে। মনে হলো সাপ দু'টো বদলে গেল, **সঙ্গমরত জোড়-লাগা** শেয়ালে! ভাদ্দুরে কুত্তাদের যেমন **জোড় লাগে**—তেমনই অবস্থায় তারা তখন। সবই এক এক করে চলচ্ছবির মতো, ভেসে যাচ্ছে চোখের সামনে। তারপর এক খামচা মেঘ এসে, ঢেকে দিলো তাদের!

আস্তে আস্তে মেঘের আবরণ কেটে গেলে, দেখলাম **কাঁউরে বাবা প্রণাম করলো রোহিনী মাকে**, তার বিস্ফারিত যোনী **চাটবার পর** (Auto Semen Therapy)! রোহনী-মাও **"উত্তমবস্তু"** প্রলিপ্ত (Smeared with Semen & mense) লিঙ্গদণ্ডটাকে, মুখে পুরে চেটে-চুষে—প্রণাম করে, নেমে এলো পঞ্চমুণ্ডীর বেদী থেকে; **হতবাক আমার কাছে!** বললো, "কীরে— কেমন বুঝলি?" কী উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পারলাম না। শুধু কাঁদলাম, দু'জনের পায়ে পড়ে। **"এখনো সময় আছে, কিছু চাইলে—এখনই চেয়ে নে আমাদের কাছে। এখন আমরা কল্পতরু। একটু পরেই এই শক্তি মিলিয়ে যাবে মহাশক্তির সাথে।** তখন আমরা হয়ে যাবো, অতি অতি **সাধারণ মানুষ**। শক্তির ছিটে-ফোঁটাটুকুও আর, থাকবে না তখন আমাদের কাছে"—বলে উঠলো রোহিনী-মা!

হায় হায়! চাইতে পারলাম না, তাদের কাছে কিছুই। জলভরা চোখে শুধু তাকিয়ে রইলাম তাদের দিকে। কেউ যেন কণ্ঠ রোধ করেছে আমার। মা বললো, "একেই বলে **বিধিলিপি**, হাতের কাছে পেয়েও হারিয়ে ফেললি! ওরে, **কল্পতরু** কী—সব সময় কেউ থাকতে পারে! সাধক আর সাধিকার উপর সে শক্তি **কয়েক মিনিট মাত্র নামে**, যখন তাকে আহ্বান করা হয়। তারপর ফিরে যায়, সেটা **তার আপনবৃত্তে**। শুধু মানবীস্নেহ ছাড়া, এখন আর পাবি না কিছু তুই আমাদের কাছে। **একেই বলে নিয়তি**!"

এলো সকাল। ঘাট থেকে নেমে, স্নান করলাম কাঁদরের জলে। ওরাও স্নান করে এসে, প্রণাম করলো মন্দিরে মন্দিরে, আর অট্টহাসের **'গুপ্ত ভৈরব-ভৈরবী'** লয়নবাবা আর চিকণ-মাকে। প্রণাম করলাম তাদেরকে— আমিও। ওরা চলে যাবার উদ্যোগ করতে, ভৈরব বললো—প্রসাদ পেয়ে তবে যেও। **অন্নপূর্ণার** দরবার থেকে, অভুক্ত ফিরে যেতে নাই কাউকে।" আর আমাকে বললো, "সবে দেখা শুরু হয়েছে। আরও অনেক কিছু দেখবে, ক'টা দিন থাকলে। ক'টা দিন থেকে যাও। ওদিকটা একটু শান্ত হলে—তখন যেও। বিপদের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়াটা, কোন দিন কাম্য হতে পারে না। সময় হলে—আমিই বলে দেবো।"

ভোগের প্রসাদ পেয়ে, চলে গেল ওরা। শুধু তাকিয়ে থাকলাম ওদের দিকে। এত কথা, **এত ইতিহাস জানা ছিল না** আমার। জানি নাও আগে থেকে কিছু। ভাবতে বড় আশ্চর্য্য লাগে যে, কেমন করে অত কথা সে জানলো! ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, বেদ-বেদান্ত, বিজ্ঞান

চিকিৎসা শাস্ত্র, সবই তার জানা। তবে কী মহাশক্তির সাথে মিশে গেলে, সব জ্ঞান-ই করায়ত্ত হয়! রোহিনীমাকে মনে হলো—বিশ্বের এক চরম বিস্ময়!

চলে গেলো ওরা। জানা হলো তাদের মেজাজ আর মগজের, পরিধি আর বিস্তার; বিস্তর করে। কিন্তু এটা জানা হলো না যে—কেমন করে, কে কাকে পেলো অমন করে—সেই প্রথম ক্ষণে! সত্যিই ওরা শিব আর শিবানী—The moving Godheads. হতাশ চোখের দিকে তাকিয়ে, চিকন-মা বললো, "কী বোকা রে তুই! এত কিছু ওরা তোর দু'হাত ভরে দিতে চাইলো; কিছু চাইলি না কেন? সুযোগ তো দু'বার আসে না!"

চোখের জলকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। জোর করে চেপে রাখতে গিয়ে—আরও আলগা হয়ে যাচ্ছে, শরীরের সব গ্রন্থী। থরথর কাঁপছে শরীর। দাঁড়াতে পারলাম না আর । বসে পড়লাম উঠোনের মাটিতে। জড়ানো গলায় কোনমতে বলে উঠলাম, "মাগো, আমি জানি না যে—কী চাইবো ওদের কাছে! আমি জানি না যে, কী করবো আমি তা' দিয়ে—যা' ওরা দিতে পারতো আমাকে!"

কেন সে অট্টহাসিনি?

মহাদেবস্ততো দেবীমাহ ....
"সংহরস্ব জগৎ সর্ব্বং মা বিলম্বস্ব শোভনে।
ত্যজ সৌম্যমিদং রূপং সিতচন্দ্রাংশুনির্ম্মলম্।
রৌদ্রং রূপং সমাস্থায় সংহরস্ব চরাচরম্।
রৌদ্রৈর্ভূতগণৈর্ঘোরৈর্দেবি ত্বং পরিবারিত।
জীব-লোকমিমং **সর্ব্বং ভক্ষয়স্ব** ..... ।
ততোহহং মর্দ্দয়িষ্যামি প্লাবয়িষ্যে তথা জগৎ।
কৃত্বা চৈকার্ণবং ভূয়ঃ **সুখং স্বপ্স্যে** ত্বয়া সহ"।

শ্রীদেব্যুবাচ "নাহং দেব জগচ্চেতৎ সংহরামি মহাদ্যুতে।
অম্বা ভূত্বা বিচেষ্টং ন ভক্ষয়ামি ভৃশাতুরম্।
স্ত্রীস্বভাবেন কারুণ্যং করোতি হৃদয়ং মম।
কথং বৈ নির্দ্দহিষ্যামি জগদেতদ ...... !
তস্মাত্ত্বং স্বয়মেবেদং জগৎ সংহর শঙ্কর।"

....

ক্রুদ্ধো নির্ভৎসয়ামাস হুঙ্কারেণ মহেশ্বরীম্।
"ওঁং হুং ফট্ ত্বং" স ইত্যাহ কোপাবিষ্টৈরথেক্ষণৈঃ।

....

তৎক্ষণাচ্চা ভবদ্রৌদ্রা কালরাত্রীব .... ।
হুঙ্কুর্ব্বতী মহানাদৈর্নাদয়ন্তী দিশো দশ।
ব্যবর্দ্ধত মহারৌদ্রা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা।
বিদ্যুৎসম্পাতদুষ্পেক্ষ্যা বিদ্যুৎসঙঘাতচঞ্চলা।
বিদ্যুজ্জ্বালাকুলা রৌদ্রা বিদ্যুদগ্নিনিভেক্ষণা।
মুক্তকেশীবিশালাক্ষী কৃশগ্রীবা কৃশোদরী।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরা ব্যালযজ্ঞোপবীতিনী।
বৃশ্চিকৈরগ্নিপূঞ্জাভৈর্গোনসৈশ্চ বিভূঁষিতা।
ত্রৈলোক্যং পূরয়ামাস বিস্তারেণোচ্ছ্রয়েণ চ ।

....

সৃক্বিণী লেলিহানা চ ক্রূরফুৎকারকারিণী।
কুর্ব্যাত্তাস্যা ঘর্ঘুরারাবা জগৎসঙ্ক্ষোভকারিণী।
খেলদ্ভূতানুগা ক্রুরা নিশ্বাসোচ্ছ্বাসকারিণী।
জাতাট্টহাসা দুর্নাসা বহ্নিকুণ্ড সমেক্ষণা।
প্রোদৎকিলকিলারাবা দদাহ সকলং জগৎ ।
দহ্যমানাঃ সুরাস্তত্র পতন্তি ধরণীতলে।
পতন্তি যক্ষগন্ধর্ব্বাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ।
পতন্তি ভূতসঙঘাশ্চ হাহাহৈহৈর্বিরাবিণঃ।
বুম্বাপাতৈঃ সনির্ঘাতৈরুদিতার্ত্তস্বরৈরপি।
ব্যাপ্তমাসীত্তদা বিশ্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।

....

জাতৈশ্চটচটাশব্দৈঃ পতদ্ভির্গিরিসানুভিঃ।
তত্র রৌদ্রৎসবে জাতা রুদ্রানন্দবিবর্দ্ধিনী।
বিহিংসমানা ভূতানি চর্ব্বমাণাচরানপি।
তত্তদগন্ধমুপাদায় শিবারাববিরাবিণী।

গলচ্ছোণিতধারাভিমুখা দিগ্ধ-কলেবরা।
চণ্ডশীলাভবচ্চণ্ডী জগৎসংহারকর্ম্মণি।

....

একাপি নবধা জাতা দশধা দশধা তথা।
চতুঃষষ্টিস্বরূপা চ শতরূপাট্টহাসিনী।

....

ততস্তস্যা **ব্যবর্দ্ধন্ত** দংষ্ট্রাঃ কুন্দেন্দুসন্নিভাঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
দংষ্ট্রাবলিঃ কররুহাঃ ক্রূরাস্তীক্ষ্ণাশ্চ কর্কশাঃ।
বিয়দ্দিশো লিখন্ত্যেব সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্।
তস্যা দংষ্ট্রাভিসম্পাতৈশ্চূর্ণিতা বনপর্ব্বতাঃ।
শিলাসঞ্চয়সঞ্জাতা বিশীর্য্যন্তে সহস্রশঃ।
প্রভিন্নগোপুরদ্বারং কেশশুষ্কাস্থিসঙ্কুলম্।
প্রদগ্ধগ্রামনগরং **ভস্মপুঞ্জাভিসংবৃতম**।
চিতাধুমাকুলং সর্ব্বং ত্রৈলোকং সচরাচরম্।
হাহাকারাকুলং **সর্ব্বমহহস্বননিস্বনম্**।

.... স্কন্দ পুরাণম্

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

মহাদেব ঃ মহাকালী, সমস্ত জগৎটাকে **চিবিয়ে-চেটে** খেয়ে ফেল, দেরী কোরো না। তোমার ওই সুন্দর-স্নিগ্ধ-নির্মলরূপ গুটিয়ে নাও। তুমি ভীষণাকৃতি ডাইনি-যোগিনী ভূত-প্রেতদেরকে নিয়ে **সমস্ত জগৎটাকে চিবাও**। সমস্ত জীবলোক **গ্রাস করো**। শুরু করো **প্রলয়-তাণ্ডব**! তারপর আমি সমস্ত জগৎটাকে **মর্দ্দিত-প্লাবিত** করে, তোমাকে নিয়ে আরামসে শুয়ে থাকবো।

মহাকালী ঃ আমি এই জগতের মা, সকলে আমার সন্তান। আর আমাকে কিনা তুমি বলছো ধ্বংস করতে খেয়ে ফেলতে? **নৃশংস পুরুষ,** তুমি তা' করতে পারো। আমি নারী—**মহাপ্রকৃতি**! আমি তা' কখনও করতে পারি না—ও'টা আমার কম্ম নয়! নিজের সন্তানদেরকে আমি, **চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারবো না—মা হয়ে**! এতই যদি প্রলয়ের শখ, তবে তুমিই বা **নিজে তা' করছো না কেন!**

রুষ্ট হলো **মহাকালীর** উপর **মহাকাল**। চোখ লাল করে—দাঁত কড়মড় করতে করতে বললো ঃ—

"ওঁ হুং ফট্ ত্বং,
ওঁ হুং ফট্ ত্বং,
ওঁ হুং ফট্ ত্বং!"

[দূর হও আমার সামনে থেকে, চুলোয় যাও তুমি, উচ্ছন্নে যাও তবে!]

নিমেষেই মহাকালী বদলে গেল, **কালরাত্রিরূপা রুদ্রবদনা নারীতে**— রাক্ষসীতে! তার সেই বিকট হুংকারের বিদ্যুৎশিখা, ঢেকে ফেললো **সমস্ত** জগৎ। গোটা পিঠ-পাছা জুড়ে ছড়িয়ে-এলিয়ে পড়েছে চুল। লম্বা সরু গলা, পেটটা তার সরু, বাঘের ছাল তার কোমর জুড়ে; সমস্ত শরীরে কিলকিল করে বিষাক্ত হেঁটে বেড়াচ্ছে **বিছে আর অজগরেরা**। শরীরটা বাড়তে বাড়তে আড়ে-লম্বায়, **ঢেকে ফেললো স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল**!

রুদ্রবদনা মহাকালী এবার রোষভরে চাটতে লাগলো, নিজের ঠোঁট দু'টো রক্তলোলুপা হয়ে; **খল্‌খল্** (অট্ট + অট্টহাসি = অট্টাট্টহাসি) **করে হাসতে হাসতে**। ভূতপ্রেত, ডাইনি-যোগীনীরাও হাসতে লাগলো নাচতে লাগলো তার সাথে। শুরু হলো **"ঘুর্ঘুরা-রব**—Cosmic Vibration—নড়তে লাগলো সমস্ত জগৎ—কড়কড় মড়মড় করে ভেঙ্গে, টুকরো টুকরো হয়ে শূন্যে ভাসতে লাগলো সব। **আগুনের ভাঁটার মতো**, জ্বলতে লাগলো তার চোখগুলো, ফোঁস ফোঁস করে পড়ছে তার ক্রুর নিঃশ্বাস! মাঝে মাঝে **খলখল** (অট্ট + অট্টহাসি = অট্টাট্টহাসি) **হাসির ঢেউ উঠছে**, আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

জ্বলছে আগুনের প্রলয়ংকরী শিখা। পালাচ্ছে দেবতারা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নরেরা হাহাকার করতে করতে, সারা গায়ে আগুন মেখে। শুরু হয়েছে **উল্কাপাত**। কাতর রবে ভরে গেছে সমস্ত জগৎ। মহাহিংসাময়ী **রুদ্রাণী কালী** তখন, সমস্ত প্রাণীকুলকে চিবোতে লাগলো। রক্তের আর মাংসের গন্ধ পেয়ে, **শেয়াল হয়ে (সিবা হয়ে)** উন্মত্ত ডাকে, সে ভরিয়ে দিল সমস্ত জগৎ। **সারা শরীরে ঝরে পড়তে লাগলো সমস্ত রক্তধারা, প্রচণ্ড-চণ্ডা মূর্ত্তিতে শ্মশানভূমি দাপিয়ে বেড়ানো সে মেয়ে রূপ নিলো চণ্ডীর। [চণ্ডী বা দুর্গার গায়ের রং তাই রক্তাক্ত—লাল। শ্রীশ্রীচণ্ডী দেখুন ঃ- "বন্দুককুসুমাভাসাং" = বন্দুকফুলের মত টুকটুকে লাল।]**

সেই প্রচণ্ডা-চণ্ডী আবার ভাগ হয়ে গেলো **ন'টা রূপে (নব-দুর্গা)**। প্রতিটি রূপ আবার ভেঙ্গে ভাগ হয়ে গেলো **দশ-দশটায় (দশ মহাবিদ্যা)**। সেগুলো আরও ভাগ হয়ে

গেলো চৌষট্টি ভাগে (**চৌষট্টি যোগিণীরা**)। তাদের দাঁত আর নখগুলো **ক্রুর-তীক্ষ্ণ** আর **কর্কশ**। সেগুলো দিয়ে সে **ফুঁড়ে-খুঁড়ে ফেললো সমস্ত জগৎ**। আর যোজন পরিমান নখ দিয়ে, আঁচড়াতে লাগলো সমস্ত পৃথিবী আর পর্বৎ। **চুল-হাড়-মাস-কংকাল**, আর রাশি রাশি ধোঁয়া আর ছাইতে ভরে গেল সব। ঘূর্ণিবায়ুর মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো— **হাহাকার = অট্টাট্টহাসি!**



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



বহুলা : 38 বছর আগে

বিদায়ের বিষাদলগ্নে, বড় অসহায় বোধ করলাম নিজেকে। পঞ্চমুণ্ডী আসনের সামনে দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে কাঁদলাম, পায়ে ধরে লয়ন-বাবা আর চিকন-মার। বললাম, " আমাকে তোমরা এমন বর দাও যে, জীবনে যেন অনেক বড় হই, অনেক টাকা পাই, বিরাট অট্টালিকা যেন হয় আমার; বাঘে-গরুকে একঘাটে জল খাওয়াতে পারি— সেই ক্ষমতা দাও আমায়! আমি জন্ম থেকে বড় অসহায়—নিরন্ন অনিকেত, আর ভীরু! তুলে দাও এক মহাস্ত্র আমার হাতে, যা' দিয়ে আমি গড়ে নেবো আমার জীবন! কে কোথায় রাতের বেলায় আমাকে কী বলে গেল—আমি তা' বিশ্বাস করি না, আর মন থেকে মানি না-ও!"

দড়াম করে মুখে-বুকে পড়লো জোড়া লাথি—দু'টোই কিন্তু ডান-পায়ের ঝাড়— অট্টহাসের ভৈরব আর ভৈরবীর! মহাকালীর সামনে দাঁড়িয়ে, তাকে অস্বীকার করার অমনই পুরস্কার পেলাম এমনি করে—অট্টহাসিনীর পঞ্চমুণ্ডী তলায়: সামনের অমাবস্যার ঘোর যখন, বড় গভীর করে ঘনিয়ে আসছে; বড় ঘন কালো কালো—আঁধারের, মোটা-মোটা আঁধারের চাদর মেলে দিয়ে!

এই ঘোর যে, কেমন ঘোর বা ঘোরালো; যে না চেখেছে-বুঝেছে তার নিখাদ-

স্বাদ; সে বুঝবে কেমন করে? হায়রে বড় **ভয়ের তা'**, বড় **বিস্ময়ের** তা', বড় **অভয়ের তা'**—যখন ভীতিবিহ্বল হয়ে, আঁকড়ে ধরি তার আঁচল—মা, মাগো ..... বলে! আর—তাই তো তার সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলতে হয়—(ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে, শ্মশানবাসিন্যৈ চ ধীমহি, **তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ**। (এই শালী কালী, তোকে জানতে চাই, শ্মশানে ঘুরে বেড়ানো-পার্টি-মাগী, তোর ধ্যান্ করবো, তোর ওই ঘোর-ঘূর্ণিপাক খোল্ শালী!) **[এ সম্ভাষণ শুধু সাধুদের জন্য, সাধারণের জন্য নয়। কেউ আছে নাকি—কালীকে, শালী বলবে?]**

ওরা বললো, "নির্দোষ বালখিল্যতাকে ক্ষমা করা যায়। যায় না শুধু ইচ্ছাকৃত বাঁদরামোর বালখিল্যতাকে। বিশাল-বিপুল ধরিত্রীর **জন্মদাত্রীকে**, এভাবে আপমান করা যায় না। গুরু পরম্পরায় আমরা, **বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, অপমান করতে শিখিনি**। আজ তুই যা করলি, তা' হলো—যে পাতে খাস, সেই পাতে থুতু ফেলার মতো। চাইতে যদি 'কিছু' হয়—তবে, যে মালিক, তাকেই চাইতে হয়—**তার আর্দ্দালীকে** নয়! সে কী দেবে আর কতটা দেবে—সবটাই তার **ইচ্ছার উপর নির্ভর** করে! আমরা ত্যাগ করতে শিখেছি—ভোগ করতে **শিখিনি**।

আজ যা চাইলি আমাদের কাছে, সেটা হলো **কালকূট বিষ**। আর সেই **বিষের** জ্বালার জ্বলুনি—তোকে পোহাতে হোক, আমরা তা' চাই না কোনদিন। সম্ভবতঃ মাও তা চান্ না! এখনো তোর ঘুম ভাঙ্গলো না কেন? মৃত্যুর মুখ থেকে তোকে **বাঁচিয়ে** আনলো যে, তার প্রতি তোর এই **অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধা**, বড়ই অপমান করলো আমাদের—তাকেও!

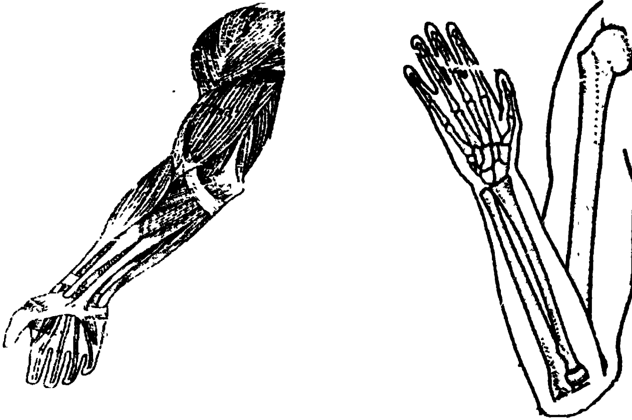
বেরিয়ে যা' এখুনি এই মন্দির থেকে। দেখতে চাই না তোর মুখ। যে তোকে এনেছে এখানে, সে তোকে **কোথায় নিয়ে যাবে আবার**, একমাত্র সেইই তা' জানে। তবে, তোর যে এখানে থাকবার তিলার্দ্ধও সময় নাই, সে কথাই বলে দিলাম। বেইমানের স্থান নয় এটা—এই **অট্টহাসপীঠ**।"

সেই গভীর অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম **আবার**, জমির আল-পথ ধরে। কোন দিকে যে যাচ্ছি, কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু কয়টা শেয়াল **ডেকে উঠলো দূরে দূরে**। **প্রত্যুত্তরে** দূর গাঁয়ের কুকুরগুলোও হেঁকে উঠলো, গ্রামের রাতের **চৌকীদার প্রহরীদের মতো**। কখনো কোন দীঘির পাশ দিয়ে, কখনো আখ-ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি—**একেবারেই একা একা**! হঠাৎ মনে হলো—কেউ যেন **সামনে হাঁটছে, বেশ কিছুটা তফাতে**। বুকে সাহস এলো এই ভেবে যে—অন্ততঃ একজনকে তো **পাওয়া গেল—দু-চারটা কথা বলার!**

যতই এগোই, সে এগিয়ে চলে—**তারও থেকে বেশী**। দূরত্ব যেন একটু একটু করে, **বেড়েই চললো**। দৌড় লাগালাম, তাকে ধরে ফেলতে! দৌড়ে কাছে যেতেই, সে যেই

মুখ ঘুরিয়ে ফিরে তাকালো—দেখলাম, **সেটা একটা শেয়াল**—মুখ থেকে তার লালা ঝরছে, আর ঝিরঝিরে বাতাস লেগে **জ্বলে জ্বলে উঠছে তা'** ছোট-ছোট **আলোর-বিন্দুর মতো**—কিম্বা জোনাকীর মতো। অজানা ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলাম কী জানি, হয়তো ওরা **কামড়ে দিতে পারে**! সেই মূর্ত্তি এগিয়ে চললো, সটান সামনে। তার সাথে **দূরত্ব বজায় রেখে**, আমিও চললাম তার পেছনে পেছনে। অন্ধকারটা ততক্ষণে **'চোখ-সহা'** হয়ে গেছে।

দেখলাম, কোথায় সেই শেয়াল! ও'তো একটা **জলজ্যান্ত মেয়ে**! হ্যাঁ ..... হ্যাঁ .... মেয়ে তো বটে! আজ ওকে আমি **ধরবোই**। লাগালাম পেল্লায় দৌড়। সেও তেমনি লাগালো **ম্যারাথন দৌড়**! হুড়মুড়িয়ে পড়লাম, একেবারে তার **গায়ের উপর**। চুলের গোছা **শক্ত করে ধরে**, পটাপট লাগালাম **কয়টা চড় তাকে, গালে-গালে করে**। কোঁচড় থেকে লতাস্ করে পড়লো তার, **মরা-মানুষের একটা হাত—রক্ত মাখা**। তবে কী সে **পাগলী**? কিছু না খেতে পেয়ে—**কবর খুঁড়ে**, কী শ্মশান থেকে সে **আধ-পোড়া হাত কুড়িয়ে কোঁচড়ে ভরেছে—খাবে বলে**? ওই দিকে কী ওর বাড়ী? নাকি পাগলের খেয়ালে চলেছে, যে দিকে ওর খুশী!



শোঁক্-শোঁক করে **কাঁদতে কাঁদতে**, খিলখিল করে হেসে উঠলো সে মেয়ে হঠাৎই। জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, সেই **মড়ার হাতটা কুড়িয়ে** সে ছুটলো মাঠ-ভেঙ্গে। আমিও দৌড়ালাম তার পিছু পিছু। পেরুলাম একটা খাল ঝাঁপ দিয়ে, সাঁতার কেটে! সেও সাঁতরে ওপারে আগেই উঠেছে। হারিয়ে ফেলেছে তার পরনের সেই শাড়ীটা, যেটার কোঁচড়ে ছিল, একটা **মরা-মানুষের হাত**। উলঙ্গ ভরভরন্ত তার **যুবতী-শরীর**। ভোরের আলোয় সমস্ত শরীরী-রেখা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। তাকাতে পারছি না তার দিকে। কিন্তু বেহায়ার মতো সে হাসছে খল্ খল্ করে, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে। ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে, **মাথায়-বাঁধা** আমার ছোট্ট **ভেজা-গেরুয়াটা**। খানিকটা অন্ততঃ লজ্জা তার **ঢাকা হোক**—এই ছিল আমার নির্ভেজাল-পরিশুদ্ধ চিন্তা।

গেরুয়াটা তো সে নিলই না, সেটাই লুফে নিয়ে আবার, **ছুঁড়ে মারলো** সটান আমার মুখে। মাটিতে পড়ে যাওয়া সেই কাপড়, মুখ নীচু করে কুড়াতে গিয়ে—দেখলাম, সে দৌড়াচ্ছে এক **ঝোপের দিকে**। আবার দৌড়ালাম তার পেছনে। বলছে সে, **"পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে এসে, আবার ঢুকে পড়েছিস কেতুগ্রাম থানার পুলিশের গুহায়! পালা এখান থেকে!"**

কেউ কোথাও নাই। কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে পারলাম না যে—এই মন্দিরের নাম কী, কেইবা পূজা পায় এখানে নিত্যদিন! মন্দিরের দুর্দশাই বা কেন এমন? বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। যুতসই করে একটা বিড়িও যে খাবো, সেটা আর হয়ে উঠলো না। কোথায় হারিয়ে গেছে বিড়ি আর দিয়াশলাই! ডিঙি-নৌকো পেরিয়ে উদয় হলো এক ব্রাহ্মণের। বৃদ্ধ মানুষ, কানে তার পৈতে জড়ানো। সম্ভবতঃ সকালে তার, পেচ্ছাব-পায়খানা করা আর পায়চারী করার দরকার হয়েছিলো। এখন সে ফিরছে ওই পড়ো-মন্দিরের পাশ দিয়ে।

——— আপনি কে বাবা? নুতন এসেছেন বুঝি?

——— এই মন্দিরের নাম কী? কে পূজা পায় এখানে? পূজারী নাই?

——— এটা **বহুলা-মন্দির**। **মা-দুর্গাই পূজা** পায় এখানে। পূজারী এবার আসবে। সবে **তো** সকাল হোল!

——— এই জায়গার নাম কী? কোন জেলা এটা?

——— এটা বর্ধমান জেলা। **কেতুগ্রাম** এই গাঁয়ের নাম। বাবার কী **ধূমপান** চলে? পেটটা বড় কষ্ট দেয় বাবা, মাঝে মাঝে **আমবাতের চুলকানি** বড় অসহ্য হয়ে ওঠে। সারাটা দিন চুলকে মরি। আর **হাগা-পায়খানা** ভাল মতো হয় না, পেচ্ছাবও **কম-কম** হয়। রাতে খালি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে হয়। তন্দ্রা মতো এসে আবার চলে যায়, ঘুম আর হয় না। খুকখুকে কাশিটাও বড় জ্বালাচ্ছে আজকাল। কফ আর উঠে না! একটু যদিও বা উঠে , বড় চটচটে, রবারের মত টানলে বাড়ে।। যদি কোন **টোট্‌কা-মুষ্টিযোগ** জানা থাকে আপনার, তবে আমার বড় উপকার হয়!

——— **সব পান-ই আমার চলে**। দেখি, আপনার জন্য কিছু করতে পারি কিনা! তবে—যা বলবো, অক্ষরে অক্ষরে তা **মানবেন নিশ্চয়**?

——— হ্যাঁ-হ্যাঁ, অক্ষরে-অক্ষরেই তা' মানবো। রোগ বড় বালাই, বুঝলেন মহারাজ! না মেনে উপায় কী? মরার আগে ও'টুকু করে দেখবোই।

বিড়ি ধরিয়ে, দিয়াশলাইটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "একটু বসুন মন্দিরে। দেখি গাছ-গাছড়া কিছু মেলে কিনা।" বসে রইলো বৃদ্ধ। আমি ঢুকে গেলাম সেই জঙ্গলের মধ্যে! মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন **ডাক্তারী-বিদ্যা আর দশ মহাবিদ্যা**। বুড়োকে ঠিক করতে গেলে, খুঁজতে হবে **ঔষধি-লতা**; আর নিজেকে ঠিক করতে গেলে, পেতে হবে **কালীমাতা (বোতল) আর গাঁজার পাতা**। বড় আনমনে চলছিলাম—নানা কথা ভাবতে ভাবতে!

হঠাৎ পায়ে জড়িয়ে গেল, শুয়ে পড়া একটা লতার ডাল। **মানকচুর পাতায় করে, কেউ যেন রেখে গিয়েছে সেটা বড় যত্ন করে**। দেখলাম সেটা **যমানী গাছ** বা যোয়ান গাছের লতা, (Hyoscyamus Niger) বড় **দুষ্প্রাপ্য পারস্যিয় লতা**, বড় অযত্নে বেড়ে উঠেছে, বাংলার বনে-বাদাড়ে **ঔষধি-লতা** হয়ে। হঠাৎ হঠাৎই অমন করে, অক্লেশে পেয়ে যাবো এই বস্তু, বিশ্বাস করতে এতটুকুও চায় না মন। সেই **পাগলী বেটীর খেলা** ছাড়া, অন্য কিছু মেনে নিতেও চাইলো না এই মনটা। ঝরঝর করে চোখ থেকে, অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো নীরবে।

পরম শ্রদ্ধায় প্রণাম করে, সেই ঔষধি তুলে দিলাম বৃদ্ধের হাতে। বললাম, "বাজার থেকে বিল্-যোয়ান (Seseli Indicum) 250 গ্রাম কিনে, প্রতিদিন শিলে পিষে চামচ-খানিক, এই পাতা আর ফুলের সাথে; তারপর একটু নুন মিশিয়ে গরম করে খাবেন—দিনে ২ বার; মাস-খানিক। রোগটা অবশ্যই সেরে যাবে—মা-দুর্গার নামে **শপথ করে বলছি**, এ' ঔষধ **তারই দেওয়া**—আমি দিইনি। যতদিন বেঁচে থাকবেন, বার্দ্ধক্যের এই যন্ত্রণা পোহাতে হবে না আর! শুধু অনুরোধ, একমাস প্রতিদিন দু'বেলা কষ্ট করে খান।"

রোগমুক্তির **ভাবী-প্রত্যাশায়**, আর আমার অমন করে **আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলা** কথায়; বৃদ্ধ বুকে জড়িয়ে ধরলো আমাকে, কাঁদতে কাঁদতে আনন্দে! তরুণ আর প্রবীণের এই **অশ্রু বিনিময়**, এই আনন্দাকুল **লগ্ন-স্পর্শসুখ**; নিভৃতে বসে সে বেটী, **উপভোগ** করেছিল কিনা জানি না। রোমাঞ্চের অন্য স্বাদ যদি হয়, সেই রমণীর **কৃপাকটাক্ষ**, তবে বলি— সেই কৃপা নেমে এসেছিল **অসীম রোমাঞ্চ হয়ে**—সেদিন বড় অকৃপণভাবে। **তা'কে আর খুঁজে পাইনি সেদিন পাগলীর বেশে, বহু খুজাঁখুঁজি করেও!**



লোককথায় এই কুণ্ড থেকে দেবী বহুলার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল।

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



স্বামী ওঁকারানন্দের

প্রত্যক্ষ দেখায় আর পরম অনুভবে

স্থান ঃ সতীপীঠ বহুলা (মড়া-ঘাট) ★★

প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্র বলে, **বহুলা** একটা পবিত্রতম **সতীপীঠ**। এখানে নাকি মা দুর্গার **বাম-বাহু** পড়েছিল। ভৈরবীরূপে, তাই তার নাম—**বাহুলী**। আর তার ভৈরবের (Gate-Man) নাম **ভীরুক**। **মানবীরূপে যখন** সে নেমে আসে মানুষের মাঝে, তখন তাকে **ভৈরবী** বলি আমরা। কোন সিদ্ধ ভৈরব তখন হয় তার সাধনসঙ্গী।

শিবত্বে উত্তীর্ণ সাধকই, ভৈরব পদবাচ্য হয়। তেমনি এক ভৈরবের দেখা পেয়েছিলাম আমি, **নাম তার সনৎ বাবা। মানবীরূপিনী** তাঁর ভৈরবী, সাধনার সময়টুকু ছাড়া, বাকী সময়টা কাটাতেন **ঈশান নদীর** ওপারের গীতাভবনে। শুনেছি সর্পাঘাতে ইহ জগৎ থেকে, ছুটি হয়ে গেছে তাঁর, বহু বছর আগে। আর সনৎ মহারাজও, চলে গেছেন বাহুলী মন্দির থেকে, তাঁর মৃত্যুর পরে পরেই; সে প্রায় ১৯৭৫-৭৬ সালে। অসমর্থিত সংবাদ এই যে—তিনি এখন আছেন, উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে, সাধনায় মগ্ন কোন এক দেবীমন্দিরে।

এই বাহুলা মন্দিরে, একের পর এক বদল হয়েছে স্থায়ী পূজারীর। 'চাল-কলার ভিখারী' সাধারণ পূজারী এঁরা নন—এরা সাধকও বটেন। আজ দুটো দিন যাঁর সাথে কাটিয়ে গেলাম, হোমে-যজ্ঞে-অর্চনায়-পূজায়; তার নাম—স্বামী ওঁকারানন্দ। মড়াঘাটের আদি বাহুলা মন্দিরের এই সাধক, এসেছেন এখানে প্রায় গত ১০ বছর—সেই ১৯৯৭ সালে। তাঁর দেখার আর অনুভবের ঝাঁপি—যেমন করে তিনি অকপটে, মেলে ধরে ছিলেন আমার কাছে; তার নিটোল চিত্রলেখায় যে—শেষ তুলির টান আমাকেই টানতে হয়! আসুন, কান পাতি তাঁর মধুগন্ধী বিনম্র কথকতায় ঃ—

"সবে সেদিন **প্রথম এসেছি**, এখানে বানপ্রস্থের দিনগুলো কাটাবো বলে। চারিদিকে নির্জ্জন নিরিবিলি জঙ্গল। ভূতের আর সাপের ভয়তো আছেই। পোড়ো-মন্দির, আর তার

স্যাঁতস্যাঁতে সব ঘরগুলো। দেড়-দুই কিলো মিটারের মধ্যে, নাই কোন মানুষ-জনের বাস। সাথী বলতে কয়টা শেয়াল আর বুনো পাখ-পাখালীর দল! এই বিজন শ্মশান প্রান্তরে, **ঈশানী-নদীঘেরা** এই দ্বীপে—**বড় অসহায় লাগতো, মাঝে মাঝে নিজেকে।**

হঠাৎ এই দিনই সান্ধ্যপূজার পর—রাত প্রায় ১০ টার সময়, শুনতে পেলাম এক **অতি কোমল নারীকণ্ঠ**—টেনে টেনে সুর করে ডাকছে, **"সাধুবাবা-আ-আ, সাধুবাবা-আ-আ!"** ভাবলাম, একা আছি বলে—কেউ হয়তো **সঙ্গ দিতে** এসেছে। মনে একটু সাহস পেলাম। ভালও লাগলো এই ভেবে যে—অন্ততঃ কিছুক্ষণ গল্প তো করা যাবে! আবার এ'ও ভাবলাম—এই দূর প্রান্তরে, এত রাতে নদী পেরিয়ে কেই বা আসবে? এ' **আমার ভ্রম নিশ্চয়!** ভয়ও পেয়ে গেলাম খানিকটা! **নিশি-ডাকের মত, প্রাণঘাতী ডাক হতেও পারে!** দু' কান খাড়া করে রইলাম—যদি **আবার সেই রকম** ডাক আসে!

আবারও শুরু হলো সেই রকম, কোমল সুরে বার বার ডাক। বন্ধ-ঘরে আর থাকতে পারলাম না। **সাহসে ভর করে,** নড়বড়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম, হাতে নিয়ে টিমটিম করে জ্বলা, একটা কেরোসিন লণ্ঠন।

দেখলাম, মন্দিরের বারান্দায়, আশে পাশে কেউ কোথাও নাই। সাহস করে সারাটা জঙ্গল খুঁজে, দেখতে পেলাম না কাউকে। মন্দিরের ভেতরে ঢুকেও দেখলাম—কেউ নাই কোথাও! কেউ যদি কোথাও নাই, তবে ডাকলো কে আমাকে—এই বিজন শ্মশানে, ঈশানী নদী ঘেরা এই ঘোর জঙ্গলে? সেই ডাকের চুম্বকত্ব (Magnetism) জারিয়ে ফেলেছে পুরোপুরী তখন আমাকে। যার আশ্রয়ে আছি, সে ডাকেনি তো! মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ঘোরের সঞ্চার হলো। থেকেই গেলাম এখানে সেদিন থেকে। পদে পদে অনুভূত হতে থাকলো, তার প্রতিক্ষণের শরীরী-উপস্থিতি। দিন গড়িয়ে যেতে লাগলো এক এক করে। কেটে গেল মাস-বছর এই বেটীর মন্দিরে। বুঝতে পারিনি যে—সে বেটী সত্যিই আমার পূজা চায়!

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

১৯৯৮ সাল। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর, দেখলাম **শম্ভুনাথ দাশ** নামে, এক ভক্ত এসেছে মন্দিরে, **ঈশানী নদী** পেরিয়ে—খোঁজ খবর নিতে। এ-গল্পে সে-গল্পে, সময় কাটতে লাগলো আমাদের। হঠাৎই ভুর ভুর করে ভেসে এলো, এক সুন্দর-কড়া-গন্ধ। বেশ কিছুক্ষণ সেই গন্ধ যেন, তালগোল পাকাতে লাগলো আমাদের চারপাশে। উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো, তার পরিমাণ আর বাহুল্য। সেই দুপুরে শম্ভুবাবুকে সাথে নিয়ে, প্রতিটি গাছে—ঝোপে-জঙ্গলে খুঁজলাম পাঁতি পাঁতি করে; কোন ফুল তার সুগন্ধ ছড়াচ্ছে কিনা! না **পেলাম না** কোন ফুল, পেলাম না সেই সুন্দর গন্ধের **কোন উৎসভূমি**; যেখান থেকে অকৃপণভাবে ছড়িয়ে পড়ছে—**সারা বাহুলা মায়ের তপোভূমিতে।**

আবার একদিন, বেশ কয়েক মাস পরে, সন্ধ্যার **গোধূলিলগ্নে** ভেসে আসতে লাগলো, **পবিত্র হোমের গন্ধ**। যেন বেল-দেবদারু-চন্দন-শালকাঠ পোড়ানো হচ্ছে, পোড়ানো হচ্ছে—ঘি-বেলপাতা-ধুনো-অগুরু-গুগ্গুল্-কেশর। নির্জন এই বহুলার তপোভূমির আশে পাশে, নাই কোন মানুষের বাস, নাই কোন মন্দির-মসজিদ; কে তবে পোড়ায় ওই সব বস্তু **হোমের আহুতির মত**? লোকালয় তো দেড়-দুই কিমি দূরে? অবাক যেমন হয়েছি দিনের পর দিন, বিশ্বাস তত দৃঢ় হতে আরম্ভ করেছে; বহুলা মায়ের উপর। এ' ভাবেই সে **জানান দেয়—সে আছে!**

বার বার করে সে **বুঝিয়ে চলেছে**—সে এখানে আছে সব সময়। আর আমি আছি, তার **পরম আশ্রয়ে**। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে, তাই মগ্ন হয়েছি তার চরনারবিন্দে। মাঝে মাঝে কে যে তার হোমযজ্ঞ করে, কে যে তাকে সবার **চোখের অন্তরালে** অর্চনা করে; ভাবতে ভাবতে সে সব কথা—বড় রোমাঞ্চে ভরে উঠে, এই বৃদ্ধ-বর্ষীয়ান-দেহ-মন! আপনা থেকেই **মাথা নুয়ে আসে** তার রাতুল-চরণে।

মনে আর দ্বিধা-দন্দ্ব নাই কোন আমার। আমি জানি—আমি আছি **তার কোলে**; তার অমর আশীর্বাদপুতঃ এই তপোবনে—**মড়াঘাট শ্মশানের বহুলা মন্দিরে!** যেখানে নীরবে উচ্চারিত হয় তার বরাভয় মন্ত্র, ফুলের **সুবাসে**, পাখীর **কলকাকলীতে**, হোমের **আহুতির গন্ধে গন্ধে**; ঈশানী নদীর **কলতানে**!

একা বৃদ্ধ মানুষ আমি—পরিষ্কার রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করি এই মন্দির, নাটমন্দির, পঞ্চমুণ্ডীর আসন, ভোগ-রন্ধনশালার আশপাশ; আর আমার থাকবার জায়গাটুকু। কাজের মেয়েটাও হাত লাগায়, আমার সাথে কোন কোন দিন—পরিষ্কার করতে। তবুও সে বেটীর বুঝি **মন ভরে না**। তাই তুলে নেয় সে নিজের হাতে, তার **সম্মার্জনী (ঝাঁটা)**—ভাল করে নিকেশ করতে তার **উঠোন-ঘর-দুয়ার**! আর মাঝে মাঝে **রাতের গভীরে** তাই শুনি—ঘন্টার পর ঘন্টা কেউ যেন **ঝাঁটিয়ে চলেছে**, আপনমনে পুরো এই তপবনটাকে।

দশ মহাবিদ্যার (১. কালী, ২. তারা, ৩. ষোড়শী, ৪. ভুবনেশ্বরী, ৫. ভৈরবী, ৬. ছিন্নমস্তা, ৭. ধূমাবতী, ৮. বগলা, ৯. মাতঙ্গী, ১০. কমলা) **সপ্তম** রূপই (7th dimension) হলো— **ধূমাবতী**। হাতে তার থাকে মা শীতলার মত **ঝাঁটা**। সাথী তার কাক-শকুন। জীবনের যত নোংরা আছে; সে সব ঝেঁটিয়ে দিতে সে অবশ্যই নামে; **ধূমাবতীর রূপ নিয়ে** রাতের আঁধারে, তারই এই সুন্দর নির্জন—ঈশানীর জলবিধৌত তপোভূমে; না হলে প্রায় প্রতি রাতে মাঝে মাঝে, কেন পাই সেই **ঝাঁটানোর শব্দ**; ঘন্টার পর ঘন্টা! কেন তবে রাতের আঁধারে, **কাকেরা ডানা মেলে উড়াউড়ি করে**?

বুঝলে বাবা **সোমানন্দ অবধূত**, আমি দেখেছি তাকে— তার **নবম মূর্ত্তিতে** (9th

dimension)—**মাতঙ্গীরূপে**। সেটা ছিল ২০০৩ কী ২০০৪ সাল—ঠিক **পরিষ্কার** করে মনে করতে পারছি না; আজ সেই সালটা। রাত তখন প্রায় দশটা হবে। ফাল্গুন মাস, **জ্যোৎস্নায় ধূয়ে গিয়েছে** সারা তপোবন! কে যেন হেঁটে বেড়ায় আমার **রোয়াকে** চুপি চুপি! বড় মাতাল মাতাল তার **চলার ছন্দ**। কালো পুরুষ্টু তার পায়ের গোছ—**কোন এক অতি যৌবনা নারীর**! হাঁটুর উপর থেকে, সারাটা দেহ তার **কেন যে উধাও**, আজও বুঝতে পারিনি। শুধু সেই **পা-গুলো** হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে—**বড় চুপি চুপি**—বড় মাতাল বে-সামাল পায়ে! ছড়িয়ে চলেছে সে **মাতাল করা ফুলের ঘ্রাণ**।

হাঁটুর উপর থেকে মাথা পর্য্যন্ত, সেই দয়াময়ী তার **নগ্নরূপা মদালসা মূর্ত্তি**, সরিয়ে রেখেছিল বোধ হয় এই কারণে যে—আমি হয়তো তা' **সহ্য করতে পারতাম না**। ভয়ে হয়তো প্রাণ **ওষ্ঠাগত হয়ে**—হার্টফেল হয়ে **মারা যেতাম**—এই বৃদ্ধ বয়সে! হয়তো দয়াময়ী মা, আমার শরীরের মনের **কমজোরী ভাবটা বুঝে**, পরিপূর্ণ তার রূপ দেখায়নি! যে চরণের **আকাঙ্খী আমরা**, যে চরণে গুচ্ছ গুচ্ছ **রাঙা জবা দিই প্রতিদিন**, যে চরণে ঠাঁই হবে—এখান থেকে **চির ছুটির পর**; সেই সুন্দর পা দু'খানা তাই বোধ হয়—দেখালো আমাকে **পরম মমতায়**! জানিয়ে দিল আমাকে আমার **শেষ ঠিকানা**!

তার হাঁটু থেকে উর্দ্ধে অধিকার—পরম পিতা শিবসুন্দরের। আর আমাদের মতো সন্তানের **অধিকার আর আলয়** যে— ওই **অলক্ত রঞ্জিত পায়ে**! চিরকালের সেই ঠিকানাই, তাই হয়তো দেখিয়ে দিলো মা। আর তারপর ধীরে ধীরে আমার এই **রোয়াক থেকে নেমে**, মিলিয়ে গেল অন্ধকারের **জোছনা-মাখা উঠোনে**; ওই পথে—যে পথ দিয়ে প্রতিদিন যাই **মন্দিরে**; ফিরি মন্দির হতে নৈবেদ্য হাতে! **বড় লুকোচুরি খেলে সে নিয়ত**।

গত বছর ২০০৬ সালে, **ধ্যানে বসে আছি**। রাত তখন হবে ৯-টা কী ১০টা। দরজাটা খোলাই ছিল। আজ এত বছরেও আমি দেখিনি, কোন **বেড়াল এ' তল্লাটে**। সেদিন দেখলাম ৪/৫ টা বেড়ালের সমান বড়; **একটা সাদা-বেড়াল** বার বার করে, আমার ঘরের দরজায় আসছে আর চলে যাচ্ছে। তপোবনের এই দ্বীপভূমি, ঘেরা থাকে সারাটা বছর **ঈশানী নদীর জলে**। এপারে পেরোবার কোন রাস্তাই নাই। মানুষ পার হয় **ডিঙ্গীতে করে।** হঠাৎ বেড়ালটাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলাম। বার বার করে সে যেন ঢুকতে চাইছে আমার ঘরে! **অত বড় বিড়াল আমি জীবনেও দেখিনি**। রাজার মত চেহারা তার, রাজকীয় হাঁটাচলা তার; আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। **অস্বীকারও** করতে পারছি না, তার **নীরব-সচল উপস্থিতিকে।**

বার বার করে মনে ভেসে উঠছে, মহামায়া দুর্গার বাহন সেই **সিংহের কথা**। হয়তো তার পরিপূর্ণরূপ দেখে, আমি মূর্চ্ছা যেতে পারতাম, বা মারাও যেতে পারতাম। তাই **চণ্ডীর সিংহবন্দনার** মতো, মনে মনে তার **ধ্যান-বন্দনা** করতে লাগলাম ঃ—

"গ্রীবায়াং মধুসূদনোহস্য শিরসি শ্রীনীলকণ্ঠ স্থিতঃ,
শ্রীদেবী গিরিজা ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে শারদা।
ষড়্বক্ত্রে মণিবন্ধসন্ধিষু তথা নাগাস্তু পার্শ্বস্থিতাঃ,
কর্ণৌ যস্য তু চাশ্বিনৌ সঃ ভগবান্ সিংহো মমাস্ত্বিষ্টদঃ ।। ১ ।।

যন্নেত্রে শশিভাস্করৌ বসুকুলং দন্তেষু যস্য স্থিতং,
জিহ্বায়াং বরুণস্তু হুঙ্কৃতিরিয়ং শ্রীচর্চিকা চণ্ডিকা।
গণ্ডৌ যক্ষযমৌ তথৌষ্ঠযুগলং সন্ধ্যাদ্বয়ং পৃষ্ঠকে—
বজ্রী যস্য বিরাজতে স ভগবান্ সিংহো মমাস্তিষ্টদঃ ।। ২ ।।
গ্রীবাসন্ধিষু সপ্তবিংশতিমিতান্যৃক্ষাণি সাধ্যা হৃদি,
প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমোহস্য তু মহাক্রৌর্য্যৈঃ সমাঃ পুতনাঃ।
প্রাণে যস্য তু মাতরঃ পিতৃকুলং যস্যাস্ত্যপানাত্মকং—
রূপে কমলা কচেষু বিমলা তে স্যু রবেঃ রশ্ময়ঃ ।।৩ ।। .... শ্রীশ্রী চণ্ডী

অনুবাদ :— [গ্রীবায় যার অধিষ্ঠান বিষ্ণুর, মাথায় নীলকণ্ঠ শিব, কপালে পার্বতী, বুকে যার দুর্গা, থাবা সমূহে দেব কার্ত্তিকেয়, চারিপার্শ্বে যার নাগ সকল; কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, **সেই দেবীবাহন ভগবান সিংহ পূর্ণ করুন আমার সকল কামনা**!

নয়নে যার চন্দ্র-সূর্য্য, দন্তপংক্তিতে যার অষ্টবসু, জ্বিহাতে বরুণদেব, হুংকারে শ্রী দুর্গা-চণ্ডিকা; গণ্ডদ্বয়ে যার যক্ষ এবং যম অধিষ্ঠিত; অধরোষ্ঠে-সন্ধ্যা দেবীদ্বয়, পীঠে যার বজ্রধর ইন্দ্র, **সেই দেবীবাহন ভগবান সিংহ আমার মনের সকল আশা পূর্ণ করুন।**

সেই সর্বদেবময় ভগবান সিংহের গ্রীবাসন্ধিতে ২৭টি নক্ষত্র, হৃদয়ে দেবতাগণ অবস্থিত। তার নির্দ্দয়তা, মহাক্রুরতা পুতনারাক্ষসীর মতো; তার প্রাণবায়ুতে জননীকুল, অপানবায়ুতে পিতৃকুল, **তার রূপে লক্ষ্মী এবং শুভ্রকেশরে দেবী-বিমলা বিরাজমানা।**]

তাকে **তাড়াবার সাহস** আমার ছিল না—আর ছিল না এতটুকু ইচ্ছাও। দেখলাম সেই দৈবীমায়ার **এমনই ছলনা যে**, চোখের সামনে একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে লাগলো, **বিড়ালরূপী ভগবান সিংহ**। জানি না সে কী বার্ত্তা বয়ে এনেছিল আমার জন্য! জানি না আমি তার অকৃপণ আশীর্বাদ পেয়েছি কিনা। তবুও যেন মনে হয়—আমার সকল আশা ধীরে ধীরে পূর্ণ হচ্ছে— **কারুর যেন অঙ্গুলী হেলনে**, যে আছে আড়ালে আড়ালে, তার **বরাভয় ছড়িয়ে দিয়ে**! মনে মনে আজও তার **অনুধ্যান** করি।

এ' বিশ্বাস আমার দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে, আলোকময়ী সে জগন্ময়ীর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে— **ওই স্বর্ণ-কর্ণিকার তরুতলে,** [সোঁদাল গাছ = বাঁদরলাঠি গাছ] যখন তাকে নয়ন ভরে দেখেছি; বড় আপন করে—বড় কাছ থেকে; **ইঁটের দেওয়াল ভেদ করে;** এই বছরই (২০০৭) মহা অষ্টমী-মহা নবমীর রাতের **মহা সন্ধিক্ষণে!**

বড় কৃপাময়ী সে—বড় মমতাময়ী সে— রক্তমাংসের জননীর মতো বড়,করুণাময়ী সে! স্বর্গীয় আলো ছড়িয়ে ওই **স্বর্ণকর্ণিকার তলায়,** সে যেন বলে গেল, **"জাগৃহি বৎস, মা ভব প্রসুপ্তিঘোরে"!** আগামী **দীপাবলীর নীরব সূচনা** হয়তো করে গেল সে, আমাকে **জাগিয়ে দিয়ে—মনে করিয়ে দিয়ে!**

শোবার ঘরের সেখানে ছিল না কোন জানালা, ছিল—নিরেট ইঁটের দেওয়াল। বুঝতে পারিনি সাধনার কোন পুণ্যে আমি তাকে দেখেছিলাম! অষ্টসিদ্ধির **প্রাকাম্য-গুণকে** ধীরে ধীরে উৎসারিত করেছে সে আমার মধ্যে; আমি তা' বুঝতে পারিনি। আর যদি সেই দয়াময়ী তা' না করতো—তবে, ওই ইঁটের দেওয়াল ভেদ করে, আমি দেখতে পেতাম না তার **আলোকময়ীরূপ—ওই স্বর্ণকর্ণিকার তলায় ঘন্টাভর!** সে যেন বলতে এসেছিল ঃ—

ওরে .... **তুই ঘুমের ঘোরে থাকবি কতো আর!**
চেয়ে দেখ, আলোয় আলোয়—
ভরেছে সংসার!
এ' রাতের সন্ধিক্ষণে পার হয়ে নে—
যন্ত্রণাময় মৃত্যুর পারাবার!
ওরে .... **ঘুমের ঘোরে থাকবি কতো আর?**
চেয়ে দেখ আলোয় আলোয়—
নাই সে অন্ধকার! নাই সে অন্ধকার!! .... সোমানন্দ অবধূত

মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে সে আলো, স্বর্ণকর্ণিকার গাছের তলা হতে! এক মৃদু আলোক রেখা, ধূসর তার রূপ নিয়ে—**এসে প্রবেশ করলো—এই অভাগার শয়ন-কুটীরে।** আর **আমি ভাসতে থাকলাম সেই মৃদু আলোয়,** ধ্যানাসনে বসে বসে! তখনকার আমার মনের অবস্থা, বুঝাতে পারবো না আমি কাউকে; একমাত্র **অনুভবী মানুষ আর সাধক** ছাড়া! তোমার কাছে আজ এ' সব বললাম, তুমি বুঝবে বলে—তুমি তাকে দেখেছো **আপন কন্যারূপে** বলে! সে কন্যা যে এত **আলোকময়ী,** আগে বুঝিনি আমি!

মেপে নিও আমাকে, তোমার সাধনার আলোয়! আমি মিথ্যুকের গালগল্প করছি কিনা—সেটারও বিচার কোরো—তোমার **গুঢ় সাধনার আলোকে।** নূতন কোন সংযোজন আমি করছি না, আমার এই কথকতায়! শুভমস্তু!

প্রাণভরে শুনেছিলাম তাঁর কথকতা বা প্রবচন, তাঁর দেখায় আর অনুভবে যা আজ ১০-টা বছর ধরা পড়েছে! সাধনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়েছি; মহারাজ ওঁকারানন্দের সব কথকতা! রাতের অন্ধকারে, ঘুমন্ত তপোবনে একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—শুনেছি তার নুপূরের ঝংকার; যা' আমি আর তাঁকে বলিনি এতটুকুও! সাথে ছিল অক্লান্ত পরিশ্রমী রিক্সাচালক, পুত্রসম বিফল হাজরা। পাহারা দেবার মতো, সে শুয়ে থাকতো পাশে পরম বিশ্বাসে আর শ্রদ্ধায়! দু'রাত আর তিনটা দিন কাটিয়ে, বিদায় নিয়েছিলাম মড়াঘাটের বাহুলা মন্দির থেকে! ঈশানী নদী পেরিয়ে, পরম মমতায় বৃদ্ধশরীর নিয়ে—তিনি পৌঁছে দিয়ে ছিলেন আমাকে কেতুগ্রামের বাসষ্ট্যান্ডে! স্নেহময় পিতার মতো, বিদায় বার্ত্তা জানিয়েছিলেন স্বামী ওঁকারানন্দ; বরাভয় হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে!

★★ বহুলা : ১. কৃষ্ণপক্ষ (জীবের জীবনের চরমতম দুর্দিন)।

২. কৃত্তিকা-নক্ষত্র (রাক্ষসী নক্ষত্র বা দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়র স্তন্যদাত্রী মায়েরা।)

৩. ক) কিন্নর-উপত্যকার এক ঝর্ণা বা নদীর নাম,

খ) ঈশাণী নদীর অন্য নাম "বাংলা ভাষার অভিধান" দেখুন, পৃষ্ঠা ১৫১৩ — জি. এম. দাস—সাহিত্য সংসদ।

৪. তমসাচ্ছন্ন রজনী, (Deep & darkest night) যখন জগন্ময়ী রূপ নেয়, মহাকালীরূপে সমস্ত সংসারকে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেতে— প্রলয়বিভঙ্গে নাচে মহাকালের সাথে, ডমরু আর বিষাণ-বাদ্যে :—

"মার দোলা রে—মার দোলা,

ঘিলুটাতে মার টাখ্না—মার টাখ্না;

পুঁড়া ক্যেনে—ওই চুল্হায়! (চিতায়)!"

৫. প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্র বলে—এখানে নাকি পড়েছিল দুর্গার বাম-বাহুর অস্থি। তাই এর নাম বাহুলা। পাগলী সে বেটীর কোঁচড় থেকে, আমিও পড়তে দেখে ছিলাম, রক্তমাংসের এক বাঁ-হাত; আজ থেকে ৩৮ বছর আগে। তার দৈবীমায়াই সৃষ্টি করেছিল এমনই এক কুহক, বুঝাতে এই যে—সে আছে এখানে—থাকে এখানে—থাকবে বহুলায়! ❀ ❀

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



শেষ হলো না ঃ শেষ কথা কে বলবে ?

আজ থেকে ৩৮ বছর আগে, নদী ঝাঁপিয়ে গভীর রাতে যখন আসি; এই মড়াঘাটের **বহুলাক্ষী মন্দিরে**; তখন দেখেছি—**ঘটময়ী দেবী বহুলাকে**; কোন প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সেখানে আমি দেখিনি! ভৈরব সনৎবাবাকে জিজ্ঞেস করে, জেনেছিলাম যে—কষ্টিপাথরের সে বেটী আছে; পাশের **কুণ্ডে বা ডোবায়! তখন কুণ্ডেও পূজা হতো, ঘটেও পূজা হতো এখানে!**

আড়াই দিন ছিলাম আমি এখানে, ৩৮ বছর আগে। আর আজ **৩৮ বছর পরে** এসে শুনলাম, সেই কুণ্ড থেকে পাওয়া গেছে **কষ্টিপাথরের দেবী বহুলাকে**— যার প্রতিষ্ঠা হয়েছে—নুতন মন্দিরে ১) অলোকেশ রায়ের ২) সুরজিৎ রায়ের তত্ত্বাবধানে! তৈরী হয়েছে ট্রাষ্টী বোর্ড—দেখভাল আর নিয়মিত পূজা-অর্চনার জন্য। নিয়োজিত হয়েছে শ্রী নগেন্দ্র নাথ সেন/চ্যাটার্জী পূজক হিসাবে। অতি অতি সুন্দর সুপ্রাচীন মূর্ত্তি। সেই মাতৃমূর্ত্তি হৃদয়মন ভরিয়ে দেয়! **যেন জীবন্ত কোন নারীমূর্ত্তি—কল্যানময়ী!**

মূল বাহুলাপীঠের মালিক-পূজক চ্যাটার্জীরা, হয়েছে হীনবল হতশ্রী দিনে দিনে। প্রাত্যহিক পূজার **রেস্ত নাই** আর তাদের ভাঁড়ারে। তাই কুণ্ড থেকে পাওয়া, ওই **প্রস্তরময়ী** দুর্গামূর্ত্তি ঠাঁই পেয়েছে—রায়েদের নূতন মন্দিরে—যথাবিহিত পূজাও চলছে তার সেখানে।

তবুও বলতে দ্বিধা নেই যে—তপোভূমি মড়াঘাটেই তাকে মানাতো সত্যিই সুন্দর। শহরের পরিবেশ তার জন্য নয়! বড় নিষ্প্রাণ লাগে সেই প্রাণময়ীকে, রক্তমাংসের শরীর নিয়ে যে দেখা দেয় বার বার! এ' যেন রাবণের ঘরে বন্দী মহামায়া অন্নপূর্ণার মতো! সব জেনে শুনেও, তার নূতন নাটমন্দিরে হোম করেছি শুক্লা চতুর্দশীর রাতে। না, হোমাহুতির সেই অগ্নিশিখা, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে; তার গর্ভগৃহের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েনি সেদিন; যেমনটা হ'তে দেখেছিলাম, পরের দিন কোজাগরী পূর্ণিমারাতে, আদি বহুলা মন্দিরের বারান্দায় হোমের সময়। মহালক্ষ্মীর মহামন্ত্রেই হোম হয়েছিল তার—

"ওঁ শ্রীং শ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মৈ স্বাহা"

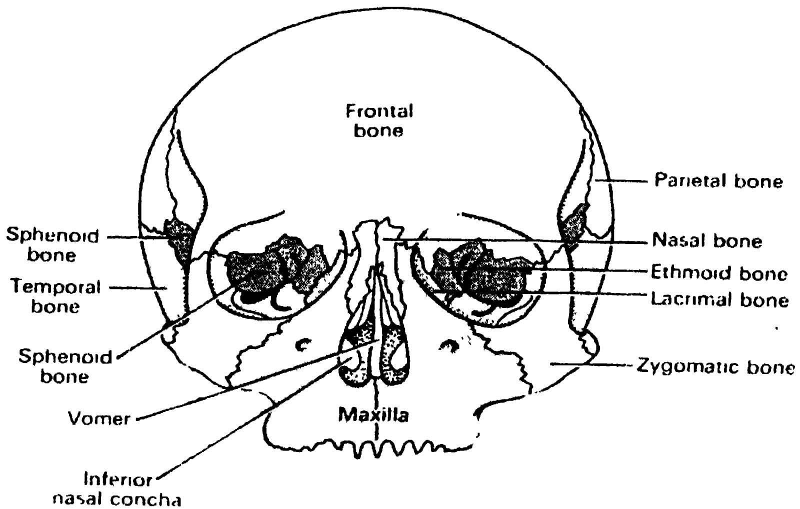
সেই হোমশিখা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বার বার সেই বেটীর গর্ভগৃহে; বয়ে নিয়ে যত আহুতির পবিত্র সম্ভার! পাশে বসে থাকা চক্রেশ্বররূপে, স্বামী ওঁকারানন্দকে সেদিন বলেছিলাম, "মহারাজ, দেখুন—ওই বেটী কেমন করে আগ্রহ ভরে, মুড়ে মুড়ে ঢুকিয়ে নিচ্ছে হোমশিখাগুলিকে; আপন গর্ভগৃহে পরমপ্রীত হয়ে। আসুন—প্রণাম জানাই তাকে—সমস্ত শুভ আর সাফল্যের জন্য!" পূর্ণ হোক আমার দুই সাথীর মনের কামনাগুলো, দয়াময়ী বাহুলার প্রসাদগুণে! সুখে-সম্পদে-স্বস্তিতে ভরে উঠুক, চিন্ময়ের আর দিব্যেন্দু মিত্রের ছোট্ট সংসার!

যে কথা বলতে হবে : আকাট-মুখ্যুদের মারপিট

চোখে-আঙ্গুল, আর মগজে কিল্ মেরে বুঝানো :—

''ত্যুরা খালি **মারাপিটি** কোর‍্যাঁ ব্যুল্‌ছিস্, **'ফুল্লরা ঠিক—অট্টহাস ভুল্'**। **'অট্টহাস্ ঠিক, ফুল্লরা ভুল্'**! ত্যুরা মনিষ্যি না কী রে! মাকে নিয়ে লড়াই (!)? মাকে জেনে লে ক্যানে! মাহাঋষি ★ **বোশিষ্ট** (বশিষ্ঠ) ত্য' উ **উত্তর কুরুবর্ষো-কিন্নর্ দেশ-মাহাচীন্ তিব্বৎ-লাসা-মানস-সরোবর** থিএ্যা উ তারা-খে (তারা-মা) লিয়ে আস্‌ল্য বঠে! সি স্যময় উ ঝে— 'মমি' করাঁ [Mommy + ied = Mommied] ট্যুকান্ উ চ্যুয়াল্ (Mandible) আর উষ্ট্য (ওষ্ঠ = Maxilla) ঝে লিয়ে আস্যেনি, **সিটা ত্যুরা জান্‌লি কী করে**? সিটার টুক্‌রা-গুলান্ ত্য' উ লিয়ে আস্‌তে পারে! সি কী খালি **উগ্রতারার পাত্থরটা (Slate)** দ্বারক্যার জলে তারাপুর-তারাপীঠে ফেল্যাঁ চোলে যেছে? সি ঝে **ই্খানে** আর **ফুল্লরায়** ঝায়নি; সিটা ত্যুদেরখে কে বুল্‌ল(অ) বঠে?

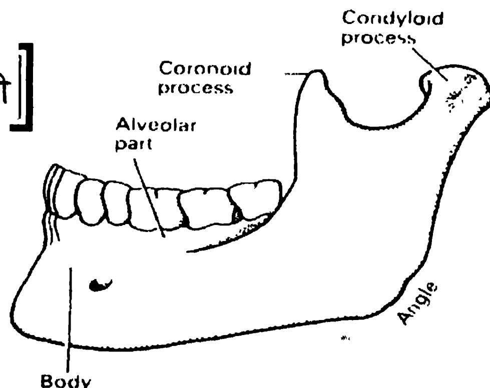
গুরু-শিস্য পরম্‌পরায় সি ত্য' শিস্যখে দিয়েঁ ঝেতে পারে? তারাই ই্খানে— পোতিষ্টা ক্যেনে করব্যাক্ লাই? তার ট্যুকরায় কী ক্যুন(অ) কাম্ হবার লয়? বুঝ্যা দ্যেখ্ ক্যানে, **ঈখাণে-প্যাড়ল (অ) অদর (অধর = Mandible), আর উ-খ্যানে প্যাড়ল(অ) উষ্ট্য (ওষ্ঠ = Maxilla)—এক্ জাগায় দ্যুটা পড়ে লাই! তাই—দু'টা তীত্থ—একটা লয়! মারাপিটির আর ত্যক্কর ক্যুণ(অ) দরকার আছে?** ত্যুরা বুজে লে ক্যানে! দু'-জাগার পাত্থরের শিলামুত্তি দেখে লে ক্যানে! ত্যু ডাক্তার, হাড়গুড় চিনিস্! তুকে আবার বুজাবার লাগব্যাক্? ত্যুখ্যে জুত্তা মারার দরকার আছ্যে! চুরি কোর‍্যাঁ, টুক্যাঁ পাশ্ (Pass) করিছিস্? লোঁজ্জা, লোঁজ্জা! ছিঃ, ত্যু কী রে? দেখে লে ক্যেনে! ত্যুর মত পাঁঠ্যাখে ইংরাজী বুজাতে হবেক? ....**রোহিনী মা**



The Maxilla or upper jaw bone :

This originates as two bones but fusion takes place before birth. The maxilla forms the upper jaw, the anterior part of the roof of the mouth, the lateral walls of the nasal cavities and part of the floor of the orbital cavities. It presents the *alveolar ridge* or *process* which projects downwards and carries the upper teeth. The teeth are present in the alveolar ridge before birth. On each side there is a large air sinus, the *maxillary sinus* or *antrum of Highmore*, which is lined with ciliated mucous membrane and communicates with the nasal cavity.

অট্টহাস : দেবী অধরেশ্বরী]



The Mandible :

This is the strongest bone of the face and is the only movable bone of the skull. The bone originates as two identical parts which unite at the midline. Each half consists of two main parts:

A curved body on the superior surface of which there is the alveolar ridge containing the lower teeth;

A ramus which projects upwards almost at right angles to the body at its posterior end;

At the upper end the ramus divides into two processes, the condyloid process and coronaid process articulates with the temporal bone to form the temporomandibular joint and the coronoid process gives attachment to muscles and ligaments.

The point where the ramus joins the body is called the angle of the jaw. [রোহিনী-মা অট্টহাসের পঞ্চমুণ্ডীর আসনের সামনের, বর্ষনসিক্ত মাটিতে কাঠি দিয়ে এঁকে যা বুঝিয়ে দিয়েছিল, আজ থেকে ৩৮ বছর আগে—সেটাই আজ তুলে ধরলাম এখানে]

[মার সাঁওতালী ঘেঁষা কথাগুলো অনুবাদ করে দিলাম]

''তোরা খালি ঝগড়া-ঝাঁটি করতেই বলছিস—**'ফুল্লরা ঠিক—অট্টহাস ভুল'**। **'অট্টহাস ঠিক—ফুল্লরা ভুল'**! তোরা মানুষ না কী রে! মাকে নিয়ে লড়াই করছিস(!)? তবে মাকে জেনে নে-না কেন! মহাঋষি **বশিষ্ঠ** ★ তো ওই **উত্তর কুরুবর্ষ-কিন্নর দেশ-মহাচীন তিব্বত-লাসা-মানস সরোবর** পেরিয়ে উগ্রতারাকে নিয়ে এসেছিল! সে সময় সে যে, **মমি-করা** (Mommied) **চোয়াল** (Mandible) আর **ঠোঁটের** (Maxilla) টুকরো আনেনি; সেই বা কে বুক ঠুকে বলবে? সে কী শুধু **উগ্রতারার** পাথর-শিলাটাকে এনে, দ্বারকার জলে তারাপুর-তারাপীঠে ফেলে গেছে? সে যে **ফুল্লরায় আর অট্টহাসে** যায়নি—তাই বা কে বলবে? গুরু-শিষ্য পরম্পরায়ও তো তা' হতে পারে! তারাও তো এখানে ওই **পবিত্র অস্থি সমাধি দিতে পারে, পূজা করতেও পারে হাজার-লক্ষ বছর ধরে!** [যেমন করে তোরা পুতাস্থি সমাধিস্থ করিস! শ্রীকৃষ্ণের চক্রের আঘাতে অস্থি পড়েছিল, অথবা শিব এখানে ফেলে দিয়ে গেছলো সেই পবিত্র অস্থি; সে দ্বন্দ্বে তোদের কাজ কী?] অধর আর ওষ্ঠের পুরো হাড়টাই পড়তে হবে, সেই বা কে তোদের বলেছে? **এখানে অট্টহাসে পড়েছে অধর (Mandible), আর ওখানে ফুল্লরায় পড়েছে ওষ্ঠ (Maxilla)**—এ'কথাটা

তোদের আগে জানতে হবে। এক জায়গাতে দু'টো অংশ পড়ে নি। **ও'টা পুরোপুরি ভুল।** আর ওই ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-তর্কের কোন দরকার নাই! প্রস্তরীভূত বা শিলারূপ-গুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেই, বুঝা যাবে—**সঠিক সবই।**"

তুই না ডাক্তার! হাড়গোড় চিনিস্ না? তোকেই বা বুঝাতে হবে কেন? তোর গালে গালে জুতা মারবার দরকার আছে! চুরি করে ঢুকে পাশ করেছিস নাকি? ছিঃ ছিঃ—লজ্জা লজ্জা! ছিঃ, তুই কী রে? নে নে, দেখে নে! তোর মতো রামপাঁঠাকে ইংরাজী বুঝাতে হবে নাকি?

.... **রোহিনী মা**

[উপরের চিত্রগুলো আর বিবরণ দেখুন .... সো. অ.]

★ **বশিষ্ঠ :** **সংস্কৃত শব্দ বশিন্ (যে বশ করে) + ইষ্ঠ (অতিশয়ার্থে) অন্যের চেয়ে যাঁর বশ করা বা জয়লাভের ক্ষমতা বেশী। ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন ইনি। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্র বা সূক্তের দ্রষ্টা ইনি। আর ইক্ষ্বাকু বংশের (দশরথ-রামচন্দ্রের বংশ বা রঘুবংশের) কুলগুরু ইনি।**



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



তন্ত্রাচারের অত্যুৎকৃষ্টভূমি নর্ম্মদাতট

পরমহংস রামপ্রীতবাবা (কালুয়াবাবা), হঠাৎই ঘোষণা করে বসলো—"সুমহান পণ্ডিত্ সোমানন্দ মহারাজ, পঞ্চ্ 'ম-কার' কী বারেমে জ্ঞান্গর্ভ্ এবং বিজ্ঞান-প্রসিক্ত প্রবচন করেঙ্গে! উন্ কামোঁকা আড়মে, ক্যায়া হ্যায়—কিঁউ তান্ত্রিক-লোগোঁনে ঐসা করতে; বো সমুচা ব্যাখ্যা, ধর্ম-দর্শণ এবং সাধু-পরম্পরামে—যো যো ঠিক ঠিক্ হোতা—বো হি বতায়েঙ্গে! জরা ধ্যান দেকে—প্রাণমন খোলকে শুনিয়ে! কোই প্রশ্নয়েঁ হ্যায় তো—পেশ করিয়ে সময় সময় পর—তাকি, হর্ ধোঁয়াশা কী সদুত্তর্ উন্সে মিল্ যায়!"

আমার দিকে তাকিয়ে, সমান কপট ক্রোধে ছ্যাছড়াবাবা বললো, "তেরা মুহ্মে ক্যায়া শিউজীকী বড়্কা বড়্কা লিঙ্গ ঘুস্ গয়া, শালা! চুপ্ কিঁউ বে? বতা দে শালা, ইন নক্লী সাধু-চদুকো—কিঁউ আসলী সাধুলোগ্, পঞ্চ্ ম-কার করতে! একদম্ পূরা পূরা 'সাইন্তিফিক্' (Scientific) বোল্ লে!"

কোন বিষয় না জেনে, কটু মন্তব্য আর এঁড়ে তক্কো করা ঠিক নয়। বিশেষতঃ, এই মহামায়া—শ্রদ্ধা মা আর কুন্তী আম্মা, যখন এখানে আছেন—এবং যখন তারাই চক্রাধিশ্বরীর আসন নেন, তখন ওই বিষয়ের গভীর এক তাৎপর্য্য আছে। আর আজ আমাদেরকে জানতে হবে, আসলে ওই ব্যাপারটা কী? একী শুধু গোপন সঙ্গমলীলা, মাল-ফাল্ খেয়ে, 'with মাগী' নিয়ে! ভগবান কী আসে তা'তে, চিমটে-বাঁশী নিয়ে! ব্যাপারটা যদি বুঝতে না পারি (আমরা এখন), তবে—দেখিয়ে দেবো ওদের, বাপের-মায়ের বিয়ে! হ্যাঁ!!"

"পঞ্চ 'ম-কার' হলো, এক পরম ফলিত বিজ্ঞান-নির্ভর (Practical Science) পদ্ধতি, যা' দিয়ে নিজেকে—ভগবান আর ভগবতী করে তোলা যায়। একে ঘেন্না করতে নাই। বিশ্বপিতা-মাতা শিব-শিবানী, ওই পঞ্চ ম-কারে সৃষ্টির আদি থেকে লীন হয়ে আছে। আর তাই ওইরূপ—লিঙ্গ+যোনীপট। গোপীদের সাথে সব সময় রমণ করতো, ব্রজভূমির কিষণজী ভগবান। রাসলীলার আসরে, ওই পঞ্চ ম-কারই করা হ'তো, এখনকার মতো সেদিনও গোপনে—বৃন্দাবনে আর বিন্ধ্যবনে।

শৈবমতে বা তান্ত্রিক মতে, ওই ব্যাপারটা যখন করা হয়, তখন তার হাল ধরে, বা পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা করে; চক্রেশ্বর বা চক্রেশ্বরী। আর বৈষ্ণবীয় মতে ওকেই বলে 'রাসলীলা', সেখানে পরিচালক বা পরিচালিকার শাস্ত্রীয় নাম হয় রাসেশ্বর (কৃষ্ণ) বা রাসেশ্বরী (রাধা)। রস নিয়ে ওই গভীর গোপন কারবার। তাই তার নাম = রাসলীলা (রস + লীলা)!

দুর্গা ওই রাসলীলার Receptionist Gate-woman হয়ে, সে অতিথিদেরকে receive করে বা reject করে। তখন সে দুর্গা থেকে হয়, খাঁড়া হাতে কাত্যায়ণী। ওই খাঁড়ার অন্য নাম কাতান্। অন্য মানে হলো—কর্ত্তন বা কচুকাটা করা। সবাই সরে পড়ে তখন সটান, যতই টান থাকুক, ব্রজলীলা-রাসলীলা দেখার; ছুঁক ছুঁক করে।

অনেক কাঠ-খড় পুড়াতে হয়, ওই **পঞ্চ 'ম-কার'** পদ্ধতিতে, সফল হতে। এ' 'নারীলোলুপ-বিকৃতমনা-সাধুদের'—মিথ্যা অর্থহীন পদ্ধতি নয়! বরং পরম ফলিত বিজ্ঞান-নির্ভর পথ—**ঈশ্বর হবার পথ! ঈশ্বরকে ধরবার পথ নয়! ঈশ্বর ধরার ধারণা ভুল!** কেমন করে ঘটানো হয় তা' পঞ্চ ম-কার পদ্ধতিতে? আসুন বলি সে সব গুঢ় কথা। না হলে, আপনাদের সন্দেহ ঘুঁচবে না কোন দিন।

(১) আমাদের উদ্দাম রমণ করতে হয়, সাধনসঙ্গিনী (সাধিকা)-কে।

(২) লিঙ্গকে শক্ত-সবল রাখতে, প্রতিদিন খেতে হয় কাঁচা কাঁচা চিবিয়ে, কেঁউ মূল (কেমুক্), যার ল্যাটিন বা বিজ্ঞানগত বোটানিক্যাল নাম Costus Speciosus (Koen), এদের ফ্যামিলি বা গণ হলো—Zingiberaceae. আম-আদা, আদা, হলুদের মতো মোটা মোটা, ছড় বা জড় হয় গাছের গোড়ায়—মাটির নীচে।

(৩) দেহ-মনের অক্ষমতা (physical & mental unfitness) দূর করতে, এ' বস্তু বড় বন্ধুই বটে। পেট-চ্যাট্ (Belly & penis) দু'টোরই ক্ষুধা পূর্ণ করে। স্বাদ—হলুদ, আদার মতো ঝাঁজ আছে! সেদ্ধ করে খেলে পেটও ভরে।

(৪) শরীর-মন নিয়ে সেই গোপন আসরে, নিজেদেরকে মেলে দিতে রাসে-রসে; কষে পান করতে হয় জলহীন কারণবারি। তার সাথে সামান্য পঞ্চ শস্যকণার রুটি, মাছ-মাংস; সাধনসঙ্গিনীকে নিয়ে একসাথে খেতে হয়। তারপর মহাশক্তিরূপে তার প্রতিটি অঙ্গকে পূজা বা ন্যাস করতে হয়, প্রণামও করতে হয়।

(৫) তারপর নির্দ্দিষ্ট নারীকে কোলে বসিয়ে নিয়ে, লিঙ্গস্থাপন করতে হয় তার যোনীতে। পদ্মাসনে বসে মন্ত্রের তালে তালে, করতে হয় রমণ। নিরুচ্চার মন্ত্র জপের দোল-দোলানো তালে। তাল কাটতে দেয় না কাউকে চক্রাধিপতি বা চক্রেশ্বরী মায়েরা। লক্ষ্য রাখে—কঠিণ চোখে। ভুল হবার জো থাকে না তখন। ভুল দেখলে, শাসন করে—শুধরে দেয়।

(৬) নারীই শক্তি, শক্তিময়ীও। সেইই নিয়ে যাবে সঙ্গমের পথ ধরে, ঈশ্বরসংগমে—বানাবে আমাকে ঈশ্বর—সে নিজেও হবে ঈশ্বরী, ওই পথে। চক্রের নিয়ম অনুযায়ী, যতক্ষণ না বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া হচ্ছে দু'জনের; ততক্ষণ চলবে রমণ—তা' রাতভর এক নাগাড়েও হতে পারে।

(৭) চক্রাধিপতি বা চক্রেশ্বর বা চক্রেশ্বরী, যিনি চক্র পরিচালনা করেন সুচারুরূপে, তিনি ছড়িয়ে দেন বা সঞ্চারিত করেন তার সিদ্ধসম্ভাব সাধন-ক্ষমতা (practical will-force); নুতন (নবাগত) সাধক-সাধিকার মধ্যে। কাচের মতো স্বচ্ছ হতে শুরু করে, দেহ দু'টো তখন। তারপর আর সাধক-সাধিকাকে স্থূল দেহে দেখা যায় না। নিরুদ্দেশ প্রকৃতির সাথে, মিশে যেতে হয় প্রকৃতই; প্রকৃতিকে নিয়ে।

(৮) তা'হলে তো, সবাই পারে ও'সব করতে? আমি বলি—না! সবাই পারে না! ঘণ্টার পর ঘণ্টা রমণ, না ঘটিয়ে বীর্য্য বমন—এ' একমাত্র পারে রাধারমণ বা কালীরমণ জাতীয় পুরুষ, বহু সুকৃতি আর practice-এর ফলে। না হলে সব চেষ্টা যায় অগাধ জলে। নারী শুধু তার যোনীপাত্র ধার দেয়, সজল-সোহাগ সঞ্চার করে সাধকের লিঙ্গ-মুণ্ডে আর মনে পঞ্চ-মকারের আসরে, পরে চৌম্বুকত্ব পায় সে।

(৯) অজন্তা-ইলোরা, খাজুরাহোর গুহাচিত্র, পঞ্চ ম-কারেরই ছবি। নারী না পেলে, পশুকে রমণ করেও, উত্তীর্ণ হওয়া যায় ওই পথে; সেটা তখন নারীর ভূমিকা নেয়। গুহাচিত্রগুলোর কোথাও কোথাও, দেখা যায় সেই রমণমুদ্রা। অনার্য্য-ঋষি পশুপতি-শিবের, একান্ত আবিষ্কৃত সাধন পদ্ধতি, জগন্মাতা দুর্গার সাথে। ওই লিঙ্গ আর যোনীমুদ্রায়—তাইই প্রচারিত।

(১০) সঙ্গমের সময় কোন ভাবেই, নারীর গর্ভে বা গর্ভের বাইরেও, কখনও বীর্য্যপাত করা চলবে না। বীর্য্যপাতের বেগ, যোনীতে অনর্গল ঘর্ষণের বেগ, স্তনমর্দ্দনের বাঁধহীন আবেগকে, নালা কেটে জল বের করবার মতো—ঘুরিয়ে দিতে শিখতে হয়, অণ্ডকোষ আর Pelvic floor থেকে, 5th lumber hole-এ—শিরদাঁড়ার ফোকর দিয়ে। সে আবেগ বিদ্যুতের মতো চলবে, মাথার কোটরের পিট্যুটারী গ্লান্ডের দিকে, ছয়টা গ্রন্থি (knot) ভেদ করে করে। সেখানে পৌঁছে তা'—Thalamus গ্রন্থীতে কোটি-কোটি ভোল্টের ঠাণ্ডা আলো ছড়িয়ে দিলে, তবেই 'ভগবান' বনে যাওয়া যায়। বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, আর প্রাকটিশ ছাড়া; ওই কাজ করা সম্ভব নয়!

(১১) যারা হেরে যায়, এই রমণ যুদ্ধে 'বমন' করে; তারা ফিরে যায় ঘরে—মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে। অথবা তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়, দল থেকে ঘাড় ধরে—চিমটে ঝেড়ে—চুটি (চুল) কেটে! তখন সে পাগল হয়—ছাগল-দাড়ী রাখে

আর বড় মাপের এক সাধুর বেশ ধরে; মঠ-মন্দির, সাধন-কুঠিয়া বানিয়ে ব্যবসা করে—ব্লু-ফিল্ম্ বানিয়ে, বিক্রি করে বহু টাকায় বাজারে। রসিক জনে কেনে গোপনে—ডুবে যায় স্বপনে-স্বপনে! দেশের আইন-কানুন যায় চুলোয়—খালি শুধু ওরা গুলোয়!

(১২) বাউলের বাউলানী, সাধুর সঙ্গিনী, মন্দিরের দেবদাসীরা, বৈষ্ণবের বোষ্টুমীরা আরও সব অন্য-অন্য জাতে আর সম্প্রদায়ে (???) ওই কম্মই চলে। সবাই দেখায়, তারা পবিত্র একেবারেই ধোয়া-তুলসি পাতার মতো; একান্তই নিষ্কলুষ। যত্তো শালা, অলপ্পেয়ে আর অলম্ভুষ!

(১৩) বৃদ্ধ বা কমজোরী সাধুরা, যারা কোমর দোলাতে পারে না তালে তালে, তালে থাকে তারা শুয়ে পড়বার, মড়ার মতো শবাসনে লিঙ্গ খাড়া করে। বিপরীত ভাবে রমণে রত হয়, সাধিকা বা বাউলানী বা বৈষ্ণবীরা, গোপীরা। তৃপ্তি হয় বটে, স্ফূর্তি হয় না ওই পঞ্চ ম-কার সাধনার—যত্তো শালা বোকা—পেঁঠে!

(১৪) পুরুষের না হয় উত্তরণ ঘটে দেবত্বে, এমনি করে কঠোর ওই অনুশীলনের মাধ্যমে, নারীর উত্তরণ ঘটে কেমন করে? একটা magnet-কে নিয়ে লোহায় ঘসলে, যেমন সেটাও এক সময় চুম্বকত্ব পায়, তেমনি নারীও বদলায় বড় সহজে। কেন না ওরা, রূপোর মতোই বড় Super conductor. তাতিয়ে তুলে তেতে উঠে—সমধর্মী হয়! ঈশ্বরে-মানুষে তখন, ঘটে সমন্বয় নিশ্চয়! না হলে, ওরা জগন্মাতা হ'তো না!

(১৫) যার নাই নারী, যে চায় না ও'সব—ও'পথ; তার কী পথ? সে পথও আছে, পৎপৎ করে ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলতে। পদ্মাসনে বসে, চোখবুজে কল্পনা করতে হবে যে; একটা শুভ্র আলোক প্রবাহ উজিয়ে চলেছে; শিরদাঁড়া বেয়ে মাথার খুলির দিকে; লিঙ্গমূল থেকে উঠে— ঝরণা বা নদীর জলের মতো। তাতিয়ে তখন তুলতে হয় নিজেকে, বাঁ হাতে জাপটে ধরে লিঙ্গ-অণ্ডকোষ; মৃদু মৃদু চটকানো-চাপ দিতে হয় ওখানে। আর সেই চাপের তালে তালে, কুঁচকাতে হয় নিজের গুহ্যদ্বার বা পায়ুর পেশী, পেটের ভেতরের দিকে। মুখে বা মনে মনে জপে চলতে হয় গুরুদত্ত—মন্ত্র, হেঁইও মারো, হেঁইও-র মতো। আর জুড়িদার হিসাবে, ডান হাতকে রিকোয়েস্ট করতে হয়—মালা জপ করবার জন্য।

এই জংলী মানুষগুলো, কী করে বুঝবে সে সব? আর তা' ছাড়া, ওই সাধু-সাধুমা, সাধনার পুণ্য তাদের যাই বা যতটুকু থাকুক; খটমট্ বিজ্ঞানবার্ত্তা শুনানো তাদেরকে, ডাহা ডাহা অজ্ঞান করে দেবে! তবে কে শুনবে সে সব—কে বুঝবে ওই হ-য-র-ল-ব!

কুন্তীমায়ের কম্বলের তলার, সেই 'আড়াই-মনী—ক্যুইন্টালী' বস্তাটার ভেতর থেকে; মনে হলো—কেউ যেন বলছে, "মূর্খকে বিজ্ঞান বুঝাতে, কে বলেছে তোকে? খচে গিয়ে ঠেঙিয়ে, তোকেই অজ্ঞান করে দেবে ওরা—ওই যোনী-লিঙ্গ-নরকঙ্কালের ছবি দেখালে। সাধুদের, বুনোদের দেখাবি ল্যাংটা ছবি? অশেষ দুঃখ বিশেষ করে ঝরে পড়বে, তোর পিঠে-পাছায়-মাথায়। জ্ঞানীরাই বিজ্ঞান বুঝে। আজকাল জ্ঞানীর আকাল যতই হোক, বিজ্ঞান-পড়া পাব্লিকের আকাল আজো হয়নি—যতদূর জানি।

বাড়ী ফিরে যখন বই লিখবি—লিখবি তার বিজ্ঞান-ইতিহাস। আমি চাই, তোর কলম দিয়ে তা' বেরুক। মানুষ পঞ্চ ম-কারের সত্যটাকে জানুক। দু'চার জন পড়লেও জানবি, একদিন দু'চার কোটি জানবে—ঠ্যাকায় পড়ে। কেন না, অধিকাংশ মানুষ এখন—মানুষ নামক 'পশু'! পশুপতির ফর্মূলার চুলায়, ওদেরকে 'রোষ্ট্' না করলে, 'টোস্ট্' হবে কী করে, 'টেস্টি' হবে কী ভাবে?"

(A) আগেই বলেছি, আমরা প্রতিদিনই কাঁচা কেঁউমূল খাই; চিবিয়ে চিবিয়ে। তা' সেদ্ধ করার মতো অত সময় কোথায়? যা' বলিনি, আগের ওই অনুচ্ছেদে বিস্তৃত করে, তা' হলো এই যে, ওর সাথে মেশাই 'এক-কোয়া' রসুন। ক্যানাবিস্ স্যাটাইভা ইন্ডিকা, যার গোদা বাংলা হলো, গাঁজা-ভাঙ্গ। ও'তে থাকে ক্যানাবিনোন্ রেজিন্, আর এক রকমের ভলাটাইল্ অয়েল বা উদ্বায়ী-তেল। জিন্ সেং (চীনা-প্রজাতি), আফিম বা ওপিয়াম্ (পপী-ফলের আঁঠা)। নিজের বীর্য্য ও নারীর রজঃ, যা' কিনা বৃদ্ধ শরীরকে টগবগে ঘোড়ার মতো বানায়, **Auto-Semeno-Therapy**-র মাধ্যমে।

(B) সোনায় সোহাগার মতো, এক ডেলা ক্যাম্ফর্ (কর্পুর—'সিন্নামোমাম্ কাম্ফরি' নামের এক রকমের গাছের আঁঠা) ফেলে দিলে মদের গ্লাসে; (10 mg প্রতিদিন) সঙ্গে সঙ্গে ওটা গলে যায়। তারপর উপরের লেখা ওই উদ্ভট বস্তুগলো, মুখে ফেলে গিলে ফেলতে হয় ওই মদের সাথে—উদ্‌গেঁড়ের মতো। পেটের নাড়ীভুঁড়ি কী, উঠে আসে ওই সময়? হ্যাঁ, প্রথম প্রথম তাও হয়—তারপর, অভ্যাস হয়ে যায় ধীরে ধীরে। এত করেও যদি কারও লিঙ্গদণ্ড, ঠিক মতো কথা-বার্ত্তা না বলে; তবে আছে সর্পবিষ শংখিয়া। সেটা মড়াকেও, উদ্দাম রমণের 'ছড়া' শুনায়! মরা-হাড়েও ভেল্‌কী দেখায়! ('নর্মদাতীর্থ হতে' প্রথম খণ্ডে, শঙ্খিয়া তৈরীর পদ্ধতি পড়ুন।)

(C) এর পরেও আছে, অনেক উদ্ভট-অভদ্র উপাদান। সেই বস্তু হলো, সমাগতা-সাধিকার অনর্গল ঝরে পড়া যোনীরস আর রজঃধারা; দমকে দমকে সাধকের লিঙ্গ-মুণ্ডে—সারা রাত ধরে। কেন না, রজঃস্বলা সাধিকাকে নিয়েই যে আমাদেরকে

পঞ্চ ম-কার সাধনায় রত হতে হয়! এ' ব্যাপারে তন্ত্র-শাস্ত্র কী বলে? তবে জানুন ঃ—

"রাত্রৌ মাংসাসবৈর্দ্দেবীং পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নো রমন্ ক্লেদযুতোহপি বা।।
বিনা পীত্বা সুরাং ভুক্ত্বা মাংসং গত্বা রজস্বলাম্।
যো জপেদ্দক্ষিণাং দেবীং তস্য দুঃখং পদে পদে।। ....**স্বতন্ত্রম।**

* * *

তর্পণস্য বিধিং বক্ষ্যে যেন কার্য্যাণি সাধয়েৎ।
তর্পয়েচ্চ পয়োভিশ্চ রক্তধারাযুতৈস্তথা।।
মজ্জাভিশ্চ তথা তদ্বৎ স্বকীয়েন কচেন চ।
আকর্ষিতায়াঃ কন্যায়াঃ কুলপ্রক্ষালনেন চ।। ......**কালীতন্ত্রম্**

রাত্রৌ নগ্নো মুক্তকেশো মৈথুনেনাপি তত্ত্বতঃ।
প্রকর্ত্তব্যং প্রযত্নেন সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।। .....**কুলসম্ভব তন্ত্রম্**

"শাক্তেষু বা দিবা সাধকঃ রাত্রৌনগ্নঃ,
সদা মৈথুনাসক্ত মানসঃ।
জপপূজাদি-নিয়মো যোষিৎসু প্রিয়করঃ,
সুভগোদকেন তর্পণম।" ....**কালিকাশ্রুতি তন্ত্রম্**

* * *

অভিষেকাদ্ ভবেৎ শুদ্ধির্ম্মন্ত্রস্যোচ্চারণাৎ শ্রুতৌ।
রতিকালে মহেশানি দীক্ষাকালে চ কন্যকা।।
বলাদ্বা যত্নতোহপ্যর্থাদভিষেকং সমাচরেৎ।
সুরয়া রেতসা বাপি জলেন মনুনাথবা।
সম্ভোগেহভিষিচেন্নারীং রণ্ডাং বা মন্ত্রবর্জ্জিতাম্।।
.........**কৌলতন্ত্রম্ (শ্যামারহস্যম্)**

[মন্ত্রের বিধান মতো রাত্রে মাংস, আসব (মদ), দিয়ে পূজো করবে। তারপর সাধিকা নারীকে নগ্ন করে, নিজে নগ্ন হয়ে রমণ করবে এবং ওই রজঃ + বীর্য্যের সংমিশ্রণ (ক্লেদ) দিয়ে, আবার পূজো করবে। মদ না পান করে রজঃস্বলা সাধিকাকে রমণ না করে; মাংস (এবং মাছ) না খেয়ে; যে সাধক দক্ষিণাময়ীর সাধনা করে— পদে পদে তার দুঃখ আছে।

যা' করলে সমস্ত কাজই সিদ্ধ হয়—এখন বলবো সেই কথা। রক্ত মিশানো জল, মজ্জা, নিজের চুল, আকর্ষিত নারীর (সাধিকার) কুল (যোনী) প্রক্ষালিত জল, ইত্যাদি দিয়ে দেবীর তর্পণ করবে। রাত্রে নগ্ন হয়ে চুল এলো করে, সাধক-সাধিকা মৈথুন কাজে লিপ্ত হয়ে; যত্ন সহকারে দেবীর অর্চনা করবে, সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার কামনায়।

দেবীর জপ-পূজা নিয়ম-নিষ্ঠায় করে দিনের বেলায়, রাত্রে সাধিকাকে (যোষিৎকে) রমণ করে খুশী করে, তারই যোনীধোয়া জলে (সুভগ-উদকেন) তর্পণ করবে। কৌলতন্ত্রে শিব বলেছেন—মহেশ্বরি (কালী)! সাধক, সাধিকার কানে মন্ত্র দিলেই সব শুদ্ধি আসে। তাই রমণকালে বা অভিষেক সময়ে (বীর্য্যাভিষেক) গায়ের জোরে তাকে ধরে এনে, অথবা যদি সে নিজেই আসে, সেই নারীকে অভিষেক করবে। রমণ সম্ভোগের সময়ে, সুরা (মদ) শুক্র (বীর্য্য) , জল, মধু দিয়ে সেই রণ্ডাকে (রাঁড়ী-নারী অথবা বেশ্যা), অথবা মন্ত্রহীনাকে (যার দীক্ষা তখনও হয়নি) অভিষিক্ত করবে!]

কী, ভাই সব! এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না! আমার বই পড়তে গেলে, আগে যে পড়তে হয়—ভারতের তান্ত্রিক ঋষিদের শিলালিপি, তাম্রলিপি, ভূর্জ-লিপি বা তুলট্ কাগজের লেখা; সেই সব লিপি—লক্ষ বছর আগের; সভ্যতার ঊষালগ্নে আর্য্য-মুনি-ঋষিদের প্রজ্ঞায় যা' ধরা পড়েছিলো!

'চামড়ার ভিতর দিয়ে শরীরে যেমন শুষে যায়, একটু একটু করে জল-তেল-মালিশ; তাই রোগ-বালাই পালায়। তাই সৃষ্টি হয়েছে মলমের, মালিশের। যোনীকুণ্ডে যখন পুংলিঙ্গ ঘর্ষিত হয়, তখন কী সেটা শুষে নেয় না, ঘণ্টার পর ঘণ্টায় যোনীরস ত্বক দিয়ে? অথবা অপরদিকে—নারীর জন্মপ্রকোষ্ঠের দেওয়াল (**Pelvic floor**) বা তন্তুগুলো কী শুষে নেয় না, পুরুষের ক্ষরিত মৃদু **Prostate**-রস? সতঃসিদ্ধ নিয়ম এই যে—শুষে নেয় তা' উভয়েই—নেই কোন সন্দেহ!

নারী ঝরায় তার, রজঃ আর যোনী-রস। সেই পিচ্ছিল পথে, লিঙ্গ সঞ্চার করে পুরুষ—ঢালে তার রেতঃ। উভয়ে শোষণ করে, উভয়ের ওই রসধারা

কমবেশী। সম্যক উত্তাপে, পাগল-পাগল হয়ে। জেগে উঠে ও'গুলোর যত মাংসপেশী। এসো বিজ্ঞান-কথা কই—অজ্ঞান করে দিতে, আমি মোটেই মিথ্যুক নই। এসো, চড়ো বিজ্ঞানের মই।

'Hormone' কথাটা ল্যাটিন।

যার আসল কাজ হলো, শরীরটাকে 'ঝাঁকিয়ে' দেওয়া, বা 'রাগিয়ে' দেওয়া; 'রাঙ্গিয়ে' দেওয়াও—বলা যেতে পারে। জীব-দেহের কতকগুলো গ্রন্থী আর যন্ত্রের ভেতর, এমন সব গুরুত্বপূর্ণ রাসায়ণিক বস্তু জন্মায়, যা' কিনা রক্ত-স্রোতে-স্রোতে; সঞ্চারিত হয় গোটা শরীরে। ওরা বিশেষ বিশেষ কাজ করে—নানা কারণে আর প্রয়োজনে। এ'র তরল রূপ হলো—ওই রজঃ-রস্-রেতঃ। 'হর্মোন'-এর হ্রেষা-রব, স্ফুরে ঘন ঘন! ভাই সব—সন্দ আছে কোন?

এসো, ঘেঁটে দেখি সে নারীকে—অকাতরে যে দেয় বেঁটে, তার সুধা। মেটে. মোটা-মাথা পুরুষের; মোটা-মোটা-ক্ষুধা—লিঙ্গমূলে! উদ্ভট স্বপ্ন আর লোভের মায়ায়, ভগবানকে ধরবার মূর্খ-প্রত্যাশায়—ত্রিশঙ্কুর মতো, নেশা ঘোরে কিম্বা বেঘোরে; থাকিও না ঝুলে। এ' শাস্ত্রে সফল হলেও, গর্বে-গর্বে উঠিও না ফুলে!

পূজা হয়, সাফল্যের ফুলে—নাক ঝাড়ে 'অসফল-বেল্লিক- fool-এ'! সমস্ত ব্যাপার নিয়ে শুধুই গুলোয়। অতি বোদ্ধা ভাব করে, হাটে-বাটে মাঠে; তার লাগি—এ' শাস্ত্রটা যায় কী চুলোয়? শোন বৎসগণ, বিজ্ঞানের কিছু কথা করি বর্ণন। এসো চড়ি—সায়েন্সের মই (ladder); কোরো না হই-চই—আমি কিছুটা বিজ্ঞানী বটে, তবে—ডাহা ডাহা মিথ্যুক—বা, বুজরুকও নই!

Gonadotropic Hormone :

এই তরল-ভদ্রলোক, রক্তস্রোতে পায়াচারী করে করে, নারীর 'ওভারি' আর পুরুষের 'টেষ্টিজের'; কাম-কাজের তদারকী করে। নারীর 'ঋতুচক্র' পরিচালনা করে, পুরুষের বীর্য্যরস বাড়ায়। ওই ভদ্রলোকের দু'টো পকেটে থাকে—**Prolan-A, (Folicular Hormone); Prolan-B (Leuteinizing Hormone)!**

এই **Prolan—A**-র কাজ হলো ঃ

গ্রাফিয়ান্ ফলিক্ল্-এর বাড়বৃদ্ধি ঠিক মতো করে, মেয়েদের ঋতুসঞ্চার-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। ও'টাই আবার 'ঝালেও আছি, ঝোলেও আছি' হয়ে—পুরুষের অণ্ডকোষের, শুক্র তৈরীতেও হাত লাগায়। পুরুষ আর মেয়েকে 'চুপ্কী' মেরে, মাঝে মাঝে বলে, "কাইন্দ ক্যান? রক্ত ঝরবার সময় হইসে। ঝর্‌বার দ্যাও! অ্যারে কয় মাসিক—মাস-কাবারী আইব, অহন থিকা। তুমি কী আর করবা—যাওগা, ইডার

ব্যাপারে—মা-মাসীর লগে দুই-খান্ আলাপ কর!"

আর পুরুষ পোলাপান্রে কয়—অহন হইসে সময়, ঘুম থিকা জাগবার। এক খান্ ল্যাঙ্গট্ কিইন্যা লও—লিঙ্গডা চ্যাতাইয়া উঠব না। অহনই গত্ত খুজ্লে, গুঁত্তা খাইয়া, সূত্যা ছিরবা! হাল্লায়, কাম-কাজ নাই—মেয়্যাগোর লগে দৌরাও? বাবার হোটেলেই ত্য' খাও! ফ্যার্, মাগী দু-চার খান্ নিবার চাও?"

<u>Prolan—B-র কাজ হলো</u> :

কর্পাস ল্যুটিয়ামকে ক্রিয়াশীল করে, প্রোজেস্টেরণ তৈরীর কারখানা বানায়। পুরুষের বিচির টিস্যু-সেল (Interstitial cells of the testes)-কে উজ্জীবিত করে, Androgenic Hormone বা বীর্য্যরস তৈরীও করে। Pituitary গ্রন্থীর এই ভদ্রলোক, যদি গোমড়া মুখে থেকে, শরীরে কাম-কাজ না করে; তবে—যুবকদের সঙ্গম ক্ষমতা চুলোয় যায়!

পুংদণ্ড কেৎরে পড়ে তার, টিকটিকির মতো নড়বড়ে হয়। কিন্তু যদি ওই গ্রন্থীরস, ইঞ্জেক্ট্ বা মালিশ্ করা হয়, তবে আবার ঝুলে থাকা ওই লিঙ্গ-ভদ্রলোক—'ঝুলে-লাল' বনে যায়। মেয়েদের পেছনে দৌড়ায় গাইতে গাইতে—আরে, আরে লাগি রে লগন; দেখো সঘন জঘন—গোপী-লোগ্ দিল্কো চুরায়। ভাদ্দুরে কুত্তার মতো, দৌড়্ যে করায়—হায়, হায়!'

<u>Chorionic Gonadotropin Hormone</u> :

Placenta বা গর্ভফুলের কোরিওনিক ভিলাই থেকেও, গোনাডোট্রপিন হর্মোন তৈরী হয়, এবং নারীর প্রস্রাবের সাথে প্রচুর তাকে পাওয়া যায়। বন্ধ্যাত্ব, রজঃদুষ্টি, গর্ভস্খলন, নানা রোগে ব্যবহার হয়। পুরুষের বিচির রস শুকিয়ে গেলে, ওই হর্মোন রসে টইটম্বুর করতে পারে বটে—তবে বাচ্চা পয়দা করতে যে শুক্রকীট বা স্পারমাটোজোয়া লাগে; তা' তৈরী করতে পারে না। কর্পাস ল্যুটিয়াম্ বা ফলিক্ল্ তৈরীর কাজে, হাত লাগায় না ওই হর্মোন। তবে ইঞ্জেক্ট করলে, হঠাৎ হঠাৎই সঙ্গমের কাজে-কর্মে গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করে; পুরুষের ওই নুনু বা বদখৎ যন্তরটা। কী, লজ্জা পাচ্ছেন বুঝি?

<u>Estrogenic Hormone</u> :

আগে বলে নিই **Estrus** মানে হলো, ঋতুকাল বা মাসিকের কাল বা শাস্ত্রীয় মতে 'অম্বুবাচী-কাল'। কামাখ্যার নীলপর্বতে দুর্গার যোনী যেখানে পড়েছিলো; সেখানেও নাকি হয় মাসিক, আষাঢ় মাসের শেষ দিকে। কয়েকটা 'সাধু-মৌসা' আমাকে সে কথা বলেছে, বিশেষ গোপনে। বিজ্ঞান গোপন জানে না, স্বপন জানে।

আর তাই আবিষ্কার করে ফেলেছে—এষ্ট্রোন বা **theelin;** আর এষ্ট্রিয়ল্ বা **theelol;** যা' বেরোয় গর্ভিনীর মূত্র থেকে, অথবা গ্রাফিয়ান ফলিক্ল-এর রস থেকে। তা' ওই রসবতীর কাজটা কী? আসুন না, একটু জেনে নিই!

পুরুষের যৌন-ইন্দ্রিয়, নারীর যোনী, জরায়ু, দু'টো ফ্যালোপিয়ান টিউব; আর ওই-গুলোকে ধরে রাখে শরীরের যে পেশীগুলো; সবই ওই 'হর্মোন' নামক সার খেয়ে, বর্ষার লতাগুল্মের মতো—যৌবনে লকলকিয়ে উঠে ফেটে পড়ে—জেল্লা মারে শরীরে আর মনে।

তবে—ওভারীর ভারী বয়েই গেছে, ও'তে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে। বরং সে ওদের উৎপাতে, চীৎপাৎ হয়—বড়ই ছোট হয়ে যায়, শরীরী-কাজিয়ায় (লজ্জায়?)।

তা' ওই যে বলেছি "ঋতুকাল"—সেই ঋতুতে থাকে, দুই উল্টো পথে হাঁটা দু'টো হর্মোন। একজন—এষ্ট্রোজেন, অন্য জন—প্রোজেষ্টেরণ। এক জন ভাঙ্গে, আর অন্য জন গড়ে। দুই ব্যাটাই ঋতুচক্রের জুড়িদার। একজন জরায়ুতে ফুলের বাসর সাজায়। অন্য জন তা' ভাসিয়ে দেয় রক্তস্রোতে। মাসিকের সময়, মাসী-পিসিদের হড়হড় করে, এষ্ট্রোজেন ক্ষরণ হয় রক্তে এবং মূত্রে। জানা গেছে সেই কথা বিজ্ঞান সূত্রে।

সেই সূত্রে বলি, ডাক্তার ব্যাটারা গোটা ব্যাপারটা বুঝেই, পেচ্ছাব পরীক্ষা—রক্ত পরীক্ষার নাম করে, ওই মাসিকের ন্যাকড়া থেকে লক্ষ-লক্ষ এম্পুল. বড়ি-ক্যাপসুল বানায়—টাকা কামায়, রোগ কমায়। ওভারী থেকে বেরোয়—এষ্ট্রোন, ফুল **(Placenta)** থেকে তৈরী হয়—এষ্ট্রাডিয়ল, আর পেচ্ছাব থেকে বানায়—এষ্ট্রিয়ল বা থিলল্। এষ্ট্রাডিয়ল বেঞ্জয়েট, আর ওরই ডাই-প্রপিওনেট; অতি অতি দীর্ঘস্থায়ী কাজ করে শরীরে।

কী ভাই সব, কেমন লাগছে ডাক্তারী বিদ্যা গিলতে? আজ্ঞে না, ওই পঞ্চ ম-কার কেন হয়—ও'তে প্রাকটিক্যাল বিজ্ঞান কী, কেন চোর-চামার, ছ্যাঁচড়-বাঁদর, সাধু-চদু, বড় সস্তায় ও'গুলো করে; নিজেদেরকে ভগবান বানায়—তারই খতিয়ান খুলে দেখাবো বলেই; বললাম এত কিছু কথা। আসল কথাটা এখনো বলিনি—উপকরণ আর তার কাজ কী সেটুকুই বলেছি মাত্র। এবারে আপনারা হয়ে যান, **Anatomy & Physiology**-র সুবোধ ছাত্র (আমার কিন্তু না)।

পঞ্চ ম-কারের সঙ্গম-সুধায় ডুবতে গেলে, বুঝতে হবে ওই **Human Anatomy & Physiology.** ওই পথে কেমন করে জাগে কুণ্ডলিনী, বুঝা যাবে সেই ব্যাপারটা। কী ভাই, বড় খাট্টা খাট্টা লাগছে? তবে একটু নুন-চিনি মিশিয়ে, ব্যাপারটাকে চিনিয়ে দিই। তবে, দাঁত কড়মড় করে চিবোবেন না—ভিরমী লাগবে।

পরবর্ত্তী চিত্রগুলো আর তার text থেকে কী বুঝবো? বুঝবো এই যে, প্রজনন ক্রিয়ায় যে অর্গানগুলো লাগে, সেগুলো ওই পেল্‌ভিক ফ্লোরেই থাকে। আর তা' কতকগুলো মাস্‌ল্‌-এর সমন্বয়। অত্যন্ত সেন্সিটিভ্ ও'গুলো। সামান্য তাপ-চাপ-স্পর্শে তা' চনমন করে উঠে।

নানা হর্মোনবাহী ওই অর্গানগুলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রমণ ক্রিয়ায়; বদ্ধপাগল হয়ে উঠে। তাকে ত্বরান্বিত করে—বাইরে থেকে শরীরকে দেওয়া; ওই খাদ্যরূপী উপাদানগুলো। এই কর্ম্মটি হলো—**Strike the iron, While it is hot**-এর মতো। সাধক-পুরুষ যখন রমণ করছে, সাধিকা-নারী যখন রমিত হচ্ছে; সমান সমান তালে-ছন্দে-চাপে, শরীর উঠছে পড়ছে ধ্যানের পদ্মাসনে; সমানে ক্ষরিত হয়ে চলেছে তখন, যে যোনীরস+রজঃধারা; লিঙ্গমুণ্ডে যোনীর ভিতর—সেই লিঙ্গকে অসম্ভব মনের জোরে, অভ্যাসে আর উইল ফোর্সে; নিষেধ করতে হবে বার বার—কমান্ড পাঠিয়ে! "দ্বারকে রুদ্ধ করতে হবে—বীর্য্য বেরুবার পথ খোলা যাবে না।"

আবার আগের ওই সব বস্তুগলো শরীরে দেওয়া হয়েছে, খাদ্যরূপে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। তাই সেগুলো অসম্ভব গাঢ় করে তুলেছে পুরুষের বীর্য্যধারা। কঠিন শুষ্ক মলকে যেমন, কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে চাপ দিয়ে বের করতে হয় পায়খানায় গিয়ে; তেমনি বীর্য্যও শক্ত হয়ে যায়, বের হতে পারে না—আবার বেরুতেও তার মানা, একেবারেই মানা!

ফলে শুরু হয় অসম্ভব সুখ-সঞ্চারী-যন্ত্রণা, ফেটে-টুটে পড়তে চায় সমস্ত শরীর। আর সেই পরম লগ্নে, সেই যন্ত্রণার আবেগকে করে তুলতে হয়; আরও গভীর থেকে গভীরতম। প্রিয়তমকে **(God or success)** পাবার ব্যথা জাগাতে হয়, নিজের মধ্যে শ্রীরাধিকার মতো; অথবা শিবানীর মতো।

তারপর চরম মুহূর্ত্তে, দমকা মেরে কুম্ভকের দম বন্ধ করে, ঘুরিয়ে দিতে হয় সেই সুখ-শিহরণকে—**mental command** আর **will force** পাঠিয়ে—**Spinal cord**-এর **5th Lumber Hole**-এ। সেই বেগ রূপান্তরিত হয় চুম্বকায়িত বিদ্যুতে। ধেয়ে চলে উর্দ্ধপানে, মাথার ঘিলুতে, যেখানে লুকিয়ে থাকে **Pituitary gland;** হাজার সেন্সরী নার্ভের জটলায় জড়িয়ে।

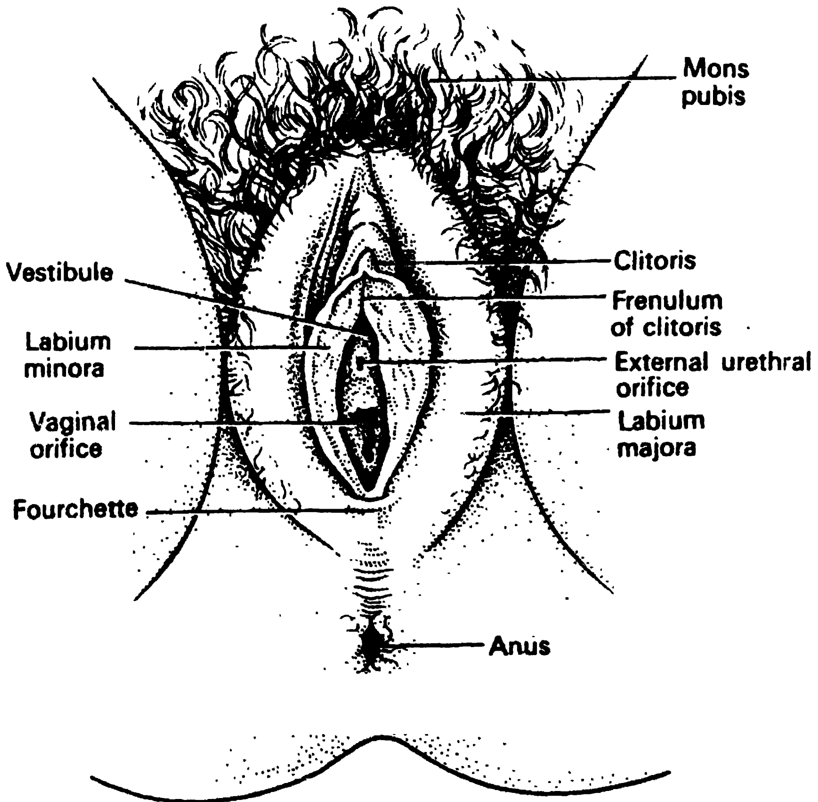
সেখানে যখন পৌঁছায় 'আবেগ-বিদ্যুৎ'—তখন জ্বলে উঠে প্রকাণ্ড **bulb**-এর মতো, কোটি সূর্য্যের 'শীতল' আলোয় আলোয়। সাধক-সাধিকা তখন মিলাতে শুরু করে—মিশে যায় স্বচ্ছ হাওয়ায়—ভগবান-ভগবতীতে তাদের ঘটে রূপান্তর। যারা মিলাতে পারলো না হাওয়ার মতো—**unsuccessful** হলো তারা।

সফলরা আবার কিছু পরে, স্ব-অবস্থায় ফিরেও আসে। বাইরে থেকে ওরা

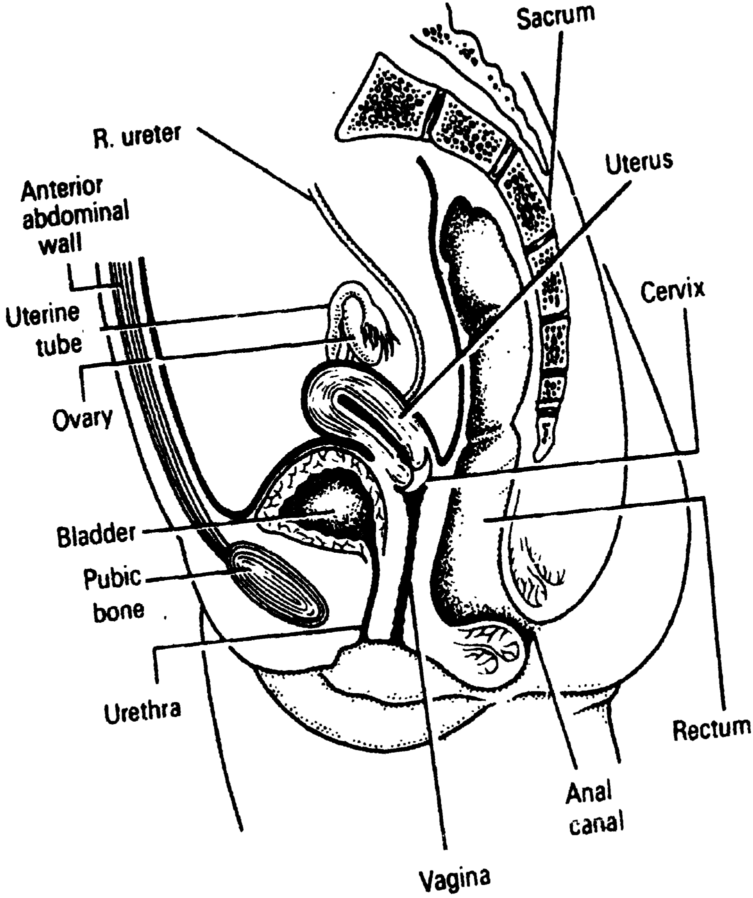
থাকে, চেনা মানুষ আর নারী। ভেতরে ওদের অধিষ্ঠান হয় ভগবানের। অথবা বলতে পারি, ওরা নিজেরা—ভগবান হয়ে যায়। কোটি কোটি জন্মের, যে কলিমলে প্রলিপ্ত ছিলো ওদের শরীর, এখন তা' ধোয়া হয়ে গেছে। ওরা হয়ে গেছে সত্যি সত্যি অকলংক ভগবান।

তাই বিশ্বচরাচরের সব ছবি, ধরে নিতে পারে ও'রা নিমেষে। প্রকৃতিকে জয় করেছে বলে—ওরা কমাণ্ডও করতে পারে তাকে। মাথা পেতে নেয় তখন সেই প্রকৃতি, তার সব নির্দ্দেশ আর আদেশ। অথবা অন্য রকম করে বলতে গেলে, ওরাই 'প্রকৃতি' বলতে হয়। আর বলতে হয়—ওদের ইচ্ছাই তখন হয়ে দাঁড়ায়; প্রকৃতিরই ইচ্ছা বা অনিচ্ছা। ব্যাপারটা 'উচ্ছা'র মতে তেতো লাগছে কী?

স্ত্রী-পুরুষের শারীর-সংস্থান - —



ছবি নং—১



(Desect করার পরের ছবি : Female Pelvic floor)

ছবি নং—২

বিশ্বমাতার যোনী হিসাবে একে মর্য্যাদা দিতে হয়, প্রণাম-পূজাও করতে হয়—পঞ্চ 'ম-কার'-এর আগে। সাধকের কাছে এই স্ত্রী-যন্ত্র, বিশ্বপ্রসবিনীর মতো প্রণম্য। কামাখ্যা মায়ের মতো পবিত্র।
মন্ত্রঃ—ওঁ যোনীবর্ত্মমিয়ম্ জগদম্বায়াঃ. কামাখ্যায়াঃ প্রণমাম্যহম্—পূজয়াম্যহঞ্চ পঞ্চ-মকারার্থম্।

<u>ওই স্ত্রী এবং পুরুষ যৌন-অঙ্গের পরিচয়</u> ঃ

Muscles of the Pelvic Floor

The **pelvic floor** is divided into two identical parts at the midline. Each half is made up of muscles and fascia. The muscles are :

Levator ani

Coccygeus

Levator anus :—

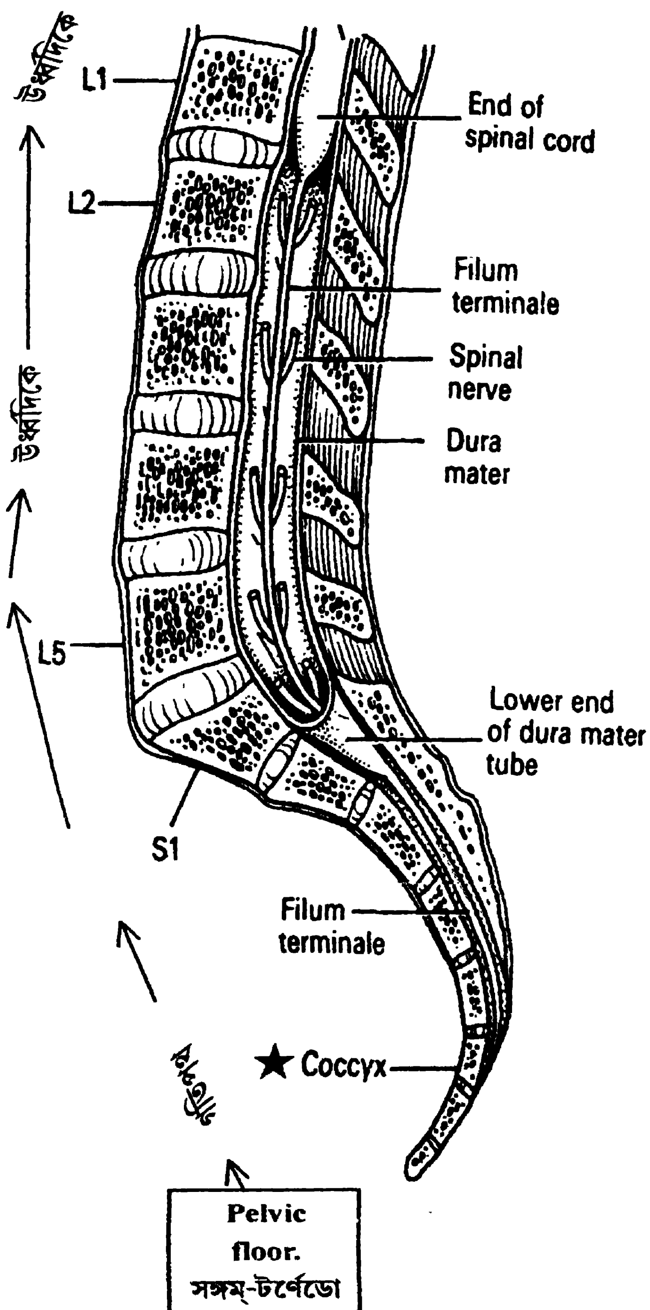
This is a broad flat muscle which forms the **anterior part of the pelvic floor.** It originates from the inner surface of the lesser pelvis and unites in the midline with the muscle from the opposite side. Together they form a sling, **which supports the organs of the pelvic cavity.**

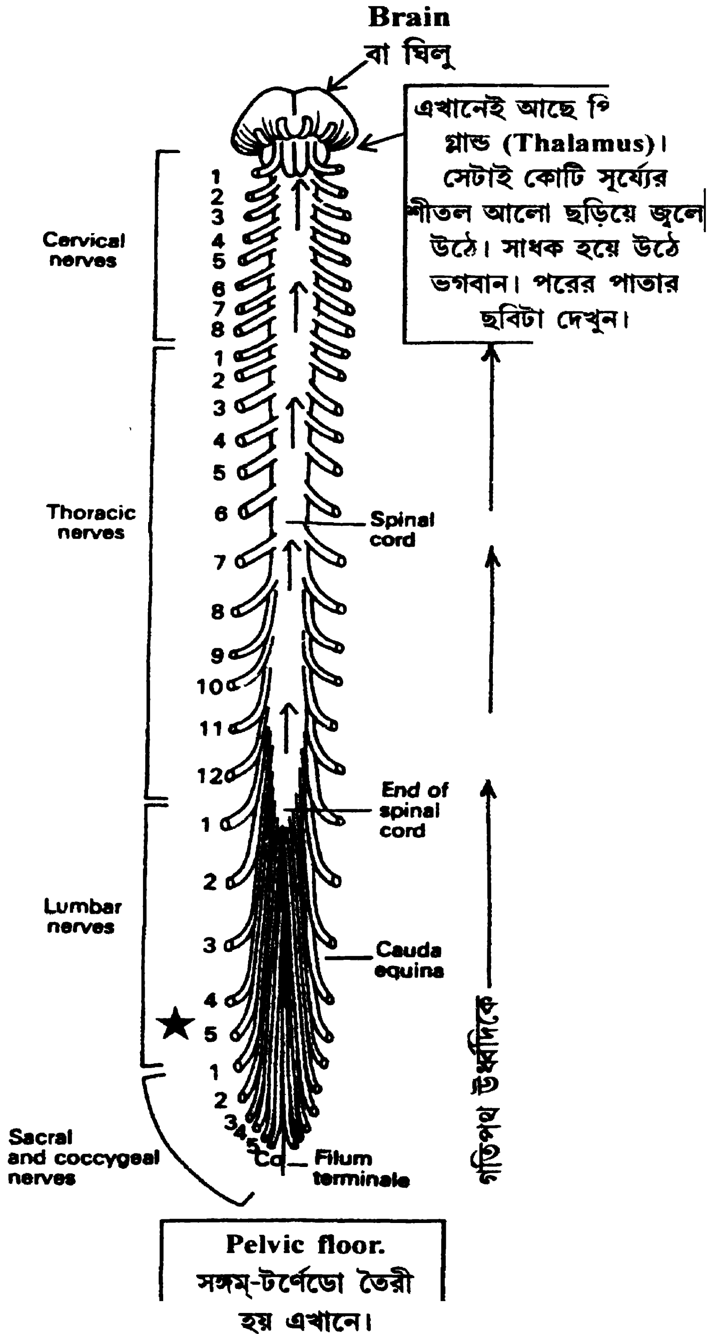
Coccygeus :—

This muscle is **triangular in shape** and is situated behind the levator ani. It originates from the medial surface of the ischium and is inserted into the **sacrum and coccyx.**

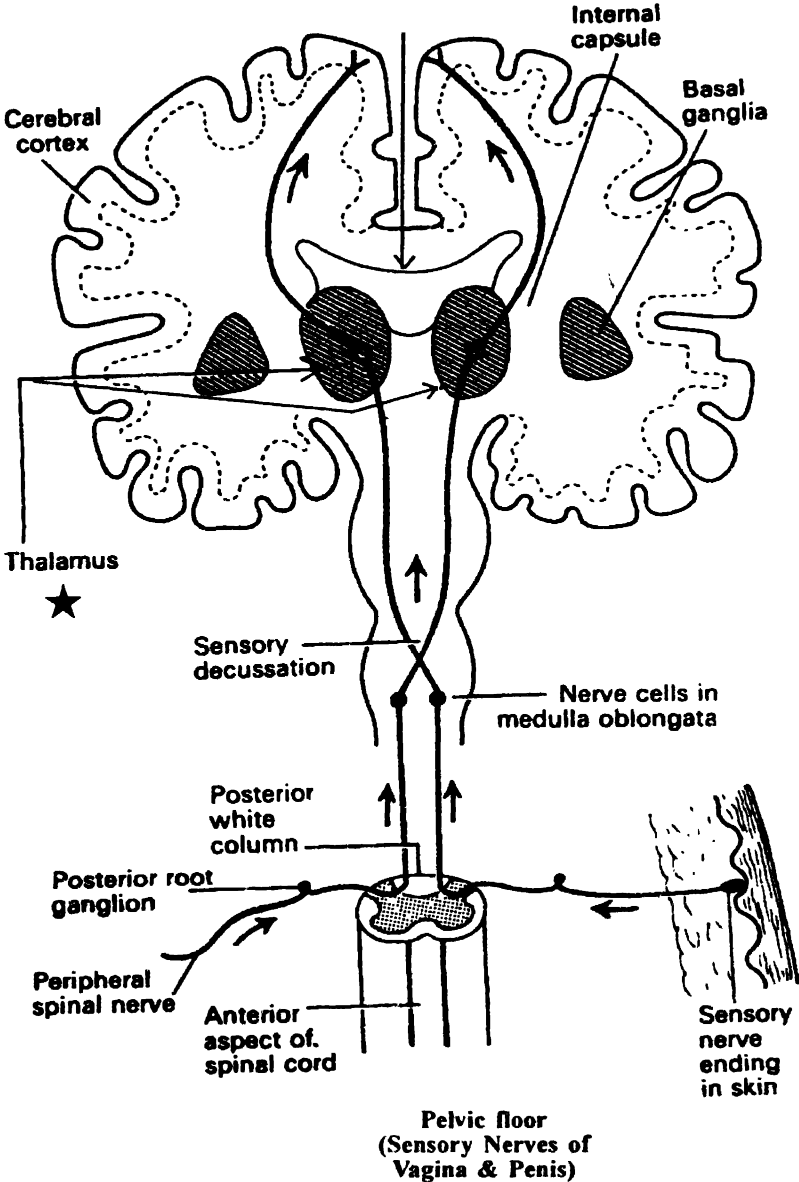
These two **muscles complete the formation of the pelvic floor,** which is perforated in the male, by the urethra and the anus and in the female, by the urethra, **the vagina and the anus.**

সঙ্গমের সময় এখানেই তৈরী হয়, এক 'টর্ণেডো'—যা' কিনা পুরো পেলভিক্ ফ্লোরকে, উন্মত্ত-পাগল করে তুলে; ফেটে-টুটে পড়তে চায়। তৈরী করে এক বিদ্যুতীয় চুম্বকক্ষেত্র বা **Electro-magnetic field,** ওই বিদ্যুৎ প্রবাহ কক্সিক্স্ এর পথ ধরে, খুঁজতে খুঁজতে চলে স্পাইনাল্ কর্ডকে—মেরুরজ্জু যার অন্য নাম। ওই রজ্জু বেয়ে, সেই **Electro-magnetic** স্রোত চলবে, উপরের দিকে ঘিলু বা **Brain** পর্য্যন্ত। জ্বালিয়ে দেবে শীতল আলো, কোটি সূর্য্যের—থ্যালামাস্ গ্রন্থীতে।


উর্ধ্বদিকে
L1
End of spinal cord
L2
Filum terminale
Spinal nerve
উর্ধ্বদিকে
Dura mater
L5
Lower end of dura mater tube
S1
Filum terminale
★ Coccyx
Pelvic floor.
সঙ্গম্-টর্ণেডো


Brain
বা ঘিলু
এখানেই আছে পি
গ্ল্যান্ড (Thalamus)।
সেটাই কোটি সূর্য্যের
শীতল আলো ছড়িয়ে জ্বলে
উঠে। সাধক হয়ে উঠে
ভগবান। পরের পাতার
ছবিটা দেখুন।
Cervical nerves
1 2 3 4 5 6 7 8
Thoracic nerves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Spinal cord
End of spinal cord
Lumbar nerves
1 2 3 4 5
Cauda equina
Sacral and coccygeal nerves
1 2 3 4 5
Co
Filum terminale
গতিপথ উর্ধ্বদিকে
Pelvic floor.
সঙ্গম্-টর্ণেডো তৈরী
হয় এখানে।

Filament-এর মতো জ্বলে উঠে, কোটি সূর্য্যের আলো ছড়ায়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় তখন। সাধক-সাধিকা বাতাসে মিলায় তখন—কিছু সময়ের জন্য।



Pelvic floor
(Sensory Nerves of Vagina & Penis)

WHITE MATTER (Spinal Cord)

The white matter of the spinal cord is arranged in three columns or tracts :

1. The anterior columns
2. The posterior columns
3. The lateral columns

These columns are formed by ***sensory nerve fibres ascending*** to the brain from the periphery of the body, ***motor nerve fibres descending*** from the brain prior to reaching the organs or muscles which they **stimulate** and the ***fibres of connector neurones.***

SENSORY NERVE TRACTS (AFFERENT OR ASCENDING) IN THE SPINAL CORD

There are two main sources of **sensation** which are **transmitted to the brain via the spinal cord.**

1. ***The skin.*** Sensory nerve endings in the skin **(cutaneous receptors)** are **stimulated by** ***pain, temperature and touch.*** The nerve **impulses pass by three neurones** to the **sensory area** in the ***opposite hemisphere of the cerebrum*** where the sensation and its location are perceived.

2. ***The tendons, muscles and joints.*** Sensory nerve endings in these structures (proprioceptors) are **stimulated by stretch.** These nerve impulses have **two destinations :**

(a) By a three neurones system the impulses reach the **sensory area of the** ***opposite hemisphere of the cerebrum.*** The resultant perceptions are of the position **of the body or parts** of the body in space.

(b) By a two neurone system the nerve impulses reach the ***cerebellar hemisphere on the same side.***

Together with impulses from the **eyes and the ears** proprioceptor **impulses are associated** with the maintenance of **balance and posture.**

Sensory nerve impulses from the **left side** of the body are carried to the **right hemisphere** of the brain. This means that one of the neurones **must cross to the opposite side.** The crossing is called ***decussation*** and it takes place either at the level in the **spinal cord** at which the **nerve fibre enters** or in the **medulla.**

এখন বলবো **মালিশ-ম্যাসাজ, ওয়েন্টমেন্ট—লিনিমেন্ট-আনগুয়েন্টাম্-মলম্** এর গুঢ় সব কথা, মনের ব্যথা জুড়াবার জন্য। গুরু-গুরুমা ছাড়া, প্রাক্‌টিস্ করতে গিয়ে হবেন না বন্য। তাহলে ডাকবেন 'উচ্ছন্ন'! ব্যাপারটা, কাল-কেউটের মতো বিষময়—নাইকো বিস্ময়। ও'পথে আমার হাতে খড়ি হয়ে গেছে, প্রায় 48/49 বছর আগে, সেই আমার বাছুর অবস্থা থেকে—বকরী-বাছুর চরাতে চরাতে, বাবলা গাছের সারির আড়ালে; দূর গাঁয়ের প্রান্ত-সীমায়।

আমরা প্রতিদিন চানের আগে, ভাল করে সরষে তেল মাখি। ব্যথা বেদনায়. ওই তেল শরীরে মালিশ করি। বাচ্চাদেরকেও মাখাই সরষে তেল, অলিভ ওয়েল, কড়্লিভার ওয়েল। খুচ্লী-দাদা-এক্‌জিমা-পাঁচড়ায় লাগাই মলম। মচকে গেলে লাগাই বা মালিশ করি লিনিমেন্ট বা ওয়েন্টমেন্ট্—অ্যানগুয়েন্টাম্ ইত্যাদি। এর পিছনে মেডিক্যাল ফিলসফি, কী আছে লুকিয়ে? বিজ্ঞানগত বিচার এই যে—**চামড়া ভেদ করে শোষিত হয় ওষুধ বা উপাদানগুলো। শরীরকে সারিয়ে দেয় সেগুলো—আর, যতকিছু অসুবিধা দূরে সরে পড়ে তখন।**

ওই যে পুরুষ বা নারীর 'পেলভিক-রিজিওনাল্-সেক্সুয়্যাল-অর্গান', সেগুলো বিমর্দ্দিত-বিমথিত হয় রমণের সময়। বিমর্দ্দন আর ওই উদ্দাম বিমথন্ কী, অন্য কথায় মালিশ-ম্যাসাজ নয়? সারারাত ধরে এই যে, যোনীরস-রজঃরস-বীর্য্যরসে উভয়ের ওই প্রত্যঙ্গ-স্নান; সেটাও তো মালিশ। লিঙ্গের সুক্ষ্ম চামড়া ভেদ করে করে, ওই বিচিত্র হর্মোনগুলো ছড়িয়ে পড়ে পুরুষের রক্তের স্রোতে। বিপরীত ভাবে নারীর রক্তস্রোতে-শরীরে-মনে ছড়ায়, সামান্যতম হলেও (যেহেতু, বীর্য্যপাত নিষিদ্ধ) বীর্য্যরস Androgenic Hormone (Testosterone Propionate) যেটা উৎসারিত হয় পুংদণ্ড থেকে পরাগের মতো রমণকালে।

নারীর যোনীর দেওয়ালে, জরায়ুর মুখে যখন, বার বার আঘাত করে পুরুষের লিঙ্গ-মুণ্ড—ওই রস জাতীয় মলম, তখন মালিশ হয়ে যায়। আর তাই—নারী দিনে দিনে, হয়ে উঠে কামময়ী আর কামনাময়ী। সে তখন থাকে না, উসকো-খুসকো ডাইনিপারা, 'পুঁটির-মা' কিম্বা 'পাঁচী-পিসি'। খুশী হয়, আর আমাদের মতো পুরুষকে, খোদার খাসী বানায় নিশুত রাতে তাড়িয়ে-তুড়িয়ে—পৌঁছে দেয়, তুরীয়ানন্দের দোর-গোড়ায়। না হ'লে কিছু কী, করতে পারে এই ম্যাড়ায়!

সমস্ত সাধিকা যদি, সাধককে পৌঁছে দেয় সাধনার শীর্ষে, তবে তারা কী ফেল্‌না থেকে যায়? খেলনা বনে যায় নাকি তারা, সাধু নামক পশুদের কাছে? না তা' নয়! যখন চলে মর্দন-লেহন-চুম্বন-রমণ, তখন নারীও চৌম্বুকত্ব পায়—আপনা থেকেই। কেন না, সেও কিন্তু ওই চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যেই থাকে; ইলেকট্রো-ম্যাগনেটাইজড্ হয়—সাধকে-সাধিকায়, বাউল-বাউলানীতে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীতে তখন আর থাকে না কোন ফারাক। সব একাকার হয়ে সমধর্মী হয়ে উঠে।

বাবা-মা, মাসী-পিসি, দাদু-দিদা, যেমন করে জন্ম দেওয়া শেখায়; ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে—উত্তরাধিকারী পেতে—জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রাখতে; এই মায়েরা, সাধুরা—যাদের সাথে বনে-জঙ্গলে-গিরিগুহায় চরে বেড়াই; ওরাও তাই শিখিয়ে চলে, এই সব গুহ্যপ্রণালী; আগামী সাধক-সাধিকা বানাতে, আর আর্য্য-ঋষির এই বিজ্ঞানকে, বাঁচিয়ে রাখতে পরম্পরাক্রমে; যা'তে আর জন্ম-প্রজন্মের যন্ত্রণায় ভুগতে না হয়। 'সোহম' হবার পথ এটা, শরম পাবার পথ নয়।

পশুকে ধরতে গেলে, পশুর পালের মধ্যে যেমন যেতে হয়—পশুপালকের সাথে যেমন, দর কষাকষি করতে হয়; তেমনি পশুর পথ ধরে, পৌঁছাতে হয় পশুপতি জগৎপিতা শিবের সংসারে। কেননা তারই ল্যাবরেটরী থেকে; 'ল্যাওড়াবাজীর' ফর্মূলাটা বেরিয়েছে। **Patent Right** তারই। তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে গেলে, **Royalty** দিতে হবে বছরের পর বছর; শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা দিয়ে। ঘেন্নায় নিষ্ঠীবন ছুঁড়লে, বৃন্দাবন পাওয়া যায় না, যাওয়াও যায় না!

সবাই বসে গেলাম গোল হয়ে, কারণ পানের উদ্দেশ্যে। বেদবতী মা রামপ্রীত-তোতারাম-লাখনকে বললো, "নীচে যাকে দেখো, কারণ-কী 'ক্রেট' হ্যায়। বো লাও।" দৌড়ালো ওরা তিনজন। আমাদেরকে হোমের কাঠ সাজিয়ে ফেলতে, আদেশ করলে বেদবতী মা। অন্য সব মায়েরা, হোমের জন্য রেখে যাওয়া সামগ্রীগুলো, মাখাতে লাগলো এক জায়গায় করে। ইন্দুমতী মা বললো, "রজঃধারা, কুণ্ডগোলখং নাই। হোমের অঙ্গহানি হবে। এ'তো সাধারণ গৃহস্থের হোম নয়—তান্ত্রিক হোম। সমস্ত নিয়ম মানতে হবে।"

বেদবতী মা বললো, "দেখ্তি হুঁ, উন্লোগোঁকো আনে দো পহলে।" ওরা এলো সিঁড়ি বেয়ে মদের 'ক্রেট' ঘাড়ে করে। সবাইকে বসিয়ে দিয়ে গোল করে, সেই বৃত্তের মধ্যে বসে পড়লো মা বেদবতী। পাশে খুলে রাখতে বললো সকলের কাপড়-চোপড়। সবাই হয়ে গেলাম ল্যাংটা-লেংটী।

আকাশে হাত পাতলো মা। চলে এলো কুন্তীমায়ের সেই, ঢাউস মড়ার খুলির নর-করোটি পাত্র। মদ ঢাললো তা'তে মা। এক এক করে সবাইকে পান করিয়ে, নিজে পান করলো সকলের শেষে। তারপর বললো, "ম্যয় উভর যাউঙ্গী সবকা উপ্পর। এক এক করকে সব লোগ্ চলো, প্যার ফাঁকা করকে খাড়া হো যাও, হবন সামগ্রীকে উপ্যর। পুরুষলোগোঁকী বীর্য্যধারা ঝরেগা উধর। জেনানা-লোগ্ ভী ঐসা করো। রজ্ধারা নিকলেগী হবন সামগ্রীকে উপর। যিসকা কাম হো যায়েগা—বো একঠো লকড়ী লেকে, হবন-সামগ্রী ঘিটো!"

মায়ের নির্দেশ মতো আমরা সবাই দাঁড়ালাম হোমদ্রব্যের উপর। ঝরতে লাগলো আমাদের বীর্য্যধারা তার উপর। ভয়ে লাখনের আর তোতারামের লিঙ্গ কুঁচকে, কোথায় যে পালিয়েছে; তাকে খুঁজতে বেগ পেতে হলো মাকে। শেষে দু'জনের গালে পেল্লায় দুটো চড় লাগিয়ে বললো, "ইৎনা ডরপুক ত্যু-লোগ্। ডর্-মূরছ্ কিঁউ নহী পিছা ছোড়তা? যা' উধর। সন্নতি, ঐন্দ্রিলা— লিঙ্গ চোষণ করো, বো দোনো-কা। কাম্ নহী হোগা তো, দংশন করো। তব্ ভি নহী হোগা তো, উসকা উপ্যর বিপরীত রমণ করো।" চোখ থেকে ঝরছে রাগের আগুণ বেদবতী মার।

দু'জনকে টেনে নিয়ে গিয়ে হোমের সামগ্রীর ধারে, সন্নতি, ঐন্দ্রিলা চুষতে লাগলো ওদের লিঙ্গ। বাঁধনহীন ভাবে ঝরতে লাগলো তাদের বীর্য্যধারা। ওদেরকে আর, বিপরীত-বিহারে রমণ করতে হলো না—চীৎ করে ফেলে দিয়ে—ওদের কোলে বসে বসে।

শাস্ত্রের পদ্ধতি ঃ —

ততো হোমবিধিং বক্ষ্যে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
লতাপুষ্পান্বিতং কৃত্বা পর্ণানাং শতকং সুধীঃ।।
তানি সংমন্ত্র্য বিধিবদসকৃৎ সাধকোত্তমঃ।
ততশ্চ হোময়েত্তানি সংস্কৃতেহগ্নৌ যথাবিধি।
যুগানামযুতং তেন পূজনং জায়তে নরঃ।।
লতাপুষ্পান্বিতমিতি নারীরক্তযুতমিত্যর্থঃ।

তদুক্তং উত্তরতন্ত্রে—
নারীরজোক্ষিতং কৃত্বা পর্ণানাং শতমুত্তমম্।।
অসকৃদিতি শতকং জুহুয়াদিত্যর্থঃ।
অনেন ক্রমযোগেন যশ্চরেদ্ভুবি মানবঃ।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।।
বীরো ভবতি বাগ্মীশঃ সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ।
হুনেদাজ্যেন ভক্তেন মাংসেন রুধিরেণ চ।।
রক্তপুষ্পেণ সাজ্যেন রক্তেন চ বিশেষতঃ।
আমিষাদিভিরপ্যেবং শ্মশানে জুহুয়াৎ সুধীঃ।।
মাংসং রক্তং কেশং নখং ভক্তঞ্চ পায়সম্।
আজাঞ্চৈব বিশেষেণ জুহুয়াৎ সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
এবং কৃতেন সর্ব্বত্র লভতে সিদ্ধিমুত্তমাম্।।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—
মহাচীনক্রমে বীজং লিখিত্বা কুঙ্কুমেন চ।
তৎপার্শ্বে সাধ্যমালিখ্য তাড়য়েদ্দৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
তত্র গচ্ছতি কামার্ত্তা যত্র দেশে স পূজকঃ।। ....শ্যামারহস্যম্

মায়েরাও পা ফাঁক করে দাঁড়ালো, হোমদ্রব্যের উপর। ঝরতে লাগলো রজঃধারা। গুণ্ডুবাবা আর ছ্যাঁছড়াবাবা একটা কাঠি নিয়ে, খুন্তির মতো উল্টে-পাল্টে মেশাতে লাগলো সেগুলো। রামপ্রীতবাবা সকলের মাথার চুল-থুতু-নখের ছিলকে সংগ্রহ করে সেগুলো ঢেলে দিলো তা'তে। সম্পূর্ণ হলো আয়োজন।

সাজানো হোমের কাঠকে ঘিরে সবাই আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাততালি দিতে দিতে বেদবতী-মা বলতে লাগলো ঃ —

"ওঁ অগ্নিম্ ঈলে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্তিজম। হোতারং রত্নধাতমম্।১
অগ্নিঃ পূর্বেভিরিষিভীরীড্যো নূতনৈরূত। সঃ দেবা এহ বক্ষতি।২
অগ্নিনারয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমম্।৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।৪

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ।৫
যদঙ্গ দাশুসে তমগ্নেং ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গির।৬
উপত্বাগ্নে, দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম। নমো ভরন্ত এমসি।৭
রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দিদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে।৮
সঃ নঃ পিতেব সূনবেহেগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।৯"

...........ঋগ্বেদ/১ম মণ্ডল/১ম সূক্ত/১-৯

[হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞের পুরোহিত, আর তুমি দীপ্তিমান। তুমিই দেবগণকে ডেকে আনো। প্রভূত রত্নধারী হে অগ্নি তোমাকে প্রণাম করি। (২) পূর্বজ ঋষিদের তুমি স্তুতিভাজন ছিলে, নূতনদেরও তুমি স্তুতির যোগ্য। তুমি ডেকে আনো সমস্ত দেবতাকে। (৩) তোমার জন্যই যজমান ধনলাভ করে। সেই ধন দিনে দিনে বেড়ে উঠে, আর তা' দিয়েই অনেক শক্তিমানকে পোষণ করা যায়। (৪) তুমি ওই যে যজ্ঞস্থলকে ঘিরে রাখো, সে জন্য কেউ তা বিনষ্ট করতে পারে না। আর আমরা জানি, তাতেই দেবতারা অবশ্যই আপন আপন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে। (৫) হে দেব অগ্নি, তুমি দেবতাদের আহ্বায়ক, সিদ্ধকর্মা, নিয়ত সত্যবাদী। তুমি প্রভূত এবং অনেক গুণের অধিকারী। আমাদের এই যজ্ঞকর্মে দেবতাদের সাথে তুমিও এসো। (৬) হে অগ্নি যজ্ঞকর্ত্তা যজমানের তুমি কল্যান সাধন করো—হে অঙ্গিরা, সে কল্যাণ জানবে তোমারই দান। (৭) হে অগ্নি, প্রতি দিনে-রাতে আমরা তোমার ধ্যান করি মনে মনে। তোমাকে প্রণামও করি। (৮) তুমি, হে অগ্নি, দীপ্যমান। যজ্ঞকে রক্ষা করো তুমিই। অতিদীপ্তি ছড়িয়ে রক্ষা করো আমাদের এই হোমকর্ম। (৯) পুত্রের কাছে পিতার গতায়াত অবাধ। সেই অধিকারে তুমি এসো এ' যজ্ঞস্থলীতে, তুমি এই আমাদের মঙ্গল বিধান করো।] ....(স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)।

মার্কণ্ডেয়-মন্ত্রে হোম ঃ —

মা	:	**ওঁ শুভংকরায় নর্মদা-শংকরায়, তে নমঃ সিদ্ধেশ্বরায়।**
আমরা	:	**ওঁ জুং সঃ স্বাহা।**
মা	:	**ওঁ কর্মপাশ-নাশ নীলকণ্ঠ, তে নমঃ সিদ্ধেশ্বরায়।**
আমরা	:	**ওঁ জুং সঃ স্বাহা।**

মা : ওঁ শর্মদে নর্ম-ভস্মকণ্ঠ নীলকণ্ঠ, তে নমঃ সিদ্ধেশ্বরায়।

আমরা : ওঁ জুং সঃ স্বাহা।

মা : ওঁ সংসার-ঘোর-দুঃখহারিণে নীলকণ্ঠ, তে নমঃ সিদ্ধেশ্বরায়।

আমরা : ওঁ জুং সঃ স্বাহা।

মা : ওঁ অন্তশ্চিন্মাত্রৈক-লিঙ্গরূপ-দেহম্

[illegible]

আমরা ওঁ জুং সঃ স্বাহা।

নর্মদামন্ত্রে হোম ঃ —

মা : ওঁ হ্রাং হ্রোং হ্রুং, হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ নর্মদায়ৈ নমঃ

আমরা : ওঁ হ্রাং, রেবায়ৈ স্বাহা।

মা : ওঁ হ্রাং হ্রোং হ্রুং, হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ নর্মদায়ৈ নমঃ

আমরা : ওঁ হ্রাং, রেবায়ৈ স্বাহা।

মা : ওঁ হ্রাং হ্রোং হ্রুং, হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ নর্মদায়ৈ নমঃ

আমরা : ওঁ হ্রাং, রেবায়ৈ স্বাহা।

মা : ওঁ হ্রাং হ্রোং হ্রুং, হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ নর্মদায়ৈ নমঃ

আমরা : ওঁ হ্রাং রেবায়ৈ স্বাহা।

মা : ওঁ হ্রাং হ্রোং হ্রুং, হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ নর্মদায়ৈ নমঃ

আমরা : ওঁ হ্রাং রেবায়ৈ স্বাহা।

[illegible] ’— এমন কী, দেবতা-ঋষিরাও যে, ওই ব্যাপারে বহু বার হাম্‌লে পড়েছে; সম্পর্কের কোন ‘বালাই’ না-রেখে; ওই ব্যাপারে—আমার তাই ‘এলার্জি’ আছে। সবাইকে আমার মনে হয়েছে—আকাট্ পশু। ‘কুত্তায়-দেবতায়-ঋষিতে’—আমি কোন তফাৎ করতে পারিনি আজও!”

অসম্ভব ক্ষেপে উঠে, কুন্তীমা আমাকে বললো, "তবে শোন্, তোকে কতকগুলো রূঢ়-কথা বলি। সেখানে থেকেই, সব সদ্-উত্তর পাবি—তোর সব **'এলার্জীর-ভূত'** চলে যাবে তখনই।"

(A) 'ক্ষেত্রজ-সন্তান' বলতে বুঝায়—সমাজ-স্বীকৃত পিতা ছাড়া; **'যে-কোন-যোনী'** থেকে, জন্মায় যে সন্তান! তার ঠিকুজী-কুলুজীর, পরিচয়ের দরকার—কখনোই পড়ে না! রামায়ণ মহাভারতের যুগে যা হতো– আজও হয়!

(B) স্বামীর অণ্ডকোষে যদি বীর্য্যাণু (Sparnmatozoa) না জন্মায়, তবে সন্তানার্থে—অন্য কোন পুরুষকে, তার **'শুক্রাণু' ধার দিতে বলা** কী, কোন অপরাধ হয়? প্রশ্ন যখন বড় হয়ে দেখা দেয়—**"সন্তান চাই"**?

(C) যব্ যব্ তেরা ঘরকা, 'ভেড়্-বক্‌রী-গায়' **'চিল্লাওয়া'** করতে, রমণ করনেকে লিয়ে—June-July-August মে; তব্ ত্যু ক্যায়া করতা? খুদ্ হি না যাতা, **fucking 'কর্‌ওয়ানেকে'** লিয়ে; কিসি এক Male Animal-কো দেকে—বো female কো?

(D) যব্ তেরা লাড়্‌লী বেটী, আপনা-যৌবন-জলতরঙ্গমে ভাস্‌তি-রহতি' হ্যায়; ক্যায়া ত্যু কোই এক লড়্‌কাকো নহী ঢুঁড়তা? উসকো **fucking করওয়ানেকে লিয়ে premanently?** জিস্‌কা এ' সামাজিক অর্থ হোতা—**ভাতার-মাগ্**?

(E) রমণ করওয়ানেকে লিয়ে, এ'যো প্রক্রিয়া হ্যায়, ক্যায়া—এ' **'ক্ষেত্রজ্ সন্তান'** বনানেকা, এক সুন্দর ফর্‌মূলা নহী হ্যায়? যিসে সম্মান-সম্ভ্রম্ কর্‌না চাহিয়ে?

(F) 'ছেত্র' কী মৎলব হোতী যোনী! তো ক্যায়া, আপ্ আপ্‌কা মা-কী যোনী ইয়া গাঁড়সে, ইস্ ধরতী-পর উভর্ নহী আয়ে? যব্ আয়ে—য্যায়সা ভী হোকে—উস্‌মে আপ্-কী গাঁড় কিঁউ ফট্ রহা হ্যায়—কিঁউ উস শাস্ত্র পর এলার্জি হ্যায়?

(G) ঋষি-মহাঋষি, তৎকালীন্ রাজা-মহারাজা; ক্যায়া—তেরা বিচারমে—**'চোদ্‌না-চুদ্‌মারাণী'**—ইয়া এক লম্বর **গাণ্ডু** থে? রমণ-কা তরীকা বো-লোগ্ ভুল্ জানতা থা? ক্যায়া এ' তেরা **'প্যায়াস্'** হ্যায় কী— 'কিঁউ বো-লোগ নহী আয়া' তেরা পাশ্—কোই এক **সুঝাওকে** লিয়ে?

(H) তেরা মা-কো, তেরা বাপ্ রমন কিয়া হ্যায়—সঙ্গম কিয়া হ্যায়! উস্‌সে, তেরা দাদা-দিদি, ভাই-বহন্—ফির ভী ত্যু খুদ্ হী, জনম্ লিয়া; উস্ গাঁড়-গুদ্-ল্যাওড়াসে। উস্ সময়-কা তসবীর, চিন্তন্ করকে একবার তো দেখ্—তেরা কোই এবং কুছ্ এলর্জী; আতী হ্যায় কী নহী! নহী আতী হ্যায়, নাহ?

পুত্তর—দুস্‌রে কোই এক কা 'পাপ্পা-ইয়া-আম্মা' 'বেটা-বেটী-বহু', যব রাস্তে পর্ গির্ যাতা, কঁহী এক স্থান্ সে; সব্ লোগ্ এবং ত্যু ভী হস্‌তা। কোই এলর্জী তব্ নহী আতী তুঝ্‌মে! লেকিন্ তেরা ঘর-কী এক মেম্বার, যব ঐসাহী গির্ যা'তে, ক্যায়া ত্যু ঐসা হি হস্ পায়েগা? তেরা এলর্জী, কিঁউ ঐসা হোতা—পুত্তর?

(I) তেরা মাতাকো রমণ করনে-কা হক্, তেরা পিতাজীকা থা; তেরা লড়কী কো ভী, রমণ করনেকা হক হ্যায়, তেরা দামাদ্‌কা। তো বেটা এ' ব্যাপারটা ভাব্ তো একটু যে, ওদের কারুরই বীর্য্যকীট নাই। তবে কী সন্তান/উত্তরাধিকারী পাবে না ওরা? তখনই প্রয়োজন হয়—ক্ষেত্রজ 'সন্তানের-—'অবিধিবদ্ধ-সন্তানের'। সমাজে তখন যে নিয়ম, সাধু-ঋষিরা প্রচলন করেছিলো; আজও আছে তা' সম্যক্ প্রচলিত তোদের এই সমাজে! আরও শুনতে চাস?

(J) রাস্তার একটা বাচ্চাকে পুষলে, তখন কী সে 'ক্ষেত্রজ-সন্তান' হয় না? কারুর না কারুর ক্ষেত্র বা যোনী থেকেই সে বেরিয়েছে? কই তখন তো তোর এলার্জি হয় না? আজও কী তোরা **গর্ভ-ভাড়া** করিস্ না? (ঈশ্বরের দয়ায় **'বাবা'** হয়েছিস তুই, বড় সহজে।) ঈশ্বর যদি তোর কাছে **কৃপণ** হতো, তবে—তুই বা তোর স্ত্রী, **গর্ভভাড়া** করতিস্ বা **Sparm Bank** থেকে **Sparm** নিয়ে বৌ-এর **যোনী বা ক্ষেত্রে** তা বুনে দিতিস। রমণ করা মানে, জীবনকে বহু ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। না হলে, একটাও প্রাণ থাকতো না। **রমণের বিদ্যাটা, ভগবান শংকর, মূর্খের মত তৈরী করেছে নাকি?**

(K) একটা সুস্থ সুন্দর Sparm, আর তার ক্ষেত্র বা যোনী ভাড়া করতে আজ লাগছে, মোটামুটি 5 – 7 লাখ টাকা। বিগত কয়েক মাসের নানা investigation, আবার প্রতিস্থাপনের পরও 9 – 10 মাস ধরে—নানা investigation করতে লাগে, আরও 4 - 5 লাখ টাকা! তা'হলে বিজ্ঞানীরা সব পাগল নাকি?

বিজ্ঞানী মানে ঋষি = Investigator / Researcher। এবং 'সাধু' = যে 'সৎ' থাকে, তার আপন কাজে, মননে-চিন্তনে। 'বাজারী-বক্তৃতা' যে কখনো মারে না! কিছু না বুঝে 'হই-চই' যে করে না। গবেষণাই তার কাছে ভগবান। কই, তাদের তো—কোন রকম এ্যালার্জী নাই! 'মূর্খের-এলার্জী' থাকলে, সামগ্রিক বিশ্ব-বিজ্ঞান কী এতটা এগুতো?

(L) তোকে যখন এ'গুলো 'লিখতে' বলা হয়েছে, তখন জানবি—সমস্ত পদ্ধতি-টা হ'লো, 'পণ্ডিত-মূর্খ'দের ভুল-ভাঙ্গিয়ে দেওয়া—'ভুল-করা' নয়! না—কোন কিছুর উপর তোর এ্যালার্জী, হলো তোর বিরাট এক ভুল। 'এলার্জি' ছেনে 'এনার্জী' নিয়ে এগো'—একদিন না একদিন তুই জানতে পারবি, দেবতারা কেন নিজের মেয়েকে 'রমণ করেছে'; আর তার বিষময় ফলটাই বা কী হয়েছে।

অসম্ভব সুন্দর এক বিজ্ঞান খুঁজে পাবি সেখানে। যখন ডাক্তারী শাস্ত্রের পাঠ নিতিস্, সেই সব বইগুলো আবার ভাল করে পড়িস। আজকের বিজ্ঞানের বইগুলো অন্ততঃ তুই পড়িস। আর পড়িস 'রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-বেদান্ত-পুরাণ। মূর্খের অনুবাদ করা বটতলার বই পড়িস না। যা' পড়বি Original পড়বি। তবেই খুঁজে পাবি, তোর সমস্ত উত্তর। ওই 'মূর্খের-এলার্জি' অবশ্যই পালাবে, 'ঈশ্বরের-এনার্জী' তোর উপর এক-সময় ভর করবে। কিছুদিন পরে হবে, তোর দীর্ঘ-অবসর (Time of Retirement)। সময়কে নষ্ট এতটুকুও করিস না, খরচ করিস ও'গুলোতে সম্যক ডুবে গিয়ে। মনে থাকবে?

(M) এ'টা ভাল করে জানবি, তুই আর তোর বৌ, কেউই সম্পূর্ণ নয়। দু'জনেই better half. তোর লিঙ্গ একটা test tube। আর ওঁর যোনী একটা beaker বা খল্। খলে যেমন নুড়ি দিয়ে ওষুধ মাড়া হয়, পান-সুপারী থেঁতো করা হয়, তেমনি রমণের সময় ওই কাজই হয়—সন্তানকে জন্ম দিতে। খল্ + নুড়ি কী, ঘেন্নার বস্তু? তা'হলে 'লিঙ্গ' আর 'যোনী'র কাজ, কেন হবে ঘেন্নার বস্তু? মানুষের মন থেকে, তোকেই ভুলকে ঝেঁটিয়ে দিতে হবে!"

আমাকে আঘাত : পঞ্চ ম-কার : নাগরূপা বেদবতী-মা

লাজবন্তী লাজহীন হয়ে, ল্যাংটা হয়ে বললো, "দেখো ঋষি, এই আমার উর্দ্ধ-যোনী (ঠোঁট), মধ্য-যোনী (স্তনাভিরেখা); অধঃযোনী (আসল যোনী, যেখান থেকে; তোমার মতো কুত্তার বাচ্চাদের; জন্ম দিই!)! চিন্‌তে পারছো আমাকে? যার যোনীতে লিঙ্গ গলিয়েও, ভীরু সন্তানের মতো তুমি মার আঁচলের আড়াল খুঁজেছিলে? ধিক্ তোমাকে। আমাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে; মার বুকে মুখ গুঁজে দিয়েছিলে সেদিন? আজ তোমার সমস্ত সত্ত্বাটাকে আমি শুষে নেবো। প্রস্তুত হও—'মা' ডাকছে!"

আমার অহমিকায় ঘা দিয়ে, চলে গেল 'লাজবন্তী'। ওইটুকু 12/14 বছরের মেয়ে! এতবড় সাহস—আমাকে কড়কানো? কেন? আমি কী নপুংশক? আজ আর ওকে ছাড়বো না! খাতা-বই-পেন্সিল গুছিয়ে ছুটলাম, মার কাছে। গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, "মা, আজ যদি পঞ্চ-ম-কার করো, তবে আমার অবশ্যই লাজবন্তীকে চাই—সাধন সঙ্গিনী বা সাধিকা হিসাবে। না হ'লে সমস্ত সৃষ্টি ভেঙ্গে পড়লেও—আমি অংশ নেবো না তা'তে! এ'কথা ত্রিসত্য মানবে ঃ— (১) জ্যয় নর্মদা (২) জ্যায় শিবম্‌সুন্দরম্ (৩) জ্যায় মা দুর্গা, বিশ্বার্ত্তিহারিকা!"

ছুটে চললাম একগুচ্ছ ধূপ-দীপ (মোমবাতি) হাতে; পতঞ্জলি গুহায়—শুধু তা'কে বলতে যে, সে যেন স্বয়ং সাহায্য করে আমাকে, ওই নারীকে তৃপ্ত করতে দৃপ্ত-প্রদীপ্ত বীর্য্যস্রোতে! আমি তাঁর বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে' কুর্ণিশ।" পারলে সব সাহায্য দিও, না হলে মৃত্যুকে বেছে নেবো চিরতরে, মূলশুদ্ধ কেটে বা উপড়ে ফেলে!"

জ্বালিয়ে দিলাম ধূপ-দীপ গুহা-মুখে। করজোড়ে বললাম সব কথা, জানালাম সব ব্যথা। পেছন পেছন ছুটে এসেছে মা। লাজবন্তীর কোন হেল্-দোল্ নাই! বুক চিতিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, মার পেছনে! মা দাঁড়িয়ে গুহামুখে। এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী, গুহার ভেতর থেকে এসে, মার পায়ের কাছে তুলোর মতো জড়ো হয়ে; আবার ঢুকে গেলো গুহায়!

তারপরে এক অদৃশ্য হাত যেন সপাটে চড় কষালো আমার দুই গালে! ভালই অনুভব করলাম তা।' কোথায় যে চড় খাবার উত্তর লুকিয়ে আছে, সেটাই জানতে পারলাম না। পতঞ্জলি-গুহার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে—সপাটে চারটে চড় আর লাজবন্তীকে দু'টো চড় সাঁটিয়ে দিয়ে, দু'জনের চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে; নিয়ে চললো ইন্দুমতী মা। সেখানে গিয়ে আবারও চড় খেলাম, কুন্তী আর শ্রদ্ধামার। ঝড়ের মতো চড়-চাপড় চলছে; আমাদের উপর—সম্ভবতঃ বালখিল্যতার জন্য!

ওদের রুদ্রাণীমূর্ত্তি দেখে, সিঁটিয়ে গেছে সমস্ত ঋষিরা, তোতারাম আর লাখন্। ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো মায়েরা তাদের আসনে--আমাদের দু'জনকে—আমি আর লাজবন্তী। সড়াৎ করে গেরুয়া কেড়ে নিয়ে--ল্যাংটা করে দিলো ওরা আমাদেরকে। তারপর পরিবেশিত হ'লো—তুরন্ত গতিতে, সব খাবার ঃ-- মৎস্য (Fish), মাংস (meat), মুদ্রা (Coin), মেয়ে (Teen-ager Girl), মদ (Wine)!

সবাই গোল হয়ে বসে গেলাম মায়ের নির্দেশে। **(১) লাজবন্তী + আমি, (২) বিনতা + ছ্যাঁছড়াবাবা, (৩) সন্নতা + রামপ্রীতবাবা, (৪) ঐন্দ্রিলা + গুণ্ডুবাবা, (৫) তোতারাম + নম্রতা, (৬) লাখন + মধুমতী—এই ভাবে 'জোড়' তৈরী হলো।** খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, ওকে পূজা করবো আমি, জননী ভগবতী হিসাবে। প্রতিটি অঙ্গকে স্পর্শ করে (ন্যাস্) বলতে হবে—**"ওঁ যোনীবর্ত্মমিয়ম্** জগদম্বায়াঃ **কামাখ্যায়াঃ প্রণমাম্যহম্—পূজয়াম্যহঞ্চ পঞ্চ-মকারার্থম্।"** সেও করবে আমার পূজা। প্রতি অঙ্গে স্পর্শ করে বলবে, **"ওঁ লিঙ্গমিমম্ বিশ্বেশ্বরস্য শঙ্করস্য প্রণমাম্যহম্— পূজয়াম্যহঞ্চ পঞ্চ ম-কারার্থম্।"** দুর্গা হয়ে শিব হিসাবে, সে গ্রহণ করবে আমাকে। একই ভাবে আর সবাই তাই করবে। কিন্তু সাধন-সঙ্গিনীদের কোলে বসাবার আগে—ওই চার জননীকে পূজা করতে হবে। ওরা যে চক্রেশ্বরী—জগন্মাতা।

প্রথমে পূজা করতে গেলাম আমি আর লাজবন্তী। প্রথম ফুল পায়ে দেওয়ার পর পরই, বেদবতী মা, বদলে গেল সেই করালী-কালিকায়। সেই কালান্তক নিকষ কালো পঞ্চশীর্ষা-ক্রুরা-ফণিনীকায়! তিন-মাকে পেঁচিয়ে ধরে, তাদের মাথার উপরে 4/5 ফুট লম্বা, 5 ফুট চওড়া ফণা বিস্তার করে; দুলতে লাগলো এমন করে যে—এই বুঝি ছোবল মারবে।

এই 'রূপ' আর 'চেহারা' সম্ভবতঃ, কোন কালেই ওরা দেখেনি! ভয়ে ছিটকে গেল সবাই। ঠকঠক করে কাঁপছে ভয়ে। উলঙ্গ পুরুষ সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, নাই তাদের লিঙ্গের চিহ্নটুকুও। অসম্ভব ভয়ে সেঁদিয়ে গেছে পেটের ভেতর। স্বাভাবিক ভাবে ঝুলে থাকা অণ্ডকোষেরও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

আমার ভয় হয়নি। কারণ মা তার ওই রূপ, একটু আগেই আমাকে দেখিয়েছে নর্মদার পাড়ে, যখন আমি নোট লিখছিলাম; সেখানে নির্জনে বসে। আমি জানি, যে রূপেই সে থাক—সে বেদবতী মা, শংকর কন্যা। 'বুক' এলিয়ে যে দেয়—'মুখ' এলিয়ে দিলে ভয় পাবো কেন?

Command করলো ইন্দুমতী মা, "এক এক করে মহামায়ার জিভ মুখে নিয়ে, একটু করে চুষো। তারপর যে যার আসনে যাও।" তারপর আমরা সবাই তাই করলাম। শরীর ভরে নেমে এলো মা, অসম্ভব উত্তেজনা ছড়িয়ে। বুঁদ হয়ে গেলাম, অজানা এক বিষে।

মনে পড়ছে, স্বপন বলে আমার এক 'বন্ধুর' কথা। হেরোয়িন—মারিযুয়ানা খেয়েও, যখন তার নেশা জমতো না, তখন সে যেতো কলকাতার সার্পেন্টাইন লেন, চীনাবাজার, টিরেট্টি বাজারের অন্ধকার গলিতে। আর 25 টাকায় খেতো, তিনবার Rattle সাপের কামড় জিভে। তারপর বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতো—চীনাদের খান্‌কী পাড়ায়! কতবার যে সে আমাকে, ওই অমৃত চেখে দেখতে বলেছে, তার ইয়ত্বা নাই। জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি হলে নেশা।

যাইনি—টেস্ট্‌ও করিনি। প্রথম কারণ—ভয়। দ্বিতীয় আর মোক্ষম কারণ—টাকা। 25 টাকায় '68/'69 সালে, হোটেলে পুরো একটা মাস, দু'বেলাই পেট ভরে খাওয়া যেতো, ভাত আর ইলিশ মাছ দিয়ে। রুটি খেলে আরও কম লাগত। থাকতাম তখন বেথুন কলেজের পেছনে—হরিঘোষ স্ট্রীটের ফুটপাতে হরিয়ার সাথে। (২য় খণ্ডের 50 ও 53 পৃষ্ঠা পড়ুন)। পেটের ভাত খাওয়ার টাকা নাই, সাপের কামড়ের অমৃত টেস্ট করবো কী করে?

আজ সেই কথাটাই মনে পড়লো। Rattle সাপের ওই কামড়ে, এত

যৌনাবেগও জাগে! সম্ভবতঃ তাই করে দিলো মা। অসম্ভব যৌনাবেগে কেঁপে উঠলাম থর থর করে। কোলে চড়িয়ে নিয়েছি আমরা যে যার সঙ্গিনীকে। চলছে উদ্দাম বিরামহীন রমণ। চেঁচিয়ে উঠলো লাজবন্তী, রাত্রি দু'টোর সময়—"ছেড়ে দাও আমাকে-এ-এ, আমি মরে যাবো-ও-ও"! দরদর করে ঘামছে সে, হেঁচকী উঠছে তার; জ্বরের তাপে পুড়ে যাচ্ছে তার গা!

মানুষেরও লিঙ্গ যে আটকে যায়, নারীর যোনীগর্ভে, এ'শাস্ত্র আমার জানা ছিলো না। Pharmacology—Pharmacognosy পড়ার দিনগুলোতে, New Jalpaiguriতে সেই Pharmacy কলেজে; Compulsory পড়তে হতো Chemistry, Physics, Biology আর Human Anatomy & Physiology. বিলিতি বই পড়তাম আমি। Indian কোন লেখকের লেখা পড়া, আমার ধাতে সহ্য হতো না। সেই সব অমূল্য বিলাতী বই পেতাম কলেজের লাইব্রেরী থেকে।

এ' ইচ্ছাটা চারিয়ে দিয়েছিলেন **স্বামী লোকেশ্বরানন্দ**, আমাদের রক্তে আর মননে—যখন তিনি ছিলেন **নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার!** তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন— **ছাত্রদের উচিৎ, তাদের 'ছাত্রের-গণ্ডী' থেকে বেরিয়ে; 'গবেষকের-গণ্ডীতে' যাবার এক সুন্দর 'ধৃষ্টতা' তৈরী করা; নিজের মধ্যে! কেন না, সেই যে 'একটু-একটু করে খুঁজবার ইচ্ছা'—পরের জীবনে তা'কে বানাবে 'গবেষক' (Researcher), বিজ্ঞানী (Scientist)! কিন্তু তা' সবই হবে—ক্লাসের পড়াশুনো করার পর!**

এতগুলো কথা বলার, একটাই কারণ যে—সেই সব বইয়ের পাতায় কোথাও নাই যে, মানুষের লিঙ্গ, কুকুর-নেকড়ে-চিতা, খরগোস্-গিনিপিগ্-বেড়াল-এর মতো—নারীর যোনীতে আটকে যায় সংগমের সময়! বুঝতে পারলাম না, কেন আটকালো! রাত্রি বারোটার পর থেকে আড়াই ঘন্টা ঘর্ষিত হচ্ছে যে যোনী আর লিঙ্গ, সে তো Biological Rest চাইবে! লাজন্তীও তাই অসহ্য সেই সঙ্গম-সমরে হেরে গিয়ে; প্রাণ বাঁচাতে চেল্লাছে—মুঝে ছোড় দো-ও-ও! ম্যায় মর যাউঙ্গী!"

ঈর্ষা-হিংসা-প্রতিশোধ স্পৃহা, যাইই আমার মনের অন্ধকার কুঠরিতে থাকুক না কেন; তার অসহায় মুখে দেখলাম—আমার পরম আদরের কন্যার ছায়া—আমার জন্মাদাত্রী মা সুরবালার ছায়া; এবং শেষে কালান্তক নাগিনীরূপা—বেদবতী মার ছায়া! সীমাহীন আর অসম্ভব চমকে উঠলাম! আমি কী সত্যি 'শাস্ত্রীয়-রমণ' করছি, আমার সাধিকা লাজবন্তীকে? না, উত্তর পেলাম না! তাই ইচ্ছা করে লিঙ্গ-মুক্ত করতে—হ্যাঁচকা-টান মারলাম। কাজ তো হলোই না, উল্টে এক বিপত্তি বিব্রত করলো—আগুনে ঝলসানো যন্ত্রণা, শুরু হলো লিঙ্গমূলে!

সাধিকা বদল : কুন্তী-মা : আমার উত্তরণ

চলমান আর ক্ষান্তিহীন সেই যন্ত্রণা, পাগল করছে সাধকযূথকে—যৌথভাবে 'ছাগলী-পাঁঠার' যৌথ চীৎকারে—সাধনার ঘুম ভাঙ্গলো মা'র! খুলে দিলো গ্রন্থী দু'জনের! মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রইলো লাজবন্তী। আর তখনই সঙ্গে সঙ্গে নিজের যোনী পেতে দিয়ে কমান্ড করলো—লো, আপনা ল্যাওড়া মেরা গাঁড়মে ঘুসা দো! সঙ্গম্ বন্ধ মৎ কিয়া করো—আভি শুভ্ মুহূর্ত্ত হ্যায়—ঈশ্বর্কো ছুঁনেকা—ঈশ্বর বন্‌নেকা—**Buck up my boy—I'm not thy mother, I'm the helper—the 'Sadhan-Sangini'—the 'Sadhikaa' as thou takest me for! Don't waitest. Place and insert/ejaculate thy Penis in my Vagina and have the Supreme Goal! Buck up my son—don't lookest behind !"**

কোথায় যাবো আমি? কী করবো আমি? মাকে রমণ করবো? বড় দ্বিধায় পড়ে গেলাম! সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হলো—যোনী ফূর্ত্তি লুটবার জন্য নয়, জন্ম নেবার জন্য—সে যারই যোনী হোক! বিশ্বমাতার যোনী বলে না একটু আগে প্রণাম করেছিলি সেই মহামন্ত্রে?

শিব আপন স্ত্রীকে মায়েরই সম্মান দেয়—পড়ে থাকে তার পায়ের তলায়! 'মা'-ই সব, বাবা নিষ্ক্রিয়—**the inactive—the worthless!** পরমপূজ্য বামদেবের সাধনসঙ্গিনী ছিলো—মা তারা, মার্কণ্ডেয়ের সাধনসঙ্গিনী/সাধিকা ছিলো এই বেদবতীমা (নর্মদা)! বুঝলি কিছু? নে—লিঙ্গ স্থাপন কর আমার যোনীতে, লিঙ্গরূপী শংকরকে বগলদাবা করতে—শুভমস্তু!

তাই-ই করলাম, তার নির্দ্দেশে—হারিয়ে গেলাম দু'জনে **বাতাসে**—প্রকৃতিতে, কিছু সময়ের জন্য! উত্তরণ ঘটলো এই **প্রথমবার**, এই এত বছর পরে। এই প্রাকটিস্ চালাতে হবে—আরও অন্ততঃ **15টা বছর**—Success পেতে একান্ত করে! বাবা মা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, মাসী-পিসি, সবাইকে নিয়ে **পঞ্চ ম-কার** করা যায়। [পড়ুন—**তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ, অবধূত প্রসঙ্গে**, অন্যান্য—**কামাখ্যা চ্যাপ্টার**—লেখক **প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়**—Ex-Principal, Indian Govt Art College) আর **স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের বইগুলো**। নিজের বাড়ীর সবাইকে নিয়েও পঞ্চ ম-কার করা যায়, কোন শাস্ত্রীয় বা সামাজিক বাধা নাই! কিন্তু Secrecy maintain করতে হবে—সব সময়।] **সংসারে ফিরে এলে, সংসারের নিয়ম মানতে হবে। তখন আর পঞ্চ ম-কার করার সময়ের সম্পর্ক মনে রাখা চলবে না!**

সবাই তখনো মিলায়নি বাতাসে। অদৃশ্য হয়ে—বুকে জাপটে ধরেছে মা। তার বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে পান করছি অমিয় সুধা। দেখলাম, এক এক করে মিলিয়ে যাচ্ছে (melt in the air) সবাই; লাজবন্তী ছাড়া! অহংকারই তার মূল কারণ! মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে সে, পতঞ্জলি গুহার রাতের মনোরম উঠোনে!

বেদবতী মা, সাপের মুখ দিয়েই বললো, "আভি পুরা পুরা সঙ্গম কর্ লে, বো লৌণ্ডীকো। তেরেকো পাহাড়ী কুত্তা বনা দেতী হুঁ।" ফিরে এলাম মানব শরীরে। ফিরে গেলো কুন্তীমা মানবীর শরীরে—বেদবতীমার কাছে। আমিই শুধু রামপ্রীতবাবার মতো পাহাড়ী-কুত্তা হয়ে গেলাম—শুধু লাজবন্তীকে হুঁশে ফিরিয়ে আনতে! না হলে, Deep fit তার পক্ষে fatal হবে। কুকুরের ক্লান্তিহীন রমণই পারে, তার গভীর ঘুম বা মূর্চ্ছায় ফাটল ধরাতে!

চীৎ হয়ে শুয়ে আছে পাথরের উপর সে। মাথাটা তার ঝুলে পড়েছে নীচে। উন্মাদ করা কিশোরীর ঘন-পীনদ্ধ বুক; এলায়িত রক্তপদ্মের মতো তার যোনীকন্দর। কুকুর শরীর হলেও—মানবিক সব গুণ আছে আমার। বললাম, "ময়ি প্রসীদ জগজ্জননী।"--তিনবার! তারপর কুকুরের দীর্ঘ-লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার যোনীবর্ত্মে, চোষণ করতে লাগলাম তার উত্তুঙ্গ স্তনাভিরেখা।


তক্ষক সাপ

আস্তে আস্তে জেগে উঠলো সে আড়মোড়া ভেঙ্গে। আয়ত চোখ মেলে বড় বিনীতা হয়ে বললো, "ছমা কিজিয়ে ঋষি, অহংকার মুঝে ডুবায়া! সাথ নহী দেনেকা কসুর মেরা হি হ্যায়! ম্যায় আপ্‌কা আভারী হুঁ। মেরী এ' প্রণাম আপলোগ্ স্বীকার করেঁ! এ্যায়সী গল্‌তি আউর কভী নহী হোগা!"

মা ফিরে এসেছে 'মা'-তে! কালসর্পিনীর করালমূর্ত্তি, নাই তার এখন। বরাভয় মুদ্রায় হাত উঠিয়ে বললো, "যে যার সাধনসঙ্গিনীকে নিয়ে; বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে পড়ো। আমিই ডেকে দেবো সকলকে!" সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম, তরতাজা একটা করে সাধিকাকে নিয়ে। চারজন মা বসে রইলো ধ্যানের আসনে! ওদের কী কোন ক্লান্তি নাই? সত্যি বটে—আরাম হারাম হ্যায়!

বেলা তখন সাতটা-আটটা হবে। মা ডেকে তুললো সকলকে। নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমি আর কুকুর নই—একান্ত নিরীহ এক মানুষ হয়ে গেছি! যদিও জানি আমি = রাস্তার এক লেড়ীকুত্তা।

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

শিল্পাচার্য, তন্ত্রযোগাচার্য প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুভবে



তান্ত্রিক সাধনার উপযোগিতা :

মহাযোগী শিব আর্য্য মণ্ডলের প্রধান দেবতাদের অন্যতম বলে, স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন, সকলের কাছ থেকে, সাধনা এবং শক্তির জোরে। তিনি নিজে আর্য্যগোষ্ঠীর দেবতা হলেও, তাঁর মেজাজ-রুচি-ক্ষমতা, সবই ছিল **অনার্য্য** সুলভ। দক্ষযজ্ঞের সেই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড, প্রজাপতি দক্ষের মাথা ছেঁটে দেওয়া, শ্মশানে-মশানে শুয়ে থাকা, মড়া-খাওয়া, মড়ার ছাই গায়ে মাখা, মড়ার হাড়ের মালা গলায়-হাতে পরা, গাঁজা-ভাঙ্গ-মদ খাওয়া; সবই তার ছিল উল্টো-পথের। আর তাঁর প্রভাবও ছিল—অপ্রতিরোধ্য সমস্ত ব্যাপারে। এতৎ সত্ত্বেও তিনি প্রচলন করেছিলেন—**তন্ত্র সাধনার** গুঢ় নিয়মাবলী।

তন্ত্রধর্ম বলতে এই কথাটাই বুঝতে হবে যে, শিবের প্রদর্শিত পথে **শক্তির উপাসনা** করা। যোগের জগৎ থেকে বহুদূরে গিয়ে, **যোগমুক্ত** সাধনা করা। আর্য্য সমাজে প্রবেশাধিকার সকলের ছিল না, এবং সকলের সেমত শুদ্ধ যোগ্যতাও ছিল না। কিন্তু শিব প্রচারিত তন্ত্রধর্মে, আর্য্য-অনার্য্য, সাধারণ মানুষ—সকলেরই **অনর্গল প্রবেশাধিকার** ছিল। তাই এই ধর্ম রূপ নিয়েছে **সর্বজনীন** ধর্মে, যা সব দেশে সব সময় সব অবস্থায় মানুষের সমাজের কাছে উপযোগী। আপন স্বকীয়তায়, এই ধর্ম তাই সারা ভারতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, আর্য্য ধর্মের প্রাবল্য সত্ত্বেও।

তন্ত্রধর্ম যেন বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে, এক **তীব্র প্রতিবাদ** হয়ে দাঁড়ালো। আর গ্রহণীয়ও হয়ে উঠলো দিনে দিনে। কারণটা আর কিছুই নয়—শুধু বিধি-নিষেধ আর জাতের কড়াকড়ির জন্য। বৈদিক আর্য্যধর্মে **ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য** ছাড়া অন্য কারুর প্রবেশাধিকার **ছিল না। মেয়েদেরকে** বেদপাঠ করতে দেওয়াও হতো না। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের চারিদিকে তৈরী করা হয়েছিল, দুর্ভেদ্য **নিষেধের বেড়াজাল**। আর এই সময়েই শিব প্রচলন করেছিলেন, তাঁর তন্ত্র-ধর্মের—সেখানে সকলের জন্য ছিল **অবারিত দ্বার**!

শিব বলতেন, জাত মাত্র দু'টো। একটা **পুরুষ**, আর অন্যটা **নারী**। অন্য কোন রকম জাত বিচারকে, তিনি মানতেন না। তন্ত্র-ধর্মে সাধনার জন্য লাগে, **সুস্থ-সবল-নীরোগ শরীর-মন, যৌবনের উচ্ছল উদ্যম। পুরুষ আর নারীর যৌবনকালই—তাদের তন্ত্র সাধনার সিদ্ধির উৎকৃষ্ট কাল! দুর্বল শরীর, বৃদ্ধ-রোগগ্রস্থ মন, সাধনার অনুকূল নয়।**

শিবের বিচারে, মেথর-চামার-ব্রাহ্মণ-শূদ্র-ক্ষত্রিয়, সবারই জাত হলো

একটাই; আর তা' হলো পুরুষ জাত। জাতের নামে বজ্জাতি না করে, জাতের কথা ভুলে, সবাইকে **বসাতে হবে একই পংক্তিতে**। জাতের উঁচু আর নীচু এই বিভাজন, মানুষের **দম্ভ আর অহংকারের** কথাই বলে। জাত বিচার একমাত্র পশু-পাখী-উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গের বেলায়ই চলতে পারে, অন্য কোন ব্যাপারে তা' করা ঠিক নয়।

তন্ত্রধর্মে এ' কথাই বলা হয়েছে যে, জীব মাত্রেই **মুক্তি বা মোক্ষের** অধিকারী। সেখানে নারী আর পুরুষের অধিকারের, তারতম্যের কথা বলা হয়নি; যেহেতু সকলের **অধিকার সমান**। একলা একজন নারী বা একলা একটা পুরুষ হলো—**আধখানা** এক সত্ত্বা, আর তা' হলো **অসম্পূর্ণ** বা incomplete। যখন দেখা যায় যে—একজন নারী আর একজন **পুরুষ**, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, প্রণয় বা ভালবাসা তৈরী হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে যে; **দুই আধখানা সত্ত্বা—এক বা সম্পূর্ণ হতে চাইছে**; যারা কিনা **সৃষ্টিশক্তিতে সক্ষম** আর ভরপুর।

সন্ন্যাসীর ধর্ম হলো—সব কিছু একা একা করা। আর গৃহীর ধর্ম হলো নারী আর **পুরুষের যৌথ** কর্মপ্রচেষ্টা, সংসার পরিচালনায়। একলা একলা কাজ করা, সংসার নির্বাহ করা, বড়ই অস্বাভাবিক। নারী পুরুষের **মিলিত জীবনই**—তন্ত্রসাধনার উপযুক্ত। ফলতঃ তাদের **প্রথম** প্রবৃত্তিই হলো **জীব সৃষ্টি করা** বা সন্তানের জন্ম দেওয়া। এই করতে গিয়ে, সে প্রকারান্তরে শক্তি লাভ করে—তার অজান্তেই। তারা কর্ম করে, ভোগ করে আবার উপভোগও করে। আর **তন্ত্রধর্মানুসারী** হলে—আত্মজ্ঞান লাভ করে, এবং তার **মুক্তির পথ** খুলে যায়।

কী ভাবে ঘটে সে সব? **প্রকৃতিকে ধরে সাধনা** করলেই, সেই সব ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তন্ত্রমতের সাধনা—**প্রকৃতিকে জয় করার সাধনা** বা তার সাথে মিশে যাবার সাধনা। **ভোগ-উপভোগ দুইই হয়**, পরিশেষে আর্শীবাদ স্বরূপ মুক্তি বা মোক্ষও মেলে। কর্মপ্রবৃত্তিই কিছু কিছু জটিলতার জন্ম দেয় বটে, তবে ঠিক পথে গেলে তবেই তা' উর্দ্ধগতি দান করে। নচেৎ অধোগতি হয়—বা অন্য কথায় বলতে গেলে হয় **তন্ত্রভ্রষ্ট**! অতএব খুবই **সংযত হয়ে, ভোগের সঙ্গেই সাধনাকে জুড়ে নিতে হয়**। ফলতঃ মুক্তি বা নিবৃত্তি ঘটে!

জীবকে হতে হবে 'সচ্চিদানন্দময়ঃ শিবঃ। আর তা' হতে গেলে, যত রকম ক্ষুদ্র বা বৃহৎ **স্বার্থবুদ্ধি** এবং অনুভূতি আছে, তা' ত্যাগ করতে হবে। তবেই আসবে **নিবৃত্তি—দুঃখময় কর্ম** থেকে, বার বার জন্ম-জরা-মৃত্যু থেকে! এই নিবৃত্তিই ধীরে ধীরে জীবকে শিবত্বের পথে নিয়ে যায়। তখন সে **প্রকৃতিকে জয় করে ফেলে**, মিশে যায় তার সাথে, অথবা তারও উপরে উঠে যায়—সাধনার মহৎ পূণ্যে!

এবারে আমাদেরকে জানতে হবে—প্রকৃতি আর পুরুষ কি? সাংখ্য দর্শনের

মতে, প্রকৃতি সক্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হলো inactive বা নিষ্ক্রিয়। তন্ত্রধর্মও বলছে—আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বয়ং, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সংঘটয়িত্রী, এবং চতুর্বর্গ ফলের দাত্রী। অন্য কারুরই সেই শক্তিই নাই, যে কিনা বেঁটে দিতে পারে, মুক্তি জীবকে। বৈদিক পুরুষ দেবতার উপাসনা বা আরাধনা, প্রকৃতি বা শক্তির উপাসনার নামান্তর মাত্র।

বেদের দেবতারা যেমন—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্য, এঁরা সবাই পুরুষ পদবাচ্য। এই পুরুষ কথাটায় কিছুটা ধোঁয়াটে ভাব আছে। অর্থাৎ মানেটা নির্বিশেষে পরিষ্কার নয়। কেন নয়? কারণটা হলো এই যে—ব্রহ্ম, ভগবান বা পরমাত্মা যাঁকেই ভগবান শব্দে অভিহিত করি না কেন; ওই অপার্থিব জীবপুরুষ—আপন সত্ত্বায় এক হলেও, গুণে বা ব্যবহারে তিনি মোটেই কিন্তু এক নন। যদিও মানুষেরা মনে করে যে—নারী আর পুরুষ, প্রকৃতিরই দুই ভিন্ন শাখা। অর্থাৎ শাখাশুদ্ধ গোটাটাই হলো প্রকৃতি।

ব্রহ্ম বা পুরুষ যেমন মানুষের ধারণার বাইরে, তেমনি আদ্যাশক্তি মহামায়া বা মহাশক্তি কিন্তু জীবেরও ধারণার অতীত। আসলে এরা মূল প্রকৃতির অন্তর্গত, এক একটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থিত শক্তিমাত্র। যতই তর্ক-বির্তক বা বিতণ্ডা হোক না কেন, আলাদা কোন উত্তর মিলবে না। এই বিশাল-বিপুল সৃষ্টি, মূলা প্রকৃতিরই অংশমাত্র।

বৈদিক দেবতাদের ধ্যান-উপাসনা, মূলতঃ প্রকৃতির বা মহাশক্তিরই ধ্যান উপাসনা—এই কথাটা শিবই প্রথম বুঝেছিলেন। মূলা প্রকৃতিকেই দেবতারা জগদম্বা বা বিশ্বজননী বলে স্তব করতেন। তাই শিব জীবকে, তারই উপাসনা বা অর্চনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বেদের দেবতাদেরকে ধ্যান-মনন করতে শিব বলেননি।

আসল প্রকৃতি, যিনি সৃষ্টির মর্মমূলে থেকে— বিরাট জগতকে প্রসব, রক্ষা এবং পরিবর্তিত করছেন তাঁকে, আর তিনি একমাত্র পুরুষ—যিনি প্রকৃতিরও অতীত, অব্যয়, চেতনা বা পরমাত্মা—এই দু'য়েরই স্বরূপ যে কী, তা নির্দ্ধারণে আমরা চির-বঞ্চিত। আমাদের মধ্যে এই যে নারী আর পুরুষ বোধ, এটা একটা জটিল এবং মিশ্র ধারনা মাত্র।

শিব এটাই প্রচার করেছিলেন যে—মূল প্রকৃতিকে জানতে পারলে, মানুষের মুক্তি ঘটবে, অথবা বলা যেতে পারে যে—পুরুষ-অবস্থা-প্রাপ্তি হবে, সাধনার অন্তে। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই, মানুষকে সাধনার দ্বারা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে হবে। কেননা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বলেই, মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে ধরা সহজ। তন্ত্রশাস্ত্রও কিন্তু, এই রকমের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনকে—অপূর্ব সমর্থন করে।

তন্ত্রের বিবর্তনবাদ শুধুই মূর্খের বাদানুবাদ নয়, বরং একটি অত্যন্ত জীবন্ত সত্যও বটে! আমরা যারা মনে করি যে, নিম্নস্তরের মানুষেরা—যাদের বোধ আর বুদ্ধির বিকাশ হয়নি—তারা শুধু গতর খাটিয়েই খায়; সেই রকম মনে করাটা বড় একপেশে, মোটা আর কর্কশও বটে! আমাদের মধ্যে হাজার রকম জাত আছে, **ক্রমবিকাশের পথেই তার উন্নয়ন হবে।**

একজন চাষাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, কাওরা-বাগ্দী-মেথর-ভাঙ্গীরাই নীচুজাত। সে নিজে যদিও শ্রমজীবি, তবুও বলবে সে ছোট বা নীচুজাত নয়! নিম্নস্তরের মানুষই হলো—শ্রমজীবী শ্রেণীর। শহরের শ্রমজীবীরা অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর। কিন্তু কোন কথাটা ঠিক? তর্ক-খেউড় যাই হোক না কেন, ক্রমান্বয়ে পশুত্ব থেকে জীবের মুক্তি ঘটা সম্ভব, তন্ত্রধর্ম সাধনার মধ্য দিয়ে। কেননা দেহটাই সব—এ ধারণা নিম্ন স্তরের জীবের মধ্যেই থাকে, 'আমি' বলতে এরা দেহটাকেই বুঝে, অন্য কিছু বুঝতে চায় না। ফলতঃ সে **পশুর স্তরেই থেকে যায়।** শিব তার তন্ত্রধর্মে, **এদেরই ক্রমবিকাশের কথা** এবং **পদ্ধতির** কথা বলেছেন—**সম্ভোগ** আর **তন্ত্রযোগের** মাধ্যমে।

পরমগুরু শিব এটা জানতেন যে—আর্য্যঋষিদের যা' কিছু দেবতাবাদ, শেষ পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাইই হলো—প্রকৃতিবাদ। এ যেন নূতন মদকে পুরাতন বোতলে রাখার চটুল কাহিনীর মতোই। বুদ্ধিমান মানুষের মন আর বোধ, যতদূরই যাক না কেন, বাস্তব ছাড়িয়ে তার কল্পনার বিস্তার যতই হোক না কেন, প্রকৃতিকে ছাপিয়ে যাবার কোন পথই তার কাছে খোলা নাই। পরমা প্রকৃতি চরাচর বিশ্বের মা-ও বটে, বাবা-ও বটে। প্রকৃতিজাত জীব অতএব, প্রকৃতিকে অস্বীকার করতেই পারে না। বরং প্রকৃতিতে মিশে যাওয়াটাই তার স্বাভাবিক ধর্ম হতে পারে।

মিশতে গেলে তো, দরজার চাবিকাঠি দরকার! শিবই তার তন্ত্রধর্মের মধ্য দিয়ে, সুলুক-সন্ধান দিয়ে দিয়েছেন, একেবারে সেই **প্রকৃতিকে ধরবার** রাস্তার। যাতে করে রকেটের মত প্রকৃতির মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে, চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ ঘটে। **প্রকৃতিই তখন সাধকের হাতে—চাবির গোছাটাই ধরিয়ে দেয়। পশুপাশ থেকে জীবের তখন মুক্তি ঘটে।**

প্রকৃতির স্বরূপকে বুঝতে গেলে, স্বামী বিবেকানন্দের 'মৃত্যুরূপা কালী' কবিতাটাই যথেষ্ট। অনুভূতির চরম পর্যায়ে না গেলে—এ জিনিস তাঁর লেখনীতে বেরোতো না। এটা ছিল তাঁর উপলব্ধ সত্য। বৈষ্ণব ধর্মের কেষ্ট-বিষ্টুরা এতে খচে যেতেই পারেন। যে পরম পুরুষ কৃষ্ণকে নিয়ে তাঁদের এত বড়াই; তাঁকে বুঝতে গেলে আগে বুঝে নিতে হয় **কালী বা প্রকৃতিকে।** কেননা, শ্রীরাধাই সেই **প্রকৃতি-মহামায়া,** যাঁকে আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরণ ঘটেছে **পুরুষোত্তমে।** তাই **কালীকে**

না বুঝলে, বনমালীকে ধরা বা বুঝা যায় না। এই সব কথা চরম উপলব্ধির, শ্রেণীগত খেউড়ের নয়।

মহাঋষি কপিল ছিলেন শিবভক্ত বা শৈব। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি তত্ত্ব হলো শিবেরই তন্ত্রের ফসল। তাঁদের মতে কৃষ্ণ প্রকৃতিই থেকে যান, যদি না আমরা আদ্যাশক্তিকে বুঝতে পারি। সমস্ত সাধনাই তখন নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ায়—কোন কাজের কাজ হয় না! জগতের রহস্য এবং আত্ম-চৈতন্য তখন ধোঁয়াটে ঠেকে। শিব আবিস্কৃত তন্ত্রধর্মের, এই সম্প্রচার আর প্রসারণ, তাই তাঁকে স্থান দিয়েছে—জগৎগুরুর সুউচ্চ বিন্দুতে!

শিব তাই প্রকৃতির অনুগামী হয়েই, তন্ত্রমতে সাধনপথে চলতে বলেছেন—যা' হলো সর্বজনীন এবং সহজ পথ। সাংখ্য আর বেদান্ত দর্শনে ভাল করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে—কেমন করে প্রকৃতির মধ্যে এই পঞ্চীকরণ (assimilation) হয়েছিল, আর তার ফলেই জীব-জগতের বিচিত্র প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হলো—প্রকৃতিরই তিন কৌণিক বিন্দু; যার একটিকে ধ্যান করলে, সবটিকেই আরাধনা করা হয়। গাছের ডালই একটা গোটা গাছের অস্তিত্বের নির্দেশ দেয়, আর ধরে উজিয়ে গেলে, গাছের গোড়ায় আর তারপরে তার শেকড়েও যাওয়া সম্ভব। ওই গোড়া বা শেকড়েই—আদিভূতা মহামায়া বাস করেন এবং ডাল-ফল-ফুল তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রকাশ মাত্র।

তন্ত্রের অনুশীলন ছাগল-ম্যাড়া-গোরুরা করে না, করে মানুষ পদবাচ্য জীবেরা। মোটা-বুদ্ধির মানুষকে দিয়েই তার যাত্রারম্ভ—গোটা মানুষকে পাবার জন্য, যে সত্যিকারে ফুটে উঠবে আপন প্রভায়—সাধনায় সিদ্ধি পেলে। জন্মাবার সাথে সাথে কেউ রবিঠাকুর-সেক্সপীয়ার বা আইনস্টাইন হয়ে যায় না। ক্রমানুশীলনই, ওদের ভেতরের বোধসত্ত্বাকে জাগিয়ে দিয়েছে। জীবনের শুরুতে বুদ্ধিটা ওদের বা সকলের মোটাই থাকে। শিব তাঁর তন্ত্রে দেখিয়েছেন, জীব প্রথম অবস্থাতে থাকে পশুধর্মী। সাধন পথে চলতে চলতে সে বীর পদবাচ্য হয়; কেননা প্রকৃতি তাকে বরণ করে নেয় বলে। এবার যখন সেই সীমাটুকুও সে, পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়; তখন তাকে ছাপ মেরে দেওয়া হয় দেবতার বা উন্নত এক প্রজাতির; ঈশ্বরত্বে কিন্তু তখনও তার উত্তরণ ঘটে না। ঈশ্বরত্বে উত্তরণ ঘটাতে হলে প্রকৃতিকে জয় বা কীলিত করতে হবে। আর পুরুষের কাছে সেই প্রকৃতিই, দেখা দেবে কালী বা রাধা হয়ে।

অতএব হাজার দেবতার উপাসনা না করে, প্রকৃতির সাধনা করলে সেইই সাধক-সাধিকাকে দেবত্বে প্রমোশন দেয়। মানুষ তখনই সার্থক হয়, যখন তার পশু-মানসিকতার শিবত্বে উৎসারণ ঘটে, জন্মলব্ধ পশুত্বকে ঝেঁটিয়ে দিয়ে। জীব বর্ম্মোব

নাপরঃ—বেদান্তের এই মূল সুরের সাথে সাথে সুর মিলিয়েছে তন্ত্রশাস্ত্র। তার কথা হলো—জীবঃ শিবৈব! শিবকে কেউ আমরা দেখিনি, বা ওই রকম **উত্তরণ** আজও আমাদের ঘটেনি। যদি বিতর্ক ধোঁয়া পাকায়; তবে কার উদাহরণ টানা যাবে?

বেদান্তধর্মে বলেছে—জন্মনা জায়তে শূদ্র, সংস্কারে দ্বিজ। অর্থাৎ জন্মালেই জীব ব্রাহ্মণ হয়ে যায় না। ক্রমান্বয় সংস্কারে তার **উত্তরণ** ঘটে দ্বিজত্বে। এই দ্বিজই যখন সেই পরমা প্রকৃতি বা ব্রহ্মকে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যায়, তখন সে খুঁজে পায় সেই মহাশক্তিকে। তার সাথে তার সাযুজ্য ঘটে, অথবা বলতে পারি সে সবিশেষ জেনে ফেলে তাকে। আর তাই বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ তিনি, যিনি ব্রহ্মকে জেনে ফেলেছেন। বামুন বাড়ীতে জন্মালেই, ব্রাহ্মণ হয় না—পশুত্বে ঘেরা এক শূদ্রই থাকে সে; যতক্ষণ তার জ্ঞানের সংস্কার হচ্ছে। ডাক্তারের ঔরসে জন্মালেই কেউ ডাক্তার হয় না, ডাক্তারীবিদ্যা পড়ে তবেই ডাক্তার হয়!

সমস্ত বৈদান্তিক পদবাচ্য বড় বড় ঋষিরা প্রায়ই শৈব ছিলেন। যুগপুরুষ **শংকরাচার্য্যের** নামটা প্রথমেই মনে পড়ে। তিনি একাধারে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব, অন্যধারে **যুগাবতারও**! এখন দেখতে হবে তন্ত্রের নিয়মানুগ পথটি কী রকম। তন্ত্র বলে জীব মানেই পশু। তাই তার আচার-আচরণ সবই পশুর। অতএব **পশ্বাচারের ভেতর দিয়েই**, সাধনায় এগোতে হবে। সেজন্য চাই একটা মেয়ে। মেয়ে ছাড়া পুরুষ পশুর মন উঠে না। শুধু ঘাস-খড়-জল দিলেই সে সন্তুষ্ট হবে না। গোটা ব্যাপারটার **অর্ধেকটা যদি পুরুষ** হয়, তবে বাকী অর্দ্ধেকটা **অবশ্যই নারী হবে**। আর ওই নারীই হলো—পুরুষের **আধারশক্তি স্বরূপা**। আধখানা ঈশ্বর দিয়ে গোটা **সৃষ্টির ভূমিকে, কর্ষণ করা যায় না!**

সমস্ত কর্ম জগৎ বা সৃষ্টির জগতের দিকে তাকালে দেখা যায়, সব কিছুরই একটি করে পরিপূরক আছে। একটা কানের পরিপূরক আর একটা কান। চোখ, পা, হাত সবই কিন্তু দু'টো। সৃষ্টির জন্য **'জোড়া'** দরকার। একজন পুরুষ আর একজন নারী, দু'জন প্রেমে মিলিত হলে, তাদের মনে আর প্রাণে—এক গোটা প্রক্রিয়ার অনুভব আসে, আর শুরু হয়ে যায় **সৃষ্টির সুচারু সংঘটন**! আর তখনই লাগে—মদ, মাংস, মাছ, মুদ্রা আর মৈথুন, উপকরণ হিসাবে।

নাক সিঁটকানো, মুখ বিকৃতি, থাকতে পারে অনেকের এই ব্যাপারে; তবে তাদের কথা আমাদের আলোচ্য নয়। সভ্য বলে দাবী করা, পঞ্চ-ম-কারের বিকৃত ব্যাখ্যা করা, এগুলো চটুল ব্যবহারিক দিক। **মুরগী বা পাঁঠার ঠ্যাং-এর কষা কষা মাংসের স্বাদ-গন্ধ যতই তৃপ্তি দিক না কেন, তার উল্টো পিঠে থাকে**

কষাইয়ের সুকঠিন ক্রুরতা, খাদকের লোভ-লালসা; আর মৃতপ্রাণীর মৃত্যুভয়—অসহায়তা আর কান্না।

এই দিকটা আমরা ভেবে দেখি না। ইচ্ছে করেই দেখি না, কারণ ওটা আমাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। ওসব ভাবতে গেলে—আমাদের **অস্তিত্ব বিপন্ন** হবে। সুসভ্য রুচিশীল সমাজ তখন কেৎরে পড়বে, কাৎলা মাছের মতো। শরীরের কদর্য্য অংশ বলে যে অংশগুলোকে ঢেকে রাখি অতি সঙ্গোপনে, সেখানেই 'রুচিশীল-সত্ত্বা' আমাদের মন আর চোখটা, পিপাসিত হয় দেখবার জন্য? কেন এই দ্বিচারিতা? একটা ছেলে-মেয়ে পেতে কী এই সুসভ্য সমাজ, তাদেব বৌদের কাছে গিয়ে—নোংরা-লজ্জাজনক জায়গাগুলোর কর্ষণ-মর্দন করে না? **পাঁক থেকেই পদ্ম ফুটে। তাই পাঁককে অস্বীকার করা মুর্খতার নামান্তর মাত্র।**

পঞ্চ ম-কারে সিদ্ধ সাধক-সাধিকা, মড়া কাটা, লাশ-কাটা ডাক্তার, বোমা বানানো বিজ্ঞানী, আব অস্ত্র বানানো ইঞ্জিনিয়ার; সবাইকে তবে ঘৃণা করে—সভ্য সমাজ থেকে বের করে দেওয়া উচিৎ। অথচ ওইসব গোষ্ঠীর মানুষের কাছেই আশ্রয় চায়, নপুংশক-মেকী রুচিশীল সমাজ, আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। এ'লজ্জা রাখা যায় কোথায়? প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই আছে পঞ্চ 'ম-কার'।

পশ্বাচারের সাধনার সিদ্ধির জন্য, শুধু যে প্রাচীনকালেই ওই সব লোভনীয় বস্তুর দরকার হতো তাই নয়, ধর্মসাধনের উদ্দেশ্যে **আজও আছে এর উপযোগিতা।** বর্তমান নপুংশক সমাজের জানা উচিৎ যে—গবেষণাগারে গবেষণার ফর্মূলা অনুসারেই কাজ হয়—বাইরে থেকে তার টের পাওয়া যায় না। গরু-মানুষ, নারী-পুরুষের রক্তে-বীর্য্যে-দেহরসে, অধিকাংশ ওষুধ তৈরী হয়। তবে কী রুচিশীল সমাজ তার শুচিবায়ুতা নিয়ে, সেই ওষুধ পরিত্যাগ করবে? বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কয় জন মানুষকে, এই গোটা দুনিয়ায় পাওয়া যাবে?

যারা তা নয়, তাদেরকে ইতর বা পশু বললে ভুল হবে কী? আর যথার্থ দেবত্বে তাদের পৌঁছে দিতে গিয়ে যদি, তন্ত্রোক্ত পন্থার পঞ্চ ম-কারের প্রয়োজন হয়; তবে কী সেটা ভুল হবে? বিশেষতঃ পশ্বাচার ছাড়া যখন পশুর **উত্তরণ** সম্ভব নয়? শিক্ষিত (?) অর্ধ শিক্ষিত (দরকচা মারা), মুর্খ—তাদের ওই সবের প্রতি সীমাহীন পশু আসক্তি দেখেই বুঝা যায়, তন্ত্র সাধনের পথে নিয়ে যাওয়া কতটা জরুরী, ওই আসক্তি ছেঁটে ফেলতে। আর যদি সেক্ষেত্রে তন্ত্রকেই বেছে নেওয়া হয়, সিলেবাস হিসাবে, তবে ভুল কোথায়—অরুচিকর কোথায়?

কলাবিদ্যার ছাত্রকে যেমন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স শেখাতে চাওয়া মূর্খতা হবে, তেমনি তন্ত্রের পাঠ নেওয়া যার দরকার—তাকে 'যোগে' টেনে নিয়ে যাওয়াটা, **'ভোগে'**

(গোল্লায়) পাঠিয়ে দেওয়ার নামান্তর। বরং একথাই বলা যায় যে, তন্ত্র-সাধনার পথেই তাদের **উচ্ছৃঙ্খল ভোগের 'নিবৃত্তি'** হবে, এবং তা' **প্রকৃতিরই নিয়মানুগ** হবে।

পঞ্চ ম-কারের উপাদানের প্রতি আসক্ত জীব, একথাই প্রমাণ করে যে—প্রাকৃতিক নিয়মেই, আজও এই সাধনার প্রয়োজন এবং উপযোগিতা দুইই আছে। যদি কিছু ত্রুটি থাকে, সেটা সরিয়ে ফেললেই, দেখা যাবে—এই ধর্ম কত উদার আর মহৎ। সমস্ত মানব জাতির কাছে কতটা উপযোগী। প্রবর্তক শিবই অনেকখানি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যাঁর কল্যাণময় ধর্মের আশ্রয় থেকে কেউ কোনদিন বঞ্চিত হবে না।

এ কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে—শুধু ভোগ প্রবৃত্তিটা যাদের উৎকট রকমের, পাঁড়-মাতাল বা ভাঁড়-মাতাল প্রকৃতির যারা, মদ-মাংস-রেণ্ডী নিয়ে সব সময় ব্যস্ত যারা; তাদের স্থান নাই, তন্ত্রের জগতে। পঞ্চ ম-কারের মূল সুর আর বিধিগুলি বড়ই সুন্দর ছন্দোবদ্ধ, এবং উচ্ছৃঙ্খলতার কোন জায়গা নাই সেখানে। **সমস্ত কিছুতে সংযমই হলো শেষ কথা।**

প্রকৃতির মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। সবই সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত। অতি পণ্ডিতির জন্য আমরা, বেশী বেশী বুঝে ফেলেছি। তন্ত্রের অনুশীলন যথাযথ হ'লে, সাধক-সাধিকাদের মধ্যে এক রকম সৎ-সুন্দর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। ফলতঃ ধীশক্তি (Wiseness) এবং প্রবল মনঃশক্তি-সম্পন্নতা আসে—সাধক সাধিকাদের মধ্যে। সাধক-সাধিকারা তখন যেন, **জীবন্ত-সংযত তন্ত্রশাস্ত্রই** হয়ে যায়।

শাস্ত্রীয় বিধানের অধিকাংশই, মুর্খ-লোভী-পুরোহিতের কব্জায় চলে গেছে। বিয়ে-পৈতে প্রভৃতির সময়ে, শুধু সেটুকুর এক পয়সা অংশ মানা হয়, বাকী নিবানব্বই ভাগ চুলোয় যায়; জরিমানা (জ্যুল্পানা) স্বরূপ ১০টা টাকা পুরোহিতকে গুঁজে দিলে—একটা বোতলের সাথে।

অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে, অর্থই বর্তমান সমাজ জীবনের গোটাটা জুড়ে আছে। তবুও একথা মানতে হবে যে—তার জন্য সততা, ধর্ম এবং আত্মশক্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। এই যে অবচেতন থেকে অচেতনতর এবং বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে গোটা সমাজ, অর্থকরী যা' কিছু তাকেই বিশ্বাস করছে, যা' কিছু মহৎ তা'তেই অবিশ্বাস আর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে, অবশ্যাম্ভাবীভাবে একথা বলা যায় যে—এর কুফল বড় সুদূরপ্রসারী।

তন্ত্রধর্ম তার আপন গুণানুযায়ী সার্বজনীন এবং গ্রহণীয় হয়েছে, বৈদিক কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে না জন্মালে—বেদে কারুর অধিকার নাই, এ'কথা বেদের অর্থ অনুযায়ী নিরর্থক। ব্রহ্মকে জানলে, তবেই ব্রাহ্মণ। যদি জন্মেই

ব্রাহ্মণ হওয়া যেতো, তবে তন্ত্র বা বেদ কোনটারই দরকার হতো না। ফলতঃ আর্য্যদের ওই স্ববিরোধী মতবাদে কোন সত্য নাই, শ্রদ্ধারও দরকার নাই। যারা অ-ব্রাহ্মণ, বেদ পাঠে আর তার অনুশীলনে যাদের অধিকার দেওয়া হলো না, তারা তবে যাবে কোথায়? আর শিব যদি তাদের জন্য, লোভনীয় এবং সুখকর তন্ত্রধর্ম প্রচার করেন, তবে আর্য্য নামধারী পাষণ্ডদের হৃদয় জ্বলে কেন?

তন্ত্র যেহেতু প্রকৃতির সাধনা, ভোগের মধ্য দিয়ে যার শুরু, কঠিন সংযমের মধ্যে দিয়ে যখন যেতে হয়, তখন এক এক করে স্তর অতিক্রম করতে হয়! তন্ত্র সাধনা শরীর-নির্ভর বলে, যৌবনই তার উপযুক্ত সময়। আর ওই সবে যাদের রুচি নাই, তাদের হরি-কেত্তন ছাড়া গতি নাই। 'আশ্রম' নামক অনেক অফিস আছে বাবা শ্রীহরির। সেখানে আজীবন সদস্য হয়ে, খোল-করতালের বাজনার আড়ালে কান্না লুকিয়ে বৃদ্ধ অবস্থার শেষ দিনগুলি কাটাতে হবে; তা' যতই দুঃসহ হোক না কেন!

প্রতিদিন একই জিনিস বা ভোগ কারোরই ভাল লাগে না, যতই লোভনীয় আর সুখকর তা' হোক না কেন। তবে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? পশ্বাচারের মধ্য দিয়ে সাধনার কয়েক বছর কাটানোর ফলে, মনে জাগে কামনা—ক্ষমতা লাভের! আর সেই ক্ষমতা আছে প্রকৃতির কোঁচড়ে! মদ-মাংস-মেয়েমানুষ ভোগ করতে করতে, বীরাচারের ক্ষেত্রটুকু তার—প্রস্তুত আগেই হয়েছিল। এখন ওই পথেই নেশাগ্রস্তের মতো সে এগোয়। একে একে সে জয় করে ফেলে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-মান-রাগ-দ্বেষ—এই অষ্টপাশ। সে হয়ে যায় বীরাচারী সাধক অর্থাৎ পরিণতি শিবে।

শিবত্বে উত্তীর্ণ হলেও, বিভূতির ভূতে কিল মারে মনে। মানুষের শরীরে অমানবিক প্রবৃত্তি চাগাড় মারে মাঝে মাঝে। তান্ত্রিক সাধকদের বিপদ ও'গুলো। আধার যদি দুর্বল হয়, অর্থাৎ হীনমনা, লোভী হয়—তবে পতন তার অবশ্যই হবে। বিভূতি দেখাতে হয়—আর্তকে রক্ষার জন্য। অন্য কোন কারণে বিভূতির প্রয়োগ ঠিক নয়! প্রতিটি কাজের ভাল আর মন্দ—উভয় দিকই আছে। মন্দ, দুঃখ আর পতনকেই নেমন্তন্ন করে!

পরিশেষে বলা যায়, তন্ত্র-মন্ত্র শুধু কয়েকটা **অক্ষর বা পদ্ধতি নয়**। এ' দিয়ে **আশাতীত অকল্পনীয়** অনেক কিছু করা যায়। **তিব্বত থেকে আসা** এই তন্ত্রধর্ম এক সময় গোটা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। আজও সেই তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চলছে। যুগ বদলের সাথে সাথে, তন্ত্র-সাধনায় ভাঁটাও পড়েছে লক্ষণীয়ভাবে। ফলতঃ তন্ত্রসাধনা এখন শুধু ছুট্‌কো-ছাট্‌কা **অভিচার ক্রিয়ার (Black Magic)** মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং লোক ঠকানোর অস্ত্রমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ❀ ❀ ❀

উদ্ধারণপুর ঘাটের সেকাল



উদ্ধারণপুর ঘাটের

একাল

বা লা দে

ঝাড়খণ্ড

মুর্শিদাবাদ

সিউড়ী

বীরভূম

নদীয়া

বর্ধমান



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

উদ্ধারণপুর মহাশ্মশান : সে'কাল—এ'কাল

(১) পটভূমি : কেতুগ্রাম বাসস্ট্যান্ড

সেদিন বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, **বহুলা-মড়াঘাট** মন্দির থেকে। ওঁকার-মহারাজ এগিয়ে দিয়েছিলেন, কেতুগ্রামের বাজার পর্য্যন্ত। বাস আসতে দেরী দেখে ভাবলাম—আজ যদি **কাটোয়া** যাই, তবে রাতে পড়ে থাকতে হবে কাটোয়া স্টেশনে, অথবা হাওড়া স্টেশনে। কাটোয়া স্টেশন তবুও নিরাপদ, হাওড়ার মত অতটা বদখত আর বিপজ্জনক নয়। যদিও কিনা কাটোয়া নামের সাথে, লুকিয়ে আছে তার **চরিত্র আর ইতিহাস।**

কী সেই ইতিহাস? **কাট্ওয়া** মানে হলো—'কেটে নিয়ে গেছে' বা 'কেটে দেওয়া হয়েছে' অথবা 'কাটাই করা হয়েছে'। কে কাটলো আর কী কাটলো? হতে পারে—বন-জঙ্গল কাটাই করে, এক সময় বসত গড়ে উঠেছিল। অথবা বর্গীরা হানা দেবার সময়, বাধা পেয়ে ওই অঞ্চলের জমিদার বা রাজাদের **মাথা কেটে** নিয়ে গেছে। মোদ্দা কথা হলো এই যে—হিন্দী ভাষায় **কাট্ওয়া**, এখন বা কালে কালে লোকমুখে চলতে চলতে—হয়ে গেছে **কাটোয়া**। ইংরাজীতে KATWA লেখা হয় কথাটি, হিন্দী শব্দের সাথে মিলিয়ে।

তো—সে যাই-ই তার কারণ হোক না কেন, যদি কাটোয়া বা হাওড়া স্টেশনে রাত কাটাই, তবে যে আবার একবার **'কাট্ওয়া'** ব্যাপারটা ঘটবে না; সেই গ্যারান্টী কে দেবে? পকেটে পয়সা আমার কোনদিনই বেশী থাকে না। বাস ভাড়াটুকু বা ট্রেন ভাড়াটুকুই থাকে, এই বাংলায় ঘুরতে গেলে। ভারতের অন্য কোথাও গেলে—সেটুকুও থাকে না। এখানকার বাসও'লা বা ট্রেনও'লা—খাতির করে না, **দাড়িও'লা-বাবা পাঁঠাদের**। আমি ওই রকম দলেরই কিনা।

ওদের সাথে আমার তফাৎ পোষাকে, মানসিকতায় নয়। মনটা সব সময় ছুঁক ছুঁক করে—কারুর মাথায় আশীর্ব্বাদের **ফোকলা হাত** বুলিয়ে, শুকনো ফুল-বেলপাতা-রুদ্রাক্ষের বদলে, গাঁজা-ভাঙ্গ-বিড়ি-মদ **গেঁড়িয়ে দিতে**; যদি কিনা সে-রকম সে-

রকম—কোন এক ভক্ত নামক **বোকাপাঁঠাকে পাওয়া যায়**; এবং তার রীতিমত Brain wash করা যায়।

পকেট-কাটার দল যে, আমাকেও তাদের **পাকা-পাঁঠা** ভেবে নেবে না, তারই বা ঠিক কী? টাকা পয়সা আমার কাছে না পেলেও, ছ'হাজার টাকার মোবাইল ফোন আছে, দেড়-হাজার টাকার ক্যামেরা একটা আছে, দু'শ টাকার এক Steel কমণ্ডলু আছে, আর আছে—গোটা দুই নূতন কম্বল, যার দাম নাই-নাই করেও—হবে হাজারটি টাকা! ইষ্টিশানে বেমক্কা হাজির হওয়া, এমন এক **পাকা পাঁঠাকে** হাতের কাছে পেয়ে—ছেড়ে দেবে রাতের বেলায়; এমন **বোকাপাঁঠা** একটাও এই বিশ্বসংসারে আছে বলে—এতটুকুও প্রত্যয় হলো না।

এই সব কথা চিন্তা করতে করতে, সময় কেটে গেছে প্রায় একঘণ্টা। তবুও এলো না সেই বাস, যাতে করে আমাকে যেতে হবে—**কাট্ওয়া** নামক রেল স্টেশনে। অগত্যা গোরুর গাড়ীর মতো ছই-লাগানো, এক রিক্সা-ভ্যানের মালিককে বললাম, "বেটা, তুমি যদি **পাচুণ্ডী-মোড়-এর** দিকে যাও, তবে আমাকে তোমার এই ভ্যানে নেবে? আমার কাছে কিন্তু কোন, **টাকা পয়সা নাই**, তোমাকে দেবার মতো।"

কথাটা তাকে বললাম **ডাহা ডাহা মিথ্যা**। কেন না, বাসে পনেরো-বিশ টাকায় কাটোয়া যেতে পারলেও, কেতুগ্রাম বাজার থেকে পাচুণ্ডীর মোড়ে আসতে— ওই তিন চার কিলোমিটার পথের ভাড়া—ওরা **পঁচিশ টাকা** চেয়ে বসে। ঠ্যাকাটা যার বেশী, সে তখন ব্যাজার মুখে টাকাটা দিতে বাধ্য হয়। তবুও ভ্যানও'লারা চিরকালই **'গরীব মানুষ'** থেকে যায়!

ভগবান নামক যে বিট্কেল, ওই খিট্কেলেমীর কাজটা করে, তার লাজলজ্জার বালাই আছে বলে—এতটুকুও মনে হয় না। মাথার ঘাম **চট-গামছায়** মুছে, সৎ উপায়ে পয়সা উপার্জন করতে চেয়েও; কেন যে ঈশ্বর **'খদ্দের' নামক ছাগলদেরকে** পাঠিয়ে দেয় না; সেই প্রশ্নটাই বা ওই রিক্সাও'লারা কাকে **পুছবে?**

কোন পার্টির লোক্যাল কমিটিকে বললে ওরা বলে, "সহানুভূতির সাথে তোমাদের ওই ব্যাপারটা, আমরা ক্যমিটিতে বিব্যাচনা করব! মাথা-পিছু পঁচিশ টাকা লাও ক্যেনে! লুটিশ-ব্যুড়ে ভাড়াটা লিখাঁ-টাঙাই দ্যবক্ ঈ হপ্তায়! উই পুচুণ্ডীর ম্যড়ের মাথায়— হ্যোলঁ! হিদয়টো জ্যুড়াইঁ যাবেক ক্যানে! অখন যাও ক্যেনে, মিটিং হচ্ছেঁ!"

ওরা খুশী হলেও—**খাসি-খাসি 'প্যাসেঞ্জার'** আর আসে না। ঈশ্বর ব্যাটা সগ্গ থেকে 'লেমে' এসে, **'লিশ্চয় কেন্দের কারসাজী'** করেছে। ঘাম মুছতে মুছতে চট্-জাতীয় তিন-হাতি গামছায়, ভ্যানও'লার তাই মনে হয়—**উই ঈশ্বর-শালাই** আম্যাদ্যার

শেণী-শত্তু। উর মাথ্যাটো কাটলেঁই, সব ঠিক হয়েঁ যাবেক। উ শালাকে পূজা দ্যুব ক্যানে? মা-কালীখে পাঁঠা বলি দ্যুব বটে! হে মা কালী, **একটা পাঁঠা ম্যুকে দ্যও মাগো, বলি দিই ত্যুকে!**

এ-হেন রিক্সাভ্যানওলা, আমার মত এক **ফালতু পাঁঠাকে** পেয়ে, নিরাসক্ত স্বরে বললো, "সকাল বেলাই দু'শ টাঁকা হারাঁইছি গ্য'। অখনো এ্যাকটাও ভাঁড়া হোল-নি! মুফতে টাইনতে লারব বাবা!" তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, সে এতটুকুও মিথ্যা কথা বলছে না। সাংসারিক প্রয়োজনীয় যা' কিছু কিনবার জন্য, হয়তো সকালবেলায় বাড়ী থেকে; সেই টাকাটাই সে নিয়ে বেরিয়ে ছিল। তাই তাকে অকপট সহানুভূতির সুরেই বললাম, "মা চাইলে, তোর আবার সবই হবে। মা তারার উপর বিশ্বাসটুকু রাখ্ বেটা!"

সজল হলো না কেতুগ্রামের **ভ্যানও'লা ম্য'শয়ের** অন্তর। প্যাঁক্ প্যাঁক্ করতে করতে, সে বেরিয়ে গেল—পাচুণ্ডী মোড়ের দিকে, খালি রিক্সাটা নিয়ে। **প্যাঁক্** খেলো না সে, **প্যাঁক্** তাকে দিতে পারলাম না আমিও। অগত্যা আমার খ্যাংরাকাঠি পা, আর TB-মার্কা চোখ দু'টোকে বললাম, "তোমাদেরকে কষ্ট দিতে তো ভাই, আমি চাই না। কিন্তু কী করি বলো—পরিস্থিতিই শালা এমন!

তবে কিনা—একটু **মা-কালীর প্রসাদ** টেনে নিয়ে, চলো আস্তে করে এগিয়ে যাই! আমার সঙ্গী হবার হেপা—বুঝলে তো এবার! তবে স্বীকার তো তোমরা অবশ্য করবেই যে, আমি লোকটা বড়ই ভালো—কোন **প্যাঁচ-পাঁচে** নাই। তোমাদের কষ্ট হয় বলেই না, মাঝে মাঝে দাঁত দিয়েই, **বোতলের প্যাঁচ খুলে ফেলি**, তোমাদের আর আমাব তেষ্টা মেটাতে। কাজটাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবে তোমরা?"

কেতুগ্রামের মুদীর দোকানের ঘুলঘুলি থেকে, বেরিয়ে এলো একটা মা কালীর **বিলাতীমার্কা** পানীয়। পুকুরপাড়ের কোণায় গিয়ে, গলায় সেটা ঢাললাম, চোখ আর পা-কে সাক্ষী রেখে। শুধু মনে মনে বললাম, "একটু রসো ভাই, মজাটা তোমরাই পাবে ভালো মতো। আমি তো নিমিত্ত মাত্র! কার মজা, কে ভোগ করে—ব্যাপারটা বুঝে নাও! বাসভাড়ার খচ্চায় আমি তোমাদের খাওয়ালাম, **মা কালীর প্রসাদ**। পকেট ফাঁকা করলাম আমি. মজাটা উপভোগ করবে তোমরা। তা' হোক, মালিক তো চিরকালই খরচ করে। যারা নেমন্তন্ন খায়, তারাই মজাটা পায়, চিরকালেরই 'লিয়ম্ এ্যাটা'! আমার আর কোন দুঃখ্যু-টুখ্যু নাই।"

কেতুগ্রামের সেই মুদীর হঠাৎ, Bonus দেবার উৎসাহ হলো আমাকে। কড়কড়ে ৭০ টাকার জাঁদরেল্ খদ্দের আমি, তার সেই **গোপন দোকানের**। অতএব **সদরে** সে আমাকে, **আদরে দিলো** এক বাণ্ডিল **পাকী-তামাকের** বিড়ি; প্রাণভারে

ফুঁকবার জন্য। পাল্টা বোনাস্ হিসাবে, আমিও যাতে মা-তারার দরজার কড়া নেড়ে, চিমটে ঝেড়ে বলি যে—মনিস্যিটো ভালঁ বটেক, ত্যু উয়ার ব্যবসাটো বাড়াইঁ দে ক্যানে? উ বিড়ির বাণ্ডিলটো মুফতে ফুঁকতে দিল যেঁ!"

বোনাসের ফাউ হিসাবে একমুঠো **শুকনো ফুল**, তাকে অতি যত্নে কাগজে মুড়ে দিয়ে দিলাম, যাতে করে কিনা মা-তারা, তার থেকে মাঝে মাঝে **মুখ বের করে; খদ্দেরকে চোখ মেরে মেরে ডাকে**—নিজেকে **তুরীয়ানন্দে চুবিয়ে নিতে!** দোকানদারের **সুখ** আসবে, আর যত **অ-সুখ বালাই** 'পালাইঁ যাবেক'!

ফুলের ঠ্যালায়— সে আমাকে ঠেলে তুললো, পাশের এক **বেলের-মোরব্বার** দোকানে। **শালা**—এক একটা যেন গরুর গাড়ীর চাকা! মুরুব্বীর মতো ভারিক্কী নিয়ে, **হারামের মোরব্বায়** কামড় মারলাম—হামলে পড়ে। পাশে রাখা চিমটায়, বর কতক টপ্ টপ্ করে, ঝরে পড়লো **চিনির রস**। চিনি আর আখ-গুড়ের ভিয়েনে তৈরী কিনা!

আরাম করে খেয়ে উঠে পড়লাম—গাদা গাদা আশীর্বাদ দিয়ে দোকানীকে **একদম মুফতে।** মনটা এখন আমার **দরাজ**। দরজা খুলে গেছে তার—মাগ্না বিড়ি আর মোরব্বার প্রসাদ গুণে। পা আর চোখ দু'টো বললো, "চল ক্যেনে গোসাঁই?" অগত্যা বাঁক নিলাম বাঁয়ে—পাচুণ্ডীর ঠেঁয়ে যাব বলে। শালা যত রাজ্যের **সড়সড়ে** পিঁপড়েরা, চিমটে বেয়ে কখন যে উঠেছে—মালুম হয়নি একটুও।

থমকে গিয়ে চিমটেটাকে ঘাসের মধ্যে ঘসে, পিঁপড়েদের তাড়াতে গিয়ে; দেখতে পেলাম পেল্লায় এক তেঁতুল গাছের পাশে—**নয়ান জুলীর** ধার ঘেঁষে পড়ে আছে; ছোট্ট একটা ঠোঙায়—**কিছু একটা বস্তু।** হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে খুলে দেখি, তা'তে রয়েছে **দু'শ টাকা।** মনে হলো—এ'টা মায়ের কৃপা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অন্ততঃ রাতটুকু কাটোয়ার কোন হোটেলে, কাটানো যাবে আরামে।

আনন্দে এগিয়ে চললাম পাচুণ্ডীর মোড়ের দিকে। পথে দেখা হলো সেই ভ্যানও'লা—ইসলাম বরকৎ মিঞার সাথে। **'হতাশ-মা-কালী'** তখন ভর করেছে তার মগজে। টাকা হারানোর ব্যথা, প্যাসেঞ্জার না পাবার ব্যথা, পুত্রশোকের মতই **গভীর আর দুঃসহ।** তাই সে সম্ভবতঃ সেই শোক ভুলতে—মুখে তুলতে ভুলেনি মা-কালীর প্রসাদ, আর শিব বাবার তুরীয়ানন্দ গাঁজা। না হলে তার ব্যথাতুর চোখ দু'টো, অমন করে লাল-লাল হয়ে উঠতো না! **বিরলতম দুঃখের সরলতম লালিমা**—জয় কালী-মা! এতটা নিষ্ঠুর কেন হ'লি মাগো মা!!

পিঁপড়েরা শালা, এমন যে ছ্যাঁচড় হয়—আগে তা জানলেও, মনে হয়ে হয়েছিল যে, ওরা আর তেমন একটা জ্বালাবে না। কিন্তু ভাল কথার 'মানুস' ওরা

মোটেই 'লয়'! ফের কোথা থেকে এসে, সদলবলে জুটেছে! তাই চিমটে-টাকে ঝাড়তেই হয়, আরও বার কতক—ঝনাৎ-ঝন্ করে। সেই শব্দে মুখ তুলে তাকালো, আমার দিকে **ইসলাম বরকৎ মিঞা**, প্রশ্নালু দৃষ্টি মেলে—টলতে টলতে।

কাছে গিয়ে তাকে বললাম, "বেশ রোদ উঠেছে, হাঁটতে অনেক সময় লাগবে। ঠিক আছে, চলো—পুরো বিশ টাকাই দেবো। পাচুণ্ডী মোড়ে গেলে—হয়তো অন্য রুটের বাসও পেতে পারি। নিয়ে যাবে তুমি?" দ্বিরুক্তি করলো না সে আর। বসে পড়লাম তার ভ্যানগাড়ীতে—টেনে নিয়ে চললো সে আমাকে, **চুলোয় দিতে চিরকালের জন্য**। বেলা এখন বাজে বিকেল দুটো!

রিক্সা টানতে টানতে সে বললো যে—সে নাকি **হাগ্‌তে বসেছিল**, একটা 'লিজ্জন্' তেঁতুল গাছের পিছাড়ে। সেই তেঁতুল গাছটাই নাকি, **তেঁতুলে-খচরামী** 'কোরেঁ লিছে' তার সাথে। ওখানে ছাডা সে আর, অন্য কোথাও যায়নি। 'তাহ্‌ল্যে আমার ট্যাক্কাটো লিল্য কে বটে?' একেবারে হ্যক্ক্ কথা—**সে** আর ওই **গাছ** ছাড়া, আর তো কেউ সেখানে ছিল না! 'লিশ্চয় ক্যন পেত্নীর হাত আছে—কী বলেন বাবা?'

পেত্নীর হাত আছে কিনা আমার জানা নাই। তবে **পত্নীর ঝাঁটার মার** যে মাটিতে পড়বে না, সন্ধ্যেবেলায় বাড়ী ফিরলে—সে কথা হলফ করেই বলা যায়। প্রশ্ন করলে—উত্তর একটা দিতেই হয়। তাই বললাম, "সেই হাড়-জ্বালানী **পেত্নির-পিসির সাথে**, আমার একটু আগেই দেখা হয়েছে। সে নাকি তাকে চুলের মুঠিতে ধরে, বেশ ঘা-কতক **ঝাঁটার-বাড়ি** দিয়েছে; তোমার ঘাম-ফেলা **হক্কের কড়ি গ্যাঁড়াবার জন্য।** তবে টাকাটা তুমি পাবেই—আমার মন বলছে।"

ভ্যান্ থেকে সড়াৎ করে 'লেমে এসেঁ'—সে 'গড়' করলো, অনেক অনেক বুকভরা প্রত্যাশায়। মালের ঘোরে আমিও বলে ফেললাম বেফাঁস কথা। **'জ্যয় কালী, টাকাটা উয়ার আমার পকেটে দে ক্যানে, উয়াকে দিয়েঁ দিই গ্য'—মা গ্য'**। চোখ পিটপিট করে আমার দিকে চেয়ে, সে কী একটা অস্ফুটে বললো জানি না। আবার গাড়ীতে উঠে, **জোরে চালিয়ে দিলো তার গাড়ী;** পাঁচুণ্ডীর মোড়ের দিকে।

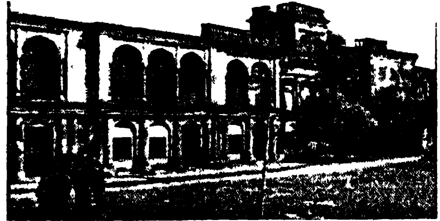
তার বাড়ি নাকি পাশের **বনওয়ারী-বাদ** গ্রামে, মুর্শিদাবাদের মধ্যে পড়ে। সকাল বেলায় **'সওয়ারী'** নিয়ে, বর্ধমানের কেতুগ্রামে সে এসেছিল। ফেরার পথে সে হাট-বাজার করেই ফিরতো, যদি না তার সেই টাকার ঠোঙাটা, **পেত্নীতে হড়পে না দিতো**। সেই দুঃখেই তার এখন পঙা ফাটছে! আমার মতো একজন **টসটসে জ্যান্ত-সাধুর কথাটাকে, চদুর-উক্তি বলে,** মানতে সে একেবারেই নারাজ। তাই তার ওই উৎসাহে— জোরে জোরে গাড়ী চালানো।

পৌঁছে গেলাম পাঁচুগুীর মোড়ে। **টাকাটা দিয়েই দিলাম**—ইসলাম বরকৎ মিঞাকে, আরও কুড়িটা টাকার সাথে। মালের আর গাঁজার ফিকে নেশার তখন—**উধাও হবার অবস্থা**। ঝর ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, তার 'বড়োই ভ্যুল্ হয়েঁ যেছে! সাধু-মনিস্যির অপ্‌মানটা ঠিক্ লয়!' পায়ে ধরে সে বললো তার গাঁয়ে যেতে হবে। এ' শালার বাসগুলোর যে কী হয়েছে—একটাও আসছে না। ভাবলাম—রাতটা অন্ততঃ নির্ভয়ে কাটানো যাবে। চোর-চামার পকেটমারের ভয় আর থাকবে না। রাজী হয়ে গেলাম তার কথায়।

বললাম, "তোমাদের ওখানে দেখার কী আছে, বল তো? ভাল কিছু আছে ছবি তুলবার?" সে বললো, "রাজবাড়ী আছে, দীঘি আছে, ৪-৫ হাত বড় বড় লাখ লাখ মাছ আছে, আর আছে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত **কালো মটর**!" যে সব কথা শুনলাম—তা'তে মনে মনে আনন্দই পেলাম। নূতন জায়গা দেখা হবে, ছবি তোলাও হবে, আর হবে রাতে তার বাড়ীতে থাকাও! লেখার রসদও জুটতে পারে কিছু কিছু! এমন সুযোগ ছাড়া মোটেই উচিৎ নয়।

ভ্যান্ ছেড়ে দিলো জোরে বরকত মিয়াঁ। হাজার হাতির বল এখন তার **পায়ে আর হাতে** ভর করেছে। এমন একটা **নির্লোভ-লোভী সাধুকে,** অবশ্যই সে শ্রদ্ধাভরে, তার গিন্নীর হাতে রাঁধা—**বাদশাহী-মুর্গা-মশল্লম্**' খাওয়াবে। No চিন্তা—খাও পান্তা!

গঙ্গা-টিকুরীর মোড় ছাড়িয়ে, সে বাঁক নিলো বাঁয়ে, **বহরমপুরের** পথে। দু'ধারের গাছপালা, ঘরবাড়ি, দোকান-পাট দেখতে দেখতে; পৌঁছে গেলাম **বনওয়ারীবাদ** রাজবাড়ির গেটে। রিক্সা থেকে নেমে এক ঠোঙা বিস্কুট, সে কিনলো নিজে। খাওয়াতে হবে কিনা **রাজ-দীঘির মৎস্য-অবতারদেরকে। শ্রী বিষ্ণুর অংশ কিনা ওরা।**



(২) মধ্যভূমি ঃ বনওয়ারীবাদ রাজবাড়ী

রাজারাও নাকি **ঘোরতর বৈষ্ণব**। তারা থাকে নাকি সবাই **কাটোয়ায়**। রাণী মা এসে মাঝে মাঝে দেখে যায় তার **রাজপাট** কেমন চলছে এখানে। বৃন্দাবনের যত ঠাকুর আছে, সবাইকে খেতে থাকতে দেবার কড়ারে; রাজকোষের অর্থব্যয়ে কবে দেওয়া হয়েছে, চার বিঘে জায়গা জুড়ে পেল্লায় এক **মন্দির আর নাম সংকীর্ত্তনের মণ্ডপ**। তাদের দেখভাল করার জন্য. আছে গাদা গাদা বামুন, আর তাদের ছানা-পোনারা; যারা মেজাজ আর মর্জ্জিতে—এক একজন **রাজা কী বড়লাট!**

এ হেন এক বড়লাট, কাঠের টাট্‌-খানাকে (চৌকী) আলকাতরা মার্কা—তিন-হাতি গামছায় ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, "এখানে ভারতের সব ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে রাখা আছে, নিত্যসেবাও হয়। তবে কাউকে **ভোগ প্রসাদ দেওয়া হয় না**। যা মাগ্‌গী-গণ্ডার দিনকাল পড়েছে!" ফটো তুলবার ইচ্ছে প্রকাশ করায়, চিরতার পাতা চিবানোর মত মুখ করে সবিনয়ে(?) বললো, "খবরদার, ওটি হবে না—স্যর মহারাজ! রাণীমা জানতে পারলে আমাদের চাকরী চলে যাবে।'

কেন যে বারণ, কারণ জানা নাই কারুর। এ হেন রাজবাড়ীর ওই যে **দীঘল্ দীঘি**, তাতে মাছ ছাড়ে না আজকাল রাজারা। ছাড়ে দু'পাঁচ জন প্রজারা—যারা "**পোনা ফেলবে গো**" বলে, বাঁক কাঁধে হেঁকে-ডেকে যায়; ওই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের শুরুতে। বিক্রী না হলে, ওগুলো ফেলেই দিতে হয়। অন্য কোথাও না ফেলে, শ্রীকৃষ্ণের জীবকে **তারই জিম্মায় রেখে**; খালি হাঁড়ি নিয়ে বাড়ী ফেরে তারা; হাওয়া থেকে কুড়িয়ে নিয়ে **নিরেট আশীর্ব্বাদ**! সব ঠাকুর নাকি, ওদেরকে আশীর্ব্বাদের ব্যাপারে একমত।

তো সেই ঠাকুরেরা **আমাকে কুকুর ভেবে**, তেড়ে বের করে দিল—রাজবাড়ির চত্বর থেকে। সত্যিই কয়েক হাজার **পাকা রুই-কাৎলা, শোল-শাল-বোয়াল** মাছ দেখে, নয়ন সার্থক করে—তাদেরকে বিস্কুট খাইয়ে, বেরিয়ে এলাম। **ভগ্নস্তূপ রাজবাড়ীর** প্রহরীহীন দীঘির, লোভনীয় বড় বড় মাছগুলোকে, কেন যে কোন শালা চোরেরা **চুরি করে না** বুঝি না। ভারতে চোর-ডাকাত আছে, **'ঈ শালার দ্যাশে কী এ্যাক্‌টাও লাই!'**

অগত্যা বাইরের ছবি তুলে, গর্বে দুঃখে ফুলে, চড়ে বসলাম বড়কত মিঞার রিক্সা-ভ্যানে। যাবো এখন তার ডেরায়। বাল-বাচ্চা নিয়ে থাকে যে চুলোয় সে। পথে যেতে যেতে ইঙ্গিতে তাকে বললাম—**বোতলের কথা**—হৃদয়ের ব্যথা জুড়াতে। ওই বস্তুটি আমার দরকার রাত্রে, **মুরগী কিম্বা মাছের সাথে**। একসাথে পাঞ্চ্‌ হয়ে—হৃদয়ে হাত বুলায় ওরা, **'আহা—রে, বাছা—রে'** বলে!

ইসলাম বরকৎ মিঞা, এখন হয়ে গেছে আমার পোষা টিয়া। গলগলিয়ে মালের ঘোরে, বললো খুলে হিয়া, "দিঘীর মাছগুলো মরে গেলে, আগে আগে ভাসিয়ে দিয়ে আসা হতো গঙ্গার জলে। এখন আর ও'সব করা হয় না। অনেক দূরের পথ, কে আর যাবে বিনি পয়সায়? মাটি খুঁড়ে তাই পুঁতে দেওয়া হয় মরা মাছকে। ওদের আর গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে না। বৈষ্ণব রাজারা **মাছ খায় না; মাংস-মদ খায় কেউ কেউ, লুকিয়ে চুরিয়ে।"** এমন সরস গল্প, রাতের বেলায়—অল্প কথায় সারলো সে। কেন না তার বেগম, আগাম খবর দিয়ে রেখেছে যে—ভাত বাড়া হবে—একটু পরে, এই হয়ে

এলো বলে! মুরগীর ঝোলটা ফুটছে।

খেতে খেতে তাকে জানিয়ে দিলাম যে, "আমার গতি হবে—**উদ্ধারণপুরের ঘাটের** দিকে। সেখানে কাটাবো দু'টো রাত। **মড়া হয়ে পুড়তে নয়—মড়া পুড়ানো দেখতে, দুই** রাত আর একটা দিনভর! **ভূতের সাথে হ্যাণ্ডশেক** করবার ইচ্ছে আছে। " মালের ঘোরে টাল খেতে খেতে, মুরগীর ঠ্যাঙে কামড় মারতে মারতে; আধ-বোজা চোখে সে তাকালো আমার দিকে।

কিছুটা ভয়ের আভাস পেলাম তার মুখে-চোখে। তারপর পাশে রাখা **কাঁচি বোতলটা,** ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢেলে; দড়াম করে মাটিতে একটা **পেল্লায় লাথি মেরে** বললো, "আপনাকে আমি লিয়েই যাব সেখানে। দু'রাত থাকবো বটে সেখানে।" তেরিয়া মেজাজ দেখে ভাবলাম যে, ওটা হচ্ছে **বোতলের গুণে।** কিন্তু না! সকালে এক কাপ চা বাড়িয়ে দিয়ে, ফ্রেস মগজে সে বললো, "তিন দিন রিক্সা চালাবো না। আপনাকে নিয়েই ঘুরবো। ভূতের খেলা দেখবো আমি।"

পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপারটা, **নির্জনের—গোপনের!** এই ব্যাটা আবার পিছু ছাড়ে না। সাথে রাখলে সবটাই মাটি হবে। হয় ওই শালা হার্ট ফেল করবে, নয়তো আমার থাকাটাই মাটি হবে। আর তাছাড়া, সে গরীব মানুষ। আমার সাথে পড়ে, উৎসাহে সে যদি তিন তিনটা দিন, সব সময় আমার সাথে থাকে; তবে তার খাবার ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হবে! অতগুলো টাকাও আমার সাথে নাই। **কোনমতে তাড়াতেও তাকে পারছি না।**

তাই বললাম, "বুঝলে বাবা, গরীব মানুষ তুমি। তোমার রোজগার বন্ধ হবে। আমরা শ্মশানে পড়ে থাকা লোক, আয় উপায় না করলেও চলে। আমাকে বরং পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসো।" বললো, 'দু' পাঁচ বিঘে জমির ধান-গম-তরিতরকারী, মটর-ডাল-কলাই, সর্ষে-সুর্য্যমুখী-তেলে সংসার চলে। না খাটলেও চলে। কাঁচা পয়সার জন্যই রিক্সা চালাই। আমি আপনার সাথে থাকবই। বিদেশ-বিভুঁই—আমি আর আপনাকে একা ছাড়ছি না!"

গুম মেরে গেলাম তার কথায়! ব্যাংকের ATM-ও এখানে নাই যে, অন্ততঃ দেড়-দু'হাজার টাকা তুলে নিই। মাথাটা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে এখন। হঠাৎ মনে হলো—একটা রাত অন্ততঃ থাকি, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। যাই হোক, **রাজী হতেই হলো।** পকেটে তখনও আমার হাজার টাকার মতো ছিল। সকাল সকাল রান্না করে দিল—বরকৎ মিঞার বেগম। খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা—উদ্ধারণপুরের ঘাটের দিকে।

(৩) অন্তঃভূমি ঃ উদ্ধারণপুর-ঘাট

এই সেই শ্মশান ঘাট। এখানে পুড়ছে হাজার হাজার মড়া, হাজার বছর ধরে। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বর্ধমান আর মুর্শিদাবাদ জেলা। বীরভূমের লাগোয়া এই জেলার, পূর্ব দিকটাই হলো নদীয়ার পশ্চিম দিক। মাঝে বয়ে চলেছে তার গঙ্গা ভাঁটির টানে। বীরভূম, বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ এই গোটা তিনটা জেলার মড়া আসে এখানে। **রোষ্ট হতে অথবা ছাই হতে।** না হলে আমার মত সাধুরা—**কোন ছাইটা মাখবে শ্রী-অঙ্গে শুনি? ছাই-পাঁশ গিলে, ছাই মেখে শ্মশানের, বসে থাকা ওখানে**—**জ্যান্ত আর মরা ভূতদের সাথে,** মোলাকাৎ করবার জন্য। একে বলে **তন্ত্রীয় ভষ্মস্নান**। সাধু-ভূত আর পাবলিকের—**ত্রিপাক্ষিক স্বর্গের রাস্তা সাফ হয় কিনা।**

তা'—এই যে এই উদ্ধারণপুর ঘাট, এর একটা ইতিহাস আছে। বলেই ফেলি সেটা। আমাদের সেই নিমাই ঠাকুরগো, তার একটা **হরি কেত্তনের বাংলা-ব্যাণ্ড্ পার্টি ছিল।** সেথোদের নিয়ে, দিনরাত সে 'রিয়াসাল' দিত কেত্তনের। **উদ্ধারণ দত্ত** ছিল—তার এক মোটা মাপের **'সেথো'**। সেইই বানিয়ে দিয়েছিল এই ঘাটটা। প্রভুপাদ নিমাই ঠাকুর নদীতে চান করতে **গিয়ে না হড়কে পড়ে,** সেই জন্য ভক্তের এই লক্ষ টাকা খরচের **হাত-খোলা** ব্যাপার।

নবদ্বীপের নিমাই ঠাকুর, দ্বিতীয় দফায় যখন দীক্ষা নিয়েছিল—কেশব ভারতীর কাছে; তার **'সেথো'** ছিল তখন নিতাই ঠাকুর। পরে তার নাম হয়েছিল **নিত্যানন্দ মহাপ্রভু**। আর এই উদ্ধারণ দত্তের অন্য নাম ছিল **দিবাকর দত্ত বা সুবাহু দত্ত।** কীর্ত্তনের দলে পড়ে, খোল্-করতাল খুইয়ে—এমন কী নামটাকেও মুছে; হয়ে গেল সে **উদ্ধারণ দত্ত**! কেষ্টই তাকে উদ্ধার 'লিশ্চই কোরেছ্যাল (অ)'! না হলে বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া নাম বলে কথা! সেটাকেও কেত্তনের টানে খুইয়ে ফ্যাল্‌ল গা'! ''কেষ্ট নামে কত মধু, তুমি কী বুঝিবে চাঁদু—**ও' বাপ্ রাধা হে-এ-এ!'**

তো— সেই যে সেই শেষবার, **'গৌর-নিমাই'** যখন মাথা মুড়ালো—ওই **মধু পরামাণিকের** কাছে মড়াঘাটে, সন্ন্যাসে দীক্ষা নেবার জন্যে **কেশব ভারতীর** কাছে; সে ঘাটের একটা 'ইজ্জত' আছে কিনা? আর সেই ইজ্জৎ যা'তে **'লিজ্জৎ'** পাঁপরের মত গুঁড়ো-গুঁড়ো না হয়, বে-ইজ্জৎ যা'তে না হয় ওই মহাপ্রভুর; সেই জন্য **দিবাকর দত্ত** জান-মান লড়িয়ে—টাকা পয়সা দিয়ে গড়িয়ে দিয়েছিল এই শ্মশানের গা-ঘেঁসা গঙ্গার ঘাটটাকে। মহাপ্রভুর অকৃপণ কৃপায় উদ্ধার হয়েছিল অবশ্যই তার, ইতিহাসে সে কথাই বলে। কাটোয়ার ওই শ্মশানঘাট তাই নাম পেয়েছিল, তার নামেই—**উদ্ধারণপুর ঘাট**!

কপালের কী যে গেরো—বুঝা খুবই মুশকিল। ঘোষের পো হয় ঘোষ, বোসের ছ্যানা হয় বোস; নিদেন পক্ষে পরামাণিকের পো 'লিশ্চই পরামাণিক হবেক': তা' না! উল্টো হলো একদম ব্যাপারটা! ভারতীর শিষ্য হয়ে, গৌর হয়ে গেল **'গিরি'**! পূরা নাম—**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গিরি**! **'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী'** হলো না কেন? সে কথা একমাত্র বলতে পারবে—**কেশব (কেষ্ট) আর ভারতী (সরস্বতী)**—ওরা সাকুল্যে দু'জন। কেষ্ট চালায় এই জগৎটাকে। আর তাকে মগজ আর বুদ্ধি যোগায় ওই দুষ্টু সরস্বতী! দু'জনের মনে কী ছিল জানিনে। তবে, **"আদ্যন্তবিপর্য্যয়শ্চ" সূত্রানুসারে**—ল্যাজামুড়া খসে গিয়ে নিমাই হয়ে গেল শুধুই " .... চৈতন্য .. .. !!"

এবার শরীর-মন সবটুকুকে শুদ্ধ করে—তবেই হতে হবে সন্ন্যাসী বা মহাপ্রভু বা মহারাজ! না হলে শাস্ত্রটা টকে গিয়ে, পচে ভট্‌ভট্‌ করবে; খট্‌খটে রোদের মতো উজ্জ্বল হবে না যে! তাই ভারতী সাহেব **বিরজা-মন্ত্র** পড়াতে ছাড়েনি, নিমাই-গৌরকে। একেবারে বগলদাবা করে, পাখী পড়া করে বলিয়ে নিয়েছিল—হোমে আহুতি দিতে দিতে ঃ—

১. **"ওঁ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা,**
মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ মা—
ভূয়াসং স্বাহা!"

[আমার প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদানবায়ুর শুদ্ধি হোক। আমি যেন রজঃগুণ শূণ্য, পাপশূণ্য, জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে যাই!]

২. **"ওঁ পৃথিব্যপ্তেজোবাযবাকাশানি,**
মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ মা—
ভূয়াসং স্বাহা!"

[আমার শরীর মনের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম রূপের শুদ্ধি হোক। আমি যেন রজঃগুণ শূণ্য, পাপশূণ্য, জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে যাই!]

৩. **"ওঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রাণি,**
মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ মা—
ভূয়াসং স্বাহা!"

[আমার প্রকৃতি, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি এবং শ্রোত্রের (কানের) শুদ্ধি হোক। আমি যেন রজঃগুণ শূণ্য, পাপশূণ্য, জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে যাই!]

৪. "ওঁ ত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবচাংসি,
মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ মা—
ভূয়াসং স্বাহা!"

[আমার ত্বক. চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাকের শুদ্ধি হোক। আমি যেন রজঃগুণ শূণ্য, পাপশূণ্য, জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে যাই!]

৫. "ওঁ পাণিপাদপায়ূপস্থ্ শব্দাঃ,
মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ মা—
ভূয়াসং স্বাহা!"

[আমার হাত, পা, পায়ূ, উপস্থ, শব্দ (বাক্য) সমূহের শুদ্ধি হোক। আমি যেন রজঃগুণ শূণ্য, পাপশূণ্য, জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে যাই!]

৬. "ওঁ স্পর্শরূপরসগন্ধাকাশানি,
মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ মা—
ভূয়াসং স্বাহা!"

[আমার স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আকাশসমূহের শুদ্ধি হোক। আমি যেন রজঃগুণ শূণ্য, পাপশূণ্য, জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে যাই!]

৭. "ওঁ বায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মানো,
মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ মা—
ভূয়াসং স্বাহা!"

[আমার বায়ু, তেজ, সলিল, ভূমি এবং আত্মনের শুদ্ধি হোক। আমি যেন রজঃগুণ শূণ্য, পাপশূণ্য, জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে যাই!]

তবে সেদিন ওই যে "**বিরজা-হোম**" হয়েছিল, কী দিয়ে তা' হয়েছিল, সে কথা আমি বলতে পারবো না। পাকী-মাল কী কাঁচি-মাল, তাড়ি বা গাঁজা অথবা ঘি,

তুলসী, আলো-চাল; কিছু একটা-দু'টো পদ সেদিন ছিলই। বোষ্টম্ মতে অথবা শাক্ত মতে— সে যে মতেই হোক না কেন, মন্ত্র কিন্তু একই।

ইয়াং ম্যান নিমাই with 12 young Gopal-men (BAL-GOPALS = শিষ্য) সেদিন শুধুই আলো-চাল আর তুলসীপাতা দাঁত কেটে, পুরীর দিকে কেটে পড়েছিল গৌরের সাথে মাথা মুড়িয়ে ওই ঘাটে; মাথায় আমার সেই ব্যাপারটা এতটুকু ঢুকেনি আজও! না হলে—যে লোকটা ডবকা ছুঁড়ি **বিষ্ণুপ্রিয়াকে** ছেড়ে গেল, নারীরা সন্ন্যাস জীবনে **'পায়ের গেরো'** ভেবে; সেইই আবার অন্য এক উড়িয়া **সেবাদাসী মাধবীর সায়া তুলে, ব্লাউজ খুলে** কী করে—পড়ে থাকতো **পুরীর গম্ভীরায়!** আলো-চাল আর তুলসীপাতার ওই বিকট কেরামতী আছে—কোন কেতাবেই তো সে বাৎ লেখা নাই! আমরা শালা কী গোরু আছি? বুঝি না কিছুই! নাকি নিমাই বলে চুপ করে থাকতে হবে?

তো সে যাই হোক, সে হলো ৫০০/৫৫০ বছর আগের ব্যাপার! বোষ্টমের কাসুন্দী, শাক্ত ঘাঁটলে-চটকালে—কার না তেতো লাগে! **রাধাগোবিন্দ মন্দির** আর তার শ্রীপাট, নিপাট ভাল মানুষের মতই সাক্ষী হয়ে আজও, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কাটোয়ায়। খাওয়া থাকার ভালই ব্যবস্থা আছে ওই শহরটায়! আর এপারে এ' শালা বনে-বাদাড়ে নির্জলা পড়ে থাকা, কাঁহাতক সহ্য হয়! মড়াঘাট বলে—আমাকেও কী মড়া হতে হবে? বরং মা কালীই আমার ভাল!

দু'চার পেগ্ টানলে—ও' শালী গাব গাছটার মগডাল থেকে, এখনও চচ্চড় করে নামে—নিশুত রাতে! খালি একটু খাঁটি তেল লাগাতে হয়—মাটির খুরীতে করে দু' পেগ পাকী-মাল আর দু'চার টুকরো মাছ ভাজা, আর গোটা একটা কচি পাঁঠা দিয়ে! আমার মত বুড়ো পাঁঠাকে তার পছন্দ নয়! রসকষ কিছুই নাই কিনা!

যখন জমবে নেশার ঘোর, তখন চেল্লাতে হবে সুর করে করে সংস্কৃত মন্ত্র, গমগমে গলায় আর তূরীয়-মেজাজে ঃ—

"ওঁ যোনিবিদ্যাম্ মহাবিদ্যাম্ কামাখ্যাম্ কামদায়িণীম্,
তৎসুসিদ্ধিপ্রদাম্ দেবীম্ কামবীজাত্মিকাম্ পরাম্!
ওঁ ক্লীং কামেশ্বরী মহামায়ে ক্লীং কালিকায়ৈ নমঃ,
কুল কুলাদিবিজ্ঞানে কালীর্নাম তয়োর্মতে!"

[কামনার বীজস্বরূপা দেবী, যিনি সমস্তই সুসিদ্ধি দান করেন, যোনীবিদ্যার

মত মহাবিদ্যা দিয়েই তাঁকে আবাহন করতে হয়! তিনি নিজেও কামাখ্যী-কামদায়িকা! কুলবিদ্যা-বিজ্ঞানে (নারী সম্বন্ধীয়) তাঁকেই মহামায়া কালিকারূপেই বলা হয়েছে! "ওঁ ক্লীং কালিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রেই তাঁকে ডাকতে হয়—কামেশ্বরী মূর্ত্তিতে!]

তিন জেলার **জ্যান্ত আর মরা ভূতেরা**, যুত করে শুনিয়েছিল সেই কিস্‌সা, গঙ্গার কুলুকুলু আবহসঙ্গীতের সাথে। গল্প শুনতে শুনতে রিক্সাভ্যান-লরী-ম্যাটাডর থেকে নামানো, মড়াদেরকে দেখতে থাকলাম—নিস্পৃহ দৃষ্টি মেলে মেলে। আজকাল আর '**কেঁধো**' লাগে না। ও'গুলো অচল এই যান্ত্রিক যুগে। কাঁধে করে বয়ে আনলে, তবেই না কেঁধো! লুঙ্গীটা গুটিয়ে, কোমরে একটা আলকাৎরায় চুবানো গামছার প্যাঁচ মেরে, এক বোতল করে **কাঁচি মাল** গলায় ঢেলে কাঁধে মড়া ঝুলালে; কাঁচা-কাঁচা বাঁশের-লগীতে বেঁধে—তবেই হওয়া যায়—**কেঁধো বা শ্মশান-বান্ধব**। ওই যে শাস্ত্রে বলে না ঃ—

"উৎসবে ব্যসনে চৈব, দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে,
রাজদ্বারে **শ্মশানে** চ; য তিষ্ঠতি—**স বান্ধবঃ**।"

আগের যুগে ওই সব হতো, পেটে ভাত নাই, পঁদে কাপড় নাই, মাথা গুঁজার ঠাঁই নাই যার; সে-ই হতে পারতো '**কোয়ালিফায়েড কেঁধো**।' সব ব্যাপারে কোয়ালিফিকেশন-টাই বড় কথা। বাড়ি বাড়ির খোঁজ রাখতে হতো প্রতিদিন—কে মরল, কেই বা টেঁসে যেতে বসেছে! দশকর্ম ভাণ্ডারের ফর্দ্দমালার মতো, তাদের কাছে থাকতো—**শ্মশান ঘাটের ফর্দ্দমালা** ট্যাঁকে গোঁজা। আর থাকতো সুতোয় বাঁধা, দেড় ইঞ্চি সাইজের ইংরাজ আমলের পেন্সিল—ডান পাশের কানে গুঁজা। সেই পেন্সিলটাকে আবার '**পয়া**' করে নিতে হতো, মড়ার মাথায় আর মা-কালীর পায়ে ঠেকিয়ে। সেই পেন্সিলে লেখা, **শ্মশান-ফর্দ্দকে** কাটছাঁট করার ক্ষ্যাম্‌তা '**ক্যুণ শালার**' নাই।

বৃদ্ধ **কদম-কেঁধো**, তার নাতিকে শিখিয়ে পারে না যে—শ্মশানটা হলো **মা কালীর সংসার**। মন্দিরে থাকলে, সে হয় মা-কালী। আর শ্মশানের কাজকম্ম সামলায় যখন, তখন সে হয়ে যায় **শ্মশানকালী**। সকলের '**উচ্ছগ্য**' করা, এক ভাঁড় করে **গুড়ের কাঁচি-মাল** গিলতে গিলতে; **হাঁচি আসে** যখন তার—তখন ও'পাড়ার '**নোদের আর মুর্শ্যিদাবাদের**' শকুন-বউরা; গলার লাল-লাল ফুলকো ঝালর দুলিয়ে, পেল্লায় ডানা ঝাপটে বলে উঠে, "বালাই ষাট, বালাই ষাট! রাড়ীর পো-য়েরা লিশ্চই লদীর জল মিশিয়েছ্যাল গ'! নাহ্লে বিছম্ লাগে! মা কালী, ত্যুর শস্যানে উদের মুকে লুড়া জ্যালা ক্যেনে! ত্যুকে ভ্যাজাল্ খেবায়! **উ শালাদের সাহসটো ত্য' বড় কম্ ল্যায়!!**'

কদম সোরেণ-এর মনের পুরাতন ঘা-টাকে, একটু অসাড় করতে—**আবার একটু খুঁচিয়ে দিতেও আলতো করে**, লাগে তারই **'উচ্ছগ্যু' করা** কাঁচি বোতলের ছিপিটা **খুলে 'প্যাসাদ'** করে দিতে। গলবস্ত্রের অল্টারনেটিভ **গল-গামছা** হয়ে, সেই প্যাসাদটুকু **'মাহা ছেদ্দায়'** পান করলো সে। তারপর কাঁদতে লাগলো সে **'হাপুস লয়নে।'** "আমার লাতিটোখে ত্যু উপদ্যেশ কর ক্যানে বাবা। উ শালা মাগী লিয়ে ঘুরে। মা-কালীর ঠেঁই আসতেঁ চায় না হেঁ—বাবাঁ!"

কদম কেঁধোর 'লাতি' কেষ্ট সরেণ। বুড়ো দৌড়ে গিয়ে, মড়া-পুড়ানো সেই কেষ্টোকে, গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে; ফেললো আমার শ্রীচরণে, **'এ্যাক্‌টা মোটা উপদ্যাশ'** করার জন্য। মাগীর পাল্লায় পড়লো যে, লেখাপড়া করলো না যে; মাল গাঁজা-চরস সঙ্গী যার সব সময়—আমি তাকে কী **'উপদ্যাশ্‌'** করবো?

আমি এসেছি আমার লেখার, উপকরণ যোগাড় করবার জন্য। এ' আবার কী ধরণের **গেরো**। বরকত মিঞাকে চোখ মারলাম আলতো করে। নদীর পাঁকে **পুঁতে রাখা** বোতলটাকে, আনতে বললাম কানে কানে। ফ্রিজের মত ঠাণ্ডা হবে, এতক্ষণ আছে কিনা! সে চলে গেল বিনা বাক্য ব্যয় করে।

কেষ্টো তার লিকপিকে শরীরটাকে নিয়ে, হাজির আমার সামনে। মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে সে। মুখ থেকে ছুটছে তার গাঁজা আর মদের গন্ধ। চোখ দু'টো তার কটকটে লাল। জোরে জোরে বার কতক হাঁকাড় মারলাম, গাবতলার সেই আসনে বসে বসে—**জ্যয় কালী, জ্যয় কালী, আয় শালী** রং-**বিরঙ্গীবালী**। উদ্ভট সেই সব খিস্তির শব্দে কেঁপে উঠলো—**কেষ্টো সরেণ।** ততক্ষণে এসে গেছে বরকৎ মিঞা। তার হাতের প্যাঁচে খুলে গেল সেই বোতলটা।

কপট রাগে আসন থেকে উঠে, মাথার চুলে মুঠো মেরে ধরে, তাকে **পেড়ে ফেললাম** গাব গাছের তলায়—আমার আসনের কাছে। গিলিয়ে দিলাম পেগ্ দুই মাল—**বিলাতী কারণবারি।** দু'বার হেঁচ্‌কী দিয়ে উঠে বসে, অসম্ভব রকমে মিইয়ে গেল সে। বললাম, "মা কালীর সন্তান তুই। আর সেই তুই নাকি শালা----গাঁড়-আলগা কোন্ মাগীর সাথে ঘুরিস? **কেঁধোর কাজ** আজকাল তুই নাকি করিস না? পাঁচ পুরুষের সুন্দর লোক-ঠকানো **ব্যবসাটার পণ্ডা মেরে দিলি?** তোর ঠাকুর্দার, দুঃখে হৃদয়টায় সুড়সুড়ি লাগছে! বুড়া-কেঁধো—কতক্ষণ আর সহ্য করে?"

খুশী হলো কদম-কেঁধো। ভালই **শিক্ষা** আর জব্বর উপদেশ-এর ঘটায়, বিবাগী তার নাতিটার যে **এতটাই সংস্কার হবে;** একথা বুড়ো ভাবতে পারেনি। সে শালা তার কোমরের কষি থেকে, আর নাতির প্যান্টের (মড়ার) পকেট থেকে, দলা-পাকানো কয়টা নোট বের করে; রাখলো আমার পায়ের কাছে।

হেঁকে বললাম, "যা আছে, সব দে শালা। মা কালীর কাছে **ফের লুকানো?** রেখে আয় মা-কালীর পায়ে। সে নিজে **গুণে দেখুক কত আয় তোদের হয়েছে। কম কম আয়, মা কালী পছন্দ করে না।** কম আয়ের কোন ছোঁড়াকে, কোন **মাগীই পছন্দ করে না।** মা-কালী তুষ্ট হলে, টাকাও আসে—গণ্ডা গণ্ডা ডবকা ডবকা মাগীও আসে।"

চলে গেল ওরা কালীর পায়ে টাকা রাখতে। ইসলাম মিঞাকে বললাম, চুপি চুপি গিয়ে সাঁঝ-ঘনানো অন্ধকারে, টাকাগুলো নিয়ে আসতে। যাবার আগে পান করলাম আমরাও কারণ-বারি। চলে গেল ইসলাম মিঞা বাঁদিক দিয়ে। লাট খেতে খেতে ওরা ফিরে এলো ডানদিক দিয়ে—মার **'আশীব্যাদ্'** চেখে-মেখে।

তিনটা সিগারেট জ্বালিয়ে ওদের দু'জনকে দুটো দিয়ে, আমিও একটা ফুঁকতে থাকলাম চুপচাপ। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো বরকৎ মিঞা। হাতে তার পরটা-ঘুগনি আর **মুরগীর টেংরির ঝোলের ভাঁড়**—ক্যারি-ব্যাগে করে। অতগুলো পরটার শ্রাদ্ধ কে যে করবে, বুঝে উঠতে পারলাম না। ওদেরকে বললাম, "এতক্ষণে মা কালীর টাকা গুণা হয়ে গেছে। যা ফিরিয়ে নিয়ে আয়!"

সামনে গভীর রাত। একটু পরে দু' একটা দোকান ছাড়া, সবই বন্ধ হয়ে যাবে। এ'সব ব্যাপার **প্রায়-স্থানীয়** মানুষ হিসাবে, বরকৎ মিঞা জানে বলে—তাই তার আগাম সাবধান হওয়া। পোড়া-পেটে কিছু একটা দিতেই হয়! আমি তার ওই আগ বাড়িয়ে কেনাকাটার, মনে মনে প্রশংসা করলেও, বাইরে বাইরে বললাম, "অতগুলো টাকা আবার খবচ করলে কেন, নিজের পকেট থেকে? একেই ছা-পোষা গরীব মানুষ তুমি। বৌমা-বাচ্চার জন্য কিছু একটা কিনলে, আমি কিছু বলতাম না!"

সে বললো, "বাবা, আপনি যা' **খেল দেখাচ্ছেন**, ওই দেখেই আমার চোখ খুলে গেছে। এতদিন পরে আমি, সত্যি একটা মানুষ দেখলাম। আপনাকে আমায় সেবা করতে দিন। অনেক পয়সা আমি আয় করি। দু' দিন না হয়—না হলো! আপনার **আশীর্বাদ পেলে,** অমন কত টাকাই আমি কামাতে পারবো। আর এই নিন ওদের দেড়শ' টাকা। ওরাই বা গেল কোথায় আবার?"

এ'কথার পরে তাকে আর কিছু বলা যায় না। বললাম, "ওরা মা কালীর কাছ থেকে, টাকাটা ফেরৎ আনতে গেছে। তুমি যখন আনলে, তখন তো ওরা খুঁজে পাবে না। কী না কী কাণ্ড করে বসে! তুমি বরং এই অন্ধকারের মধ্যে চলে যাও। ওরা যখন ফিরে আসবে, একটু পরে দলা পাকিয়ে, ওই নোটগুলোর সাথে, **আর ৫/৭টা নোট দিয়ে;** ওই ছোঁড়াটার **মাথায় ছুঁড়ে মারবে।**

তবেই ও' বুঝবে যে মা-কালীই, এই সব সব করেছে। টাকা গুণে দেখেও সে বুঝবে যে, তার টাকাটা মা কালীই বাড়িয়ে দিয়েছে! আমরা যে যাই করি না কেন, একেবারেই **পেকে গেছে** ওই ছোঁড়া—শুধরাবে বলে, মনে হয় না। তবুও এসো—চেষ্টা করে দেখি। আমাদের কাজই তো হলো—**মানুষকে শুধরানোর** সব রকম চেষ্টা করা।"

দেওয়ালের লাগোয়া চিতাটা নিভে গেছে। ধোঁয়া ছাড়া আগুন আর দেখা যাচ্ছে না। ভাগ্যিস হাওয়া আছে। না হলে টেকা যেতো না ওখানে। বরকত মিঞা চলে গেল দেওয়ালটার আড়ালে। ফিরে এলো ওরা হতাশ মুখে। বললো, "মা কালী সব টাকাগুলান্ লিয়ে চলে গেছে।"

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ওরা। **চুপকী-শেখানো** বরকৎ মিঞাকে, ঠারেঠুরে ডেকে বললাম, "মা কালী, ওদের টাকাগুলো ঝেড়ে দিলি? গরীব মানুষ ওরা। টাকাটা বাড়িয়ে, ফেরৎ দে ওদেরকে। না হলে তোকেই আমি ডুবাবো গঙ্গায়! আমার ভক্তকে **ঠকালি ত্যুই**? এত বড় সাহস তোর?"

দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা, বরকৎ মিঞা শুনছিল সব। সুযোগ বুঝে সে ছুঁড়ে মারলো, নোটের বাণ্ডিলটা দেওয়ালের এ'পারে। সেটা ছিটকে এসে পড়লো আমার কোলের উপর। সেটা তুলে দিলাম **কদম-কেঁধোর** হাতে। ঠকঠক করে কাঁপতে লেগেছে, দাদু আর নাতি।

মা-কালী এসে নোট ছুঁড়ে মারবে, এ'ব্যাপারটা স্বপ্নেই ভাবতে পারেনি তারা। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নোটগুলো দেখে, **দৌড়ে পালালো তারা—পেছন পানে তার তাকালোই না**! হাওয়ায় হাওয়ায়, উড়তে শুরু করেছে তখন নোটগুলো। অগত্যা বরকত মিঞাই সেগুলো কুড়িয়ে এনে, রেখে দিলো আমার জিম্মায়!

রাত নামছে গভীর হয়ে। একে একে নিভে যাচ্ছে বিকালের চিতাগুলো। বাস-লরী-টেম্পো-ভ্যানে করে ফিরে গেল, একে একে সকলে। **শ্মশান জেগে পড়ে** রইলাম আমরা দু'জনে—রাতের খাওয়া শেষ করে। মাঝারি রকমের কারণ-সেবাও হলো আমাদের। শরীরে জেগেছে এখন **নিশুত রাতের তান্ত্রিক মাদকতা**।

প্রতি কাজের এক **'তন্ময়'** আর **'মন্ময়'** এবং **'বাঙ্ময়'** পটভূমি থাকে। আমরা যারা শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াই, সেই বেটীর সাথে মোলাকাৎ করতে, অথবা তার সাকরেদদের সাথে দু'চারটা **গোঁফ-খেজুরে আলাপ জুড়তে**; তাদের ভাল করেই রপ্ত করতে হয়—**মন্ময়তা** বা Planning & Blue Print বানানো।

তারপর লাগে **তন্ময়তা** বা তন্নিষ্ঠতা। যার অন্য এক অর্থ হলো,

গভীরভাবে ডুবে যাওয়া সেই কাজে, যার Blue Print আগেই করে নেওয়া হয়েছে। ইংরাজীতে যাকে বলে Deep Concentration! আর কাজের যন্ত্র বা সাজ-সরঞ্জাম হলো—**বাগ্ময়তা** বা Eloquence, যাকে আমরা সংস্কৃতে বা বাংলায় বলি—**মন্ত্র** (Montrom)!

আর ওই শ্মশানভূমিতে পা দেবার আগে, নিঃশর্তভাবে সে বেটীকে আর তার কাজকে মেনে চলতে হয় এই জন্য যে ঃ- -

"মাসর্তুদর্বী-পরিঘট্টনেন,
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন;
অস্মিন্ মহামোহমায়ে কটাহে—
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তাঃ!"

মানেটা হলো এই যে—["এই মহামায়া, মোহময় কড়াইতে সূর্য্যস্বরূপ মহা এক চুলায় (সূর্য্যাগ্নিনা), (কাঠরূপী) রাত দিনকে গুঁজে দিয়ে (ইন্ধনেন), কাঠের হাতা (দর্বী) নিয়ে ঘটাং-ঘট্‌ঘট্ করে (পরিঘট্টনেন); মড়ার (প্রাণীসমূহের = ভূতানি) চচ্চড়ি নাড়ছে (পচতি)—এ'টাই হ'লো মূল কথা (ইতি বার্ত্তাঃ)!]

আমার মতন **সাধু-চদুর** ভাষায় মানেটা দাঁড়ায় এ'রকম যে ঃ—

[মাহামায়াঁর ক্যড়ায় সূয্যুর-পারা আগুনে, দিন-রাতের মতোন কাঠ্‌টো দিয়ে; কাটের (Wooden) হাতা-টো দিয়েঁ; (উ শালী—মা-কালী) ঘটাং-ঘটাং কোরাঁয় লাড়ছ্যাক বটে! মড়ার মাতা-গিলু দিয়াঁই স্‌চ্চড়ী বনাইছ্যাক্! টুকান লিব ক্যানে—উ তরকারীটো, জিবে ঠোকাই সাদ্ লিতে হবেক বটে! হুঁ, ইটাই হোল্যাঁ মূল্-কঁথা!]

হঠাৎ ধোঁয়ার এক কুণ্ডলী, 'মুণ্ডালী'-র মতো (like the beheaded one–ছিন্নমস্তা) ছেঁকে ধরলো আমাদেরকে (= আমি আর বরকৎ)! ভয়ে কুঁকড়ে উঠা বরকৎ-কে বললাম, "আব্বু, বলতে হবে না, তোকে! বল্ আমাকে—চাচাজী বা চাচ্চু! তারপর আমি দেখছি! ওই শালা—খান্‌কীর ছেলেদের মার... ... ...দ্ মেরে দেবো! থাক্, আমাকে আঁকড়ে ধরে। কোন শালারই ক্ষমতা নাই যে—আমাদের ক্ষতি করে। আমি শালা নর্ম্মদার ব্যাটা, আর তুই তার নাতি; ছেলের ঘরের নাতি! তোর কোন ক্ষতি হলে— আমি শালা ওই নর্ম্মদাকে পেড়ে ফেল্‌বো। একদম্ পুঁতে ফেলবো ওকে!"

তিন তিনটে জেলার মড়ার সংখ্যা একেবারে ফেল্‌না নয়। যখন গাড়ি ঘোড়া ছিল না, যখন হেঁটে হেঁটেই আসতে হতো মড়া কাঁধে নিয়ে; তখনই দরকাব হতো **'কেঁধোর'**। পাঁচ-সাতজন থাকতো দলে। থাকতো রাঁধার সরঞ্জাম, চাল-ডাল-তেল-মশলা-নুন। গঙ্গায় দিতেই হবে মড়াকে। না হলে মড়ার বাড়ির লোকেরা পবিত্র হবে না, **মড়ারও সগ্গবাস** হবে না। তিন চারদিন ধরে হেঁটে হেঁটে আনতে হ'ত মড়াকে, **'বল্ হোরি, হোরি বোল্'** বলে।

যাচ্ছে কালীর হেঁসেলে, বলছে হেঁকে হরিকে। হরিও মুচকি হাসি না হেসে, থাকে কী করে? অগত্যা সব সময় সব জায়গায়, কদম গাছ না পেলেও, বাদাম গাছ বা বটের গায়ে হেলান দিয়ে; বাঁশী ফুঁকতো সে হুইসেলের মত। মড়া তখন উঠতো কাঁচা বাঁশের চতুর্দোলায় হয়ে, **কেঁধোদের কাঁধে।**

ট্যাঁকে গুঁজা থাকতো ট্যাকা আর গাঁজা। আর শ্মশানের লম্বা **ফর্দ্দমালা**, থাকতো **হেড্-কেঁধোর** ট্যাঁকে। মড়া পুড়ানোর পরে সেই ফর্দ্দ অনুযায়ী টাকা-পয়সা, বাড়তি চাল-ডাল-আলু, তেল-নুন-মশলা **ভাগ হতো** সকলের মধ্যে। হেড্-কেঁধো পেতো **একটা ভাগ বেশী।**

কদম কেঁধোর **অশেষ দুঃখ** এই যে, সারা জীবন যে কাজটা মনপ্রাণ দিয়ে শিখলো সে; সেটাই সে **তার নাতি—কেষ্টোকে** শেখাতে পারলো না! তার **নিজের ছেলের মড়াটাও**, সে হেড্ কেঁধো হয়েই নিয়ে এসেছিল—এই 'মহা পবিত্ত উদ্দারণপুর ঘাটে'। ছেলেটা মরি মরি করেও যখন, মরতে দেরী করছে—রেগেমেগে কদম **বেদম শাসানি** দিয়েছিল **তার পেটের ছেলেকে।** সে নাকি তার খোঁজ-খবরদারীর কাজটাকে, **গুবলেট্ পাকাচ্ছিল** ক'টা দিন ধরে, **শেষ** বার **টেঁসে যাবার** আগে।

দূর দূর গাঁয়ে তাকে যেতে হতো, মড়ার খোঁজ-খবর করতে। সেটা সে পেরে উঠতো না, বাড়ীর মড়ার—ম্যাড়ার মত হালচাল আর গোয়ার্তুমির জন্য। যেদিন তার পেটের ছেলেটা, পটাস করে মড়া হয়ে গেল, সেদিনই মরলো ভিনগাঁয়ের আরও পাঁচটা মড়া। সবাই যদি দল বেঁধে মরে, তবে কদম কেঁধোর সম্বচ্ছরের আয় উপায়ে জল ঢালা হ'ল না কী! এই সাড়ে সব্বনাশের জন্য, মাথার চুলে মুঠো মেরে ধরে, সে তার উঠোনের তেতুঁলতলায় বসে ছিল অনেক ক্ষণ—ভাঁড় দুই পচাই খেয়ে, খই আর মুড়ির সাথে।

তারপর নিজেকে অনেক করে প্রবোধ দিয়ে, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে, তবেই সে উঠে পড়েছিল—গভীর একটা **নিঃশ্বাস** ফেলে। ফের সে কাঁদতে কাঁদতে ইংরাজ আমলের **দেড় ইঞ্চি** সাইজের, সূতো-বাঁধা পেন্সিল বাগিয়ে ধরেছিল **'শসান ফদ্য'** লিখতে। তবুও কী শালা নিস্তার আছে!

চাগিয়ে উঠেছিল আবারও তার কান্না, ছেলের টেঁসে যাবার জন্য নয়! বরং তার **বে-আক্কেলী কাজের জন্য**। কটা দিন **আগে কী পরে** মরলে, কোন **'মাহাভারতটা অসুদ্দ হতোঁ!'** সব কাজগুলো গুছাতে পারলে, তার ক'টা 'ট্যাকাও' হতো, আর ছ'মাস না হোক, তিন মাসের খোরাকী আর **'তম্বাক্'**-টাও হতো। **সবটাই কেঁচিয়ে দিল, ওই তার পেটের ছেলেটা।**

তাই সে কেঁদে কেঁদে, একটা **নিখুঁত ফর্দ্দ বানিয়েছিল**। একদম সুর করে করে—উদ্দের ফন্দ কত্তে পাল্লাম্ লারে **হিঁজল্**, ত্যুর ল্যোগা আজ আমার কাম্ লষ্ট'অ হঁল রে! ত্যু দু'টা দিন পরে মত্তে পারলি লা ক্যানে! ত্যুর ফন্দ আমু অখন্ বঁনাই লিছি রে-এ-এ **হিঁজল**! ট্যুকান্ **উঠে এসেঁ দেখে-বুজেঁ লে ক্যানে**! ম্যুই ত্যুর **বাপটো হোয়্যাঁ** কী **ভুল ফন্দ** বনাইতে পারি?

নিজেকে **ফাইন্যাল প্রবোধ** দিতে আবারও সে, ভাঁড়ের বাকী পচাই-টা গলায় ঢেলে, বাঁ হাতে সেই ফর্দ্দটা ধরে **লাষ্ট্ রিভাইজ** করে, তবেই **'সন্তুষ্টির'** মাথাটা নেড়েছিল। অনেক হিসেব নিকেশের ব্যাপার কিনা!

(১)	হেট্ কেঁধো (Head)	... ...	শিরি (শ্রী) কদম কেদো
	সাথী "	... ...	পান্তা লবু
		... ...	চূরেল হ্যামরম্
		... .	লখ্যি জনাদ্যন
		... ...	লয়ন মেজেন
		... ...	পটাই ঘুস্
		... ...	আমড়া টুডু
(২)	চাল	... ...৯ সের	
(৩)	ডাল	... ...৫ সের	
(৪)	নবণ	... ...আদ সের	
(৫)	ত্যাল (খাটি)	... ... ২ সের	
(৬)	তম্বাক	... ...২ সের	
(৭)	হুঁকা	... ...২টা	
(৮)	মুড়ি-খই	... ...১ বস্তা	
(৯)	আলু-প্যাঁজ	... ...১ বস্তা	

(১০)	কচু	… … …১ বস্তা
(১১)	গুড়-আঁকের	… … … ২ নাদা
(১২)	গাজা	… … …১ ছটাক
(১৩)	বিড়ি	… … …২০ তাড়া
(১৪)	ভাঙ্গ	… … …১ পুয়া
(১৫)	কাঁচি মদ	… … …৪ কলসী
(১৬)	আড়াঁই হাতি গামছা	… … … ১৫ খানা
(১৭)	বাবলা-আম কাট	… … … ২ বজা
(১৮)	কুড়াল	… … …১টা
(১৯)	কাটারী	… … …১টা
(২০)	ট্যাকা	… … …১ কুড়ি, ৩ ছ্যাদাম্, পৈষা
(২১)	রাঁদুলি মাগী	… … … ২ জন

ইতি ফদ্য শ্যাস

ওং মাঁ-শসাণ কালী।

"= ৭ জন হো-ছ্যাঁ! অগাদ্ পৈসা লাগব্যাক্ বটি! হেঁ—মা-খালী ম্যুর ব্যাটাটো মরে যেছেক্ গ্য'! ত্যু বুজেঁ লে ক্যানে!

= ঈ শালা, রাজা-বাদশার ফদ্য হোলঁ বটে!

৫ টো গাঁ-খে দেখিয়ে দ্যুব ঝে, আম্যি কীপ্যান হৈনি, ব্যাটার মড়াটো পুড়াবার ত্যরে!"

কোন চ্যাটার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট্ হয়তো, সড়াৎ করে ভিরমী খেতে পারতো। আমি ভিরমী খেতে খেতেও খাইনি। কেননা পুরানো হিসেব আমার ভালো মতই জানা ছিল। ওই পেল্লায় ফর্দ্দ, আর তার বহর, এবং বাহারী হাতের লেখা, পড়তে আমার প্রায় আধঘণ্টা লেগেছিল।

এতটাই আমার সান্ত্বনা হয়েছিল যে, হিঁজল সোরেণের অন্ততঃ গঙ্গাপ্রাপ্তির ব্যাপারে। তার **ধার্মিক বাপ কদম সোরেণ** কোনরকম কার্পণ্য করেনি। দুঃখ শুধু তার আর আমারও বটে যে—দু'টো দিন আগে বা পরে মরে, সে **দেখিয়ে দিতে পারতো** গোটা গাঁ-কে যে, হিঁজল একটা **'বাপের ব্যাটা বটেক!'**

পাড়ার কতকগুলো লেড়ীকুত্তা, শ্মশান-যাত্রী হবার আশায় ঘুরঘুর করতে,

কদম কেঁধো তাদেরকে সাফ কথা বলে দিয়েছে, "ও' টি চল্‌বেনী বাপেরা! লিজের ব্যাটার মুর্‌দা-লাশ্‌টা ফ্যাল্‌বনি খালে-খন্দে-লালায়! তু্যরা খেবার চাইলে পাবি লা. **পুতের মাংস ভূতে খেলে—কার সজ্যঁ হঁয়!"** একেবারেই হক্‌ কথা। মড়া বলে কী তার জন্য, স্নেহ-ভালবাসা থাকতে নাই। নেহাৎ ঘরে রাখা যায় না—তাই!

এখন রাস্তাঘাট হয়েছে, গাড়ি-ঘোড়া হয়েছে, দোকান পশরাও প্রচুর। তাই আর ওই সবের বালাই নাই। দিনে দিনেই মড়া পুড়িয়ে, গঙ্গায় চান করে, যে যার বাড়ি চলে যায়। এহেন শ্মশানে রাত কাটাতে চেয়ে, ফেল (fail) করেছিলাম—একটা মহৎ কারণে যে, থাকার জায়গা না থাকলে—থাকি কোথায়?

অচেনা জায়গা। চোর-ছিনতাইবাজের ভয়ই বেশী, **ভূতের ভয়ের চেয়েও।** তাই একটা পবিচিত লোক দরকার ছিল. যে কিনা আমার ওখানে থাকার একটা নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা করে দিতে পারতো। না, সে রকম ব্যবস্থা, সেদিন হয়ে উঠেনি!

আমাব High court-এর অফিসেই, একটা ছেলে কাজ করে। নাম তার **অতীন মজুমদার।** কাটোয়ায় তার বাড়ি। খুব নাম ডাক আছে ওই ফ্যামিলির। উদ্ধারণপুর তার ঘর-ঘাটকুল। সব লোকজনকে সে চেনে জানে আর সবাই তাদেরকেও চেনে। পরম নিশ্চিন্ত করে, সে আমাকে বাতেলায় উদ্ধারণপুরের **মড়া ঝুলানো** গাছে তুলে—মইটা চুপিসারে কেড়ে নিয়েছিল, ২০০৭ এর ২০শে জুন।

না, ওখানে বাত্রে থাকার কোন ব্যবস্থাই হয়নি, খাবার ব্যবস্থা তো দূরের কথা। আমি শ্মশানচারী মালখোর একটা পাঁঠা বুঝে, কেটে পড়েছিল **শ্রীমান অতীন কুমার মজুমদার**—এ'টা আমি ওই **মিষ্টি মিষ্টি অনাসৃষ্টির পেল্লায় থাপ্পড়** খাবার পর, বহুৎ গবেষণা করে অবশেষে বুঝতে পেরেছি।

আবার সুযোগ এলো, ২০০৭-এর নভেম্বর মাসে। কেতুগ্রামের **মড়াঘাটের বহুলা মন্দিরের** দিকে, কেউই নাকি রাস্তা মাড়ায় না—**ঈশাণী নদী** পেরিয়ে। তো আমার মত এক ম্যাড়া, ত্যাড়া মেজাজে সেখানে ক'টা দিন কাটিয়ে, যখন ফিরছিলাম—তখনই ওই বেটী কালী চিনিয়ে দিয়েছিল, এই **বরকৎ মিঞাকে।**

অংকের হিসাবে আমি হলাম কালীর মেয়ের ঘরের নাতি—নাম আমার **প্যামানন্দো।** শুকুর আলির ব্যাটা বরকৎ আলিকে, সে তাই চ্যালা বানিয়ে **'সেথো'** করে দিয়েছিল; বিরাট এক কৌশল করে—**তেঁতুল গাছের পেত্নী হয়ে।** বড় আজব তার খেলা—জবাব নাই যার!

পেয়ে গেলাম এই বরকৎ মিঞাকে। **আশ্রয় আর মুরগী-অন্ন,** দুটোই সে সাপ্লাই করলো আমাকে। এখন সে আমার শ্মশান-সঙ্গী—ভৃঙ্গীর মতো। ভয়ডর

একটুও নাই—ডাকাবুকো এক তরতাজা ইয়ংম্যান। ধ্যান-জ্ঞান তার এখন আমাকে সামলানো। **ভূত ধরা সে শিখতে চায়** আমার কাছে—এটা তার মনোগত নীরব ইচ্ছা।

দু'টো দিন রিক্সা চালানো বন্ধ রেখে—ওই দু' দিনেই সে **প্রেত-সাধনায় সিদ্ধিলাভ** করতে চায়। ওটা আর এমন কী **কঠিণ বিদ্যা!** একেবারে Nuclear Physics তো নয়! তা'—ইচ্ছেটা তার ভালই বলতে হবে। কেষ্টো কেঁধোর মতো, সে তো আর মাগী ধরতে চাইছে না! মা কালীকে ধরা কী খারাপ কাজ?

বৈষ্ণবদের মতো সে **পরকীয়া সাধনাও** করতে চায় না। সে চায় একেবারে নিরেট নির্ভেজাল **প্রেত-সাধনা, কিংবা জীন-পরী** হলেও তার এতটুকুও আপত্তি নাই। খালি আল্লার দিব্যি দিলেই যেন—সেই ভূত ব্যাটা, সড়াৎ করে এসে সেলাম ঠুকে, ইসলাম বরকৎ মিঞাকে।

বৈষ্ণবদের এই ঘাটের, **জবরদখলী স্বত্ত্ব** এখন মা-শ্মশানকালীর। তার উপর যদি **মুসলমানের আল্লার নজর পড়ে,** তবে কালীতে আর আল্লায়, পেটা-পিটি বেধে যাবে। তাই দেখে হিঁদু-মোছল্‌মানও, হাত গুটিয়ে একটুও বসে থাকতে পারবে না। **ধর্মের কল, বাতাসে** 'লড়বেই'! এই লড়ালড়িতে মড়ার খুলি গড়াগড়ি দিলে, খেলাটা অবশ্যই যোল আনা পূর্ণ হবে।

এসব বুঝে শুনে **গৌর-নিমাই** মাথা কামিয়ে এই ঘাটে, শিষ্য-ভক্ত নিয়ে কেটে পড়েছিল পুরীর দিকে। তার দেখা-দেখি **কবি জয়দেবও, তার রাধা-বিনোদকে** নিয়েও চলে গেছলো পুরী; আর ফিরে আসেনি। এটা এখন **মা কালীরই রাজত্ব**। আল্লার ভক্তরা এখানে **হল্লা মচাবে,** সেটা মা কালীর সহ্য নাও হতে পারে।

রাগের বশে যদি, দু' বোতল **পাকী-মাল্‌** ফুঁকে দিয়ে—সে ফোঁস ফোঁস করে উঠে, তবে আমারই **শব-সাধনার** সবটুকুই সাবাড় হয়ে যাবে। অতএব সমঝে চলো। মাঝে মাঝে গলা ঝেড়ে, আকাশ পানে মুখ তুলে শুধু "জয় কালী" বলো।

তবে কিনা মা কালী—বড়ই **দয়াবতী ভদ্রমহিলা**। মাল্‌-ফাল টানলেও, মনটা তার কখনো-সখনো **'দরাজ' হয়।** সেই সুযোগে সে যদি, তার **খাস্‌ কোন পেত্নীকে,** বরকৎ মিঞার হাতে তুলে দেয় **বাঁদী করে,** তবে তার কপালটাই বেমালুম খুলে যায়। তাই তাকে বললাম, "মা কালীকে **'দিনটা-দুই'** ডাক ভাল করে। একটা না একটা **'ব্যবস্থা'** হয়েই যাবে।" সেও সেই একান্ত ভদ্রস্থ সুন্দর ব্যবস্থা, মাথা হেলিয়ে মেনে নিয়েছে।

বোষ্টম্‌ ধম্ম আর **মা-কালীর ধম্ম**—সব শালাই এক। একদল **'সদরে'** বেলেল্লাপনা করে, অন্য দল—**'আড়ালে'** করে। দুই শালারই চাই মাগী। মাগী যদি

'ত্যাঁদড়-বাঁদর' হয়, তবে তার ঠ্যাং-এ পড়বার দরকার হয়—'**দেহি পদপল্লবম্ উদারম্**' বলে। আর অন্য দল বলে, '**বলাদাকর্ষয়**'! অর্থাৎ **ঘাড় ধরে অথবা সায়া ধরে** টেনে আনো, বৌ-ঝিকে জোর করে। আসবে না মানে? ওর চৌদ্দ পুরুষ আসবে।

মা-কালী কী সারা রাত শ্মশানে, **গজী-কোট্ বা এক্কা-দোক্কা** খেলবে না কি? 'ধর তক্তা—মার পেরেক' গোছের কথা। সংস্কৃতে বলে—**বলাদাকর্ষয়**'! Apply force make her naked and she shall be bound to come; without any hissing! একদম্ No ফোঁস-ফাঁস!

শ্রীকৃষ্ণ পায়ে ধরে, রাধাকে করতে পেরেছিল তার সাধন-সঙ্গিনী। নিমাই কেঁদে কেঁদে হয়ে গেছলো রাধা; মিথ্যা পুরুষত্বের পণ্ডা-মারা গেছলো তার। রাধাভাবে ভাবিত হয়ে; আরোপিত সঙ্গম-সংশ্লেষে উপভোগ করতো স্বর্গীয় আনন্দ নিমাই অহরহ। আর তাইই গড়ে দিতো, তার ঈশ্বরের সাথে নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় একাত্মতা! এই মনোভাব আর অনুভূতি তার, একদিনে গড়ে ওঠেনি।

বছরের পর বছর, শিশুকাল থেকে যৌবন পর্য্যন্ত এই ভাবের অনুশীলন—যেমন জ্ঞান আর অনুভবের উন্মেষ হয়েছে, চলার-বলার পথও বদলেছে তার সেই ভাবেই। না হলে—ইতিহাসে যা পাই তা'তে জানতে পারি, নীল সাগরের জলকে নীলকৃষ্ণ ভেবে—তার বুকে ঝাঁপিয়ে অশেষ সঙ্গমসুধা উপভোগের আকাঙ্খায়; ঝাঁপ দিয়েছিল আমাদের নিমাই! গুলি মারি শালা, বিচিহীন বাংগালীর প্রলাপকে। "উড়িয়ারা নাকি মেরে দিয়েছে তাকে, গম্ভীরায় মাধবী-দাসীকে একযোগে সকলের গণ-সঙ্গমের জন্য!"

আরে ধ্যুর! সে নিজেই সঙ্গমিত (fucked) হ'তে চাইতো—বাঁধহীন-বাধাহীন সঙ্গমের রেশে! মানসিক পটভূমিটাই তার, এমনি ধরণে বদলে গেছলো। পুরুষ হিজ্‌ড়েরা যে কারণেই মেয়ে-মেয়ে সাজে! ইচ্ছেটা এই যে, যেমন আছি—তার থেকে নূতনতর এক অনুভবের দোর-গোড়ায় যাওয়া! নূতন কোন এক অনুভবে ডুবে যাওয়া। সে জন্য চুলোয় যাক সব পরিচয়, চুলোয় যাক ফালতু সমাজ-কুল-মান্।

আর এমনি করে বিবাগী হয়েছিল বলে—শ্রীরাধা, বড় নির্বিশেষ এক বিন্দুতে পৌঁছে (reaching at the zenith point)—লীন হয়ে গেছলো কেষ্ট মিঞার সাথে। আর তাই সে থাকে, সব দেবতার মাথায়—কেষ্টর বাঁ-পাশে—তার সেই তল্‌তা বাঁশের চঙ্গা (blow pipe) বা বাঁশীকে আঁকড়ে ধরে!

স্বকীয়া সাধনা? কোন শালায় বলে? নিজের বৌ-এর কাছে, কোন্ ব্যাটা তিন দিন শু'বার পর; চতুর্থ দিনে মশারী তুলে ঢুকে? মামদোবাজীর গপ্পো? আমরা...

... ...বাপ্পোৎ... ... ...কিছুই বুঝি না নাকি, এ্যাঁ! 'হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল!' আরে ওই যে সেই—থ্যুত্তোর নিকুচি করছে—শালা, ঠিক সময় ঠিক কথা মনে আসে না!

সেই যে সেই জয়পুরের মহারাণা জয়-সিং বলে কিনা—পরের মাগী লিয়ে সাধ্না একদম্ নাহ্ করল্ বা! পরের বৌ-মেয়ে না হলে, প্রেম জমে কী করে? এ' শালারা তো, ধরি মাগী—না যাই বেশ্যাবাড়ীর মত 'কতা ব্যুলছ্যাক্ গ্য!' গলায় দড়িটো দিবার লাগ্যে বটে!

লিজের বৌ লিয়ে সাধ্না হবেক, লা—লুকের বৌ-মেয়েটো লিয়ে সাধ্না হবেক্ উ কথাটো পোরিষ্কার হবার দরকার আছে বটে! উ শালা রাজা জয়-সিং কি কথা বুল্‌ল (অ্য) গ'! ফরমাণ্ পাঠাইঁল সারা দেশে। বিচার হোলঁ বটে! দলিল ল্যাখা হোল্য ক্যানে! লবাব্ জাফর কুলী খাঁর (Zaffar-Kul-E-Khan) অর্ডারে। মাগী থাকবে কী মাগী যাবে—সেই কথাটো লিখা হোলঁ! বুজ্‌ছনি!

সভাপতিঃ নবাব জাফর-কুলী খাঁ (Zaffar-Kul-E-Khan)

গণিতাচার্য্য	জ্যোতিষাচার্য্য
এক'দিগে রৈল (অ) ঃ (One side)	অন্য 'দিগে রৈল (অ) ঃ (The other side)
(ক) কৃষ্ণদেব আচার্য্য (স-শিষ্য),	(ক) কাশীর (Benaras) পণ্ডিত সম্প্রদায়
(খ) শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ,	(খ) শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম ভট্‌চায্ (নবদ্বীপ)
(গ) শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ রায়,	(গ) তেলেঙ্গীবাবা—রামজয় মহারাজ।

এই সকলের উপস্থিতিতে লেখা হলো এই যে ঃ—

"আমরা নেতাই-গৌর-বাবার মতামতটো লিছি। লবদ্বীপের কেষ্টরাম ভট্‌চাযী আর তেলেঙ্গীর রামজয়-বাবা; সঁনা-গাঁর—শ্রীযুক্ত শ্রীরাম বিদ্যাভূষণ, শ্রীরী, নোক্কী ভট্‌চায্, লয়নানন্দ ভট্টাচায্—উপস্থিত ছিল সিখানে।"

স্বকীয়া আর পরকীয়ার—ছ্যাঁছড়ামি, কাটোয়ার মালিহাটি গ্রামে, মাসের পর মাস হাজার পণ্ডিতের তর্ক-ঝগড়া, সংস্কৃত-ঝাড়া, ব্যাকরণ-পাণিণী-ডিক্সনারী দেখা পণ্ড হয়ে গেল—যখন ঝরঝর করে কাঁদতে শুরু করলো সভায় বসে, কৃষ্ণদাস

আচার্য্য। ওই একটাই কথা— "**প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে, প্রতি অঙ্গ মোর**" (For every limbs of thine, twitch each of naine)।

বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাসের পর মাস, বিরোধিতা মিইয়ে গিয়ে—বরফের মত গলে গেল কৃষ্ণদাসের মন। শরীরের কোথায় যেন এক **বিরহের সুর বাজে**, ঠিক ধরতে পারে না সে। রাধাভাবকে বিচার করতে গিয়ে, পরকীয়া প্রেমকে বিচারের মানদণ্ডে মাপতে গিয়ে—**হারিয়ে যেতে শুরু করেছে** সেই ভাবের মধ্যে। এখন আর সেই **ত্যাড়া-বিরোধী ভাবকে** সে খুঁজে পাচ্ছে না। হেরে গেল কৃষ্ণদাস। জয় হলো **পরকীয়া-ভাবের।**

শ্মশানে লতাসাধনা, শক্তি-সাধনা, কুল-সাধনা, কায়া-সাধনা, গোপী-সাধনা, বাউল-সহজিয়া; সাধনা সবই রয়ে গেল আগের **মতই। এক** হাতে তালি বাজে না—**একা কিছু হয় না। ভগবান তাই 'জোড়' সৃষ্টি করেছে। সে নিজেও তাই জোড়ের মধ্যেই থাকে। সে বিজোড় বা একা নয়! নিমাই তাই পাগল হয়েছিল, তার ক্ষুদ্রতা থেকে বেরিয়ে—সুবৃহৎ এক শক্তির সাথে মিশে যেতে।**

সেই **শক্তি হলো, পরম এক শক্তি**—কালো-নীলে মেশা—কৃষ্ণ-কাহ্নাইয়া। আর তার তরল-তড়িতবিজড়িত রূপই হলো—**কালী। কেষ্ট সৃষ্টি করে জীবকূল, আর যখন সৃষ্টি ভরে যায় অনাসৃষ্টিতে—-তখন কেষ্টই কালী আর কাল হয়ে জীর্ণজরাকে পুড়ায় শ্মশানে। তখন সে হয় রুদ্ররূপা, রুদ্রের সাথে হাত মিলিয়ে। ষোল হাজার গোপিনী নিয়ে কেষ্ট যদি পরকীয়া সাধনা করতে পারে, আর তাই নিয়ে যদি রচিত হয় লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণব প্রেমের কেচ্ছা বা কেতাব; তবে ভৈরবী-মাগী নিয়ে শ্মশানে মাল টানলে,** মা-কালীকে ডাকলে—সকলের পঙা জ্বলে কেন?

যেমন কাজ—তেমনই তার **'জোগাড়ে' বা হেল্পার।** মড়া পুড়াতে কী—কেষ্ট আসবে গোপিনীদের নিয়ে, রাজধানী এক্সপ্রেসে করে—'বেন্দাবন থেঞ্ঞে?' মা-কালীর ডাইনি-পেত্নি-ভূত, শিবের হামদো-মাম্‌দো-বেম্মদত্যি না হলে—মড়া কে পুড়াবে শুনি? নাকি কাটোয়ার বোষ্টম-বাবাদেরকে ধরে **'লিয়ে আসতে হবেক? সি কথাটো পোরিষ্কার হবার লাগে!'**

নামছে রাত হেমন্তের হিমের সাথে, আধ-নেভা চিতার ধোঁয়ার সাথে। শরীরেও ভর করছে পাকী মালের নেশার ঘোর। গাব-গাছটায় হেলান দিয়ে, ঝিমোতে লাগলাম আমি। গাছের উল্টো পিঠে বসে বরকৎ মিঞা বিড়ি ফুঁকছে। ছল্ ছল্ ছলাৎ করে মাঝে মাঝে শব্দ ভেসে আসছে, গঙ্গার বয়ে যাওয়ার। জানিয়ে যাচ্ছে যে, সে চলে যাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে। তার দু'চোখ তন্দ্রাহারা। কবে কোথায় যে সে, **বিষ্টুর পা গলে গোমুখ থেকে বেরিয়েছিল, সেই থেকে তার চলা শুরু।**

মন দিয়ে কান পেতে যে খানিকটা আরাম করে শুনবো তার জো-টি নাই। শেয়ালের তবুও খানিকটা লাজলজ্জা আছে। এ' শালার খেঁকী কুত্তাদের সেটুকু ভদ্রতা-বোধও নাই। অকারণে মারামারি কামড়া-কামড়ি করবে—একদম গায়ের কাছে। ব্যাটাচ্ছেলে শকুনগুলোও হয়েছে ওদের দোসর। মড়ার বাড়ির লোক কাঁদে, না ও' শালারা চেল্লায়—বুঝে উঠা দায়!

পোড়া মাংসের গন্ধ, মাথা ফাটার শব্দ। সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা **মুণ্ডহীন-অনুভূতিশূন্য জীব** বলে মনে হয় নিজেকে। মাঝে মাঝে মনে হয়—এই মনটাকে শালা তুলে নিয়ে, ফেলে দিই রাজাবাজার বা ফুলবাগানের কসাইখানার গলিতে; যেখানে পেল্লায় উনুনে মোল্লারা গরুর মাংসের **শিক-কাবাব** বানায়! অন্ততঃ তা'তে মশলার গন্ধটা থাকে। **এ' শালার গন্ধ বড়ই নিরামিষ!**

অন্ধকারের ভেতর কারা যেন হাঁটে চুপি চুপি। ভূতের ভয় আমার নাই। অনেক ভূতকেই আমি চরিয়েছি **বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে**। এরা অবশ্যই কিম্ভূত হবে। উদয় হলো জোড়ায়—একটা **বিলাতী বোতলের** সাথে, গোটা দু'টো মুরগীর কষা মাংসের জামবাটীসহ। **"ঘর থেকা চলে এলাম গ' বাবা, তিষ্ঠাতে পাল্লাম্ না। শ্বশুর খায়, ভাতার খায়, দু' দেওর খায়—একটা শরীরে কত আর সজ্জ হয়! মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারিনি ক'টা বচ্ছর। ছেল্যা-পিলা হোল-নি। শরীট্টো অখন উরাই ভোগ করে। পায়ের ধুলো এট্টু দাও বাবা!"**

এই হলো তার মনের ব্যথা। চিতার মৃদু আলো, আর রাতের তরল কালো মিলিয়ে, মনে হলো—মা কালীই বুঝি নেমে এসেছে, গাব গাছটা থেকে। রাতের আঁধারে না এলে, **পাঁচজনে যে পাঁচ কথা বলবে!** কী বলবো তাকে বুঝে উঠতে পারলাম না। তার ওই বাঁজা শরীরটা, শ্বশুর-ভাতার-দেওররা যৌথ ভাবে নাকি ভোগ করে। তো—আমি তার কী করতে পারি?

বিবাগী হয়ে সে যার হাত ধরে বেরিয়ে এলো; তার যে হায় **গোঁফই গজায়নি!** চারজনের বহু পরিশ্রমেও যার পেটে, কোনদিনও একটা বাচ্চা এলো না; কার ঘরের বাছার মুড়োয় কামড় মেরে—এই নারী ঘর ছাড়লো. তার কী দশা হবে, সেটা ভেবে মনে মনে—**নিজের মধ্যেই আমি সিঁটিয়ে গেলাম!**

হায় নারী, তোর খুরে খুরে গড় হই মাগো! এ' তোর কেমনতর রূপ নিয়ে হাজির হলি মা! মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে আমার। পেছন পানে গাব গাছটার আড়ালে, ট্যারা চাউনি মেলে দেখলাম—ইসলাম বরকৎ মিঞা গায়েব হয়ে গেছে। তার টিকিটাও আর দেখতে পাচ্ছি না। এখন আমার বোতল সাপ্লাই কে করবে, সেটাই ভেবে উঠতে পারলাম না।

আবার অমন **লক্ষ্মী খদ্দেরকে** ভাগিয়ে দিতে মন চাইলো না। অগত্যা সেই ওদের আনা বিলাতী বোতলটায়, প্যাঁচ মারতে বললাম সেই **'লাতি'টাকে;** যে কিনা এসেছে ওই মা-কাকীমার বয়সী মেয়ের সাথে, রাতের আঁধারে; এই কড়ারে যে— **অবশ্যই একটা বাচ্চা তাকে উপহার দেবে; একটা বচ্ছরের মধ্যেই!**

গড়ে দেবে তাকে ঘর-দোর। কয়লা খনির কুলী-কামিনের কাজ করে সে। কয়লার ব্যবসাটায়ও, সে লাগিয়ে দেবে ওই মেয়েকে। আসানসোলের পানে সে জায়গা দেখে রেখেছে—শাল-মহুয়ার জঙ্গলের মধ্যে, সুখে ঘর বাঁধার জন্য। এখন একটা জবর রকমের তাবিজ, করে দিতে হবে আমাকে, ভূতের হাঁচি-হাড় আর হাসি মিশিয়ে; শ্যসান্‌কালীর কীপায়।

আগে থেকেই তারা একটা রূপার মাদুলী কিনে এনেছে, লাল লাল ঘুন্‌সীতে বেঁধে, যার ভেতর ওইগুলো ঢুকিয়ে—**'মম্-গালা'** দিয়ে মুখটা, চিরকালের মত বন্ধ করে দিতে হবে। বহুদিন ধরে তক্কে তক্কে থেকে— তবেই নাকি আমার মতো **'পিথীবী-বিক্যাত'** সাধুবাবাকে ধরতে পেরেছে। আমার কোন **'ওজরাপত্য'** ওরা শুনবে না!

ততক্ষণে খুলে ফেলেছে সেই ছোঁড়া, বোতলের ছিপিটা কড়কড়িয়ে। গলায় ঢালবার আগে, যাদের পাড়ায় আমার রাত্রিবাস, তাদেরকে দিলাম খানিকটা **'উচ্ছগ্ন'** করে। তাদের মালকিন্‌কেও দিলাম **ভাঁড়ে করে**—যদি নাকি সে তার কোন চ্যালাকে, ঢুকিয়ে দেয় **লেট্টু কাহারের** তাবিজের ভিতর; আজীবন **'দ্যাহরক্কী'** (Body guard) করে। ক্যান চিন্তার বিষয় আর থাকবেনি! সত্যিই যুক্তিপূর্ণ একখানা কথা। মনের ব্যথা জুড়াবার জন্য, গলায় ঢাললাম একেবারে তিন পেগ্—বেগ আনতে তাড়াতাড়ি। না হলে ওই **রাঁড়ীকে সামলানো দায় হবে!**

দু' খণ্ড করে মাংস, পড়ে থাকা পরোটার উপর চড়িয়ে, ভাঁড় দুই করে Raw মাল গিলিয়ে বললাম, "বাঁশতলার ও'ধারে এই প্যাসাদ খে গে যা। অখন্ ভূত লামাই লিব, উয়াদ্যার সাথে কথা ব্যলব—কত্ত্য কাজ! দেখিস, আঁধ্যারে ব্যেগ্ চাঁপলে য্যান (অ) চড়ে বসিস্ না! যাঃ যাঃ পালা, মাদুলীটো রেঁখে যা ক্যানে! উতেই ত্য' ভূৎটোখে পুরবার্ লাগব্যাক্!"

চলে গেল ওরা, পরটা আর মাংসে কামড় মারতে মারতে, টলতে টলতে। আর ওই শালা বরকতের হরকৎ, একদম সহ্য হচ্ছে না। কোথায় গিয়ে ঘাপটি মেরেছিল কে জানে! এবার উদয় হলেন তিনি। হাতে তার বিরাট এক রুইমাছ, আর গোটা তিনেক কাঁচি-মালের বোতল।

সে নাকি ঘাটে বসেছিল—আঁধারে! লম্বা মতন একটা লোক এসে, তার হাত

দিয়ে—সাধুসেবা আর মা কালীর ভোগের জন্য দিয়ে গেছে। ফস্ করে তার প্রশ্ন, "উরা চলে যেছেক?" বললাম, "না, ওই বাঁশতলার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। কয়টা পরটা আর একটু মাংস ওদের দিলাম। লে শালা, এগুলো এবার সাবাড় কর। আমি একা আর কত খাবো? এখন এই 4/5 কেজি মাছ নিয়ে কী করি! শেয়াল-কুত্তারাও আজ Strike করেছে নাকি? একটাকেও কেন ধারে ভিতে দেখছি না?"

দু'জনে মিলে সাবাড় করে দিলাম জামবাটির মাংস। বাকী মালটুকু দু'জনে গলায় ঢেলে—হাততালি দিলাম, ওদেরকে ফিরে আসবার জন্য। ওরা এলো টাল খেতে খেতে! ছোঁড়াটার কোমরে প্যান্ট থাকলেও, নারীটার শরীরে নাই কিছু। ভিরমী খেতে গিয়েও খেলাম না। রেগে বললাম, "ফ্যের শালী ল্যাংটো হঁইছিস? মা কালীর সাথে একদম গুলিয়ে গেছিস? কাপড়টো ত্যু পর আগে।" সে কেঁদে উঠে বললো—বাঁশবনের পেত্নীটো লিয়েঁ লিছেঁ গ্য' বাবা!"

বাঁশবনের পেত্নি তার শাড়ী-সায়া-ব্লাউজ খুলে নেবে, এ'কথা মানতে মন সায় দিল না। মনে হলো—দাল্-মে কুছ্ কালা হ্যায়! শুঁড়ীর সাক্ষী মাতালের মতো কোকিল-চোখো লেট্টু কাহার, বাহারী টেরী হেলিয়ে বললো, "হঁ-হঁ, আমি দ্যাখ্ল্যম্ বটে— কাপড়টো ছাড়াইঁ লিল(অ)!"

রাগে আমার গা-টা কষকষ করছে। তার গালে তিনটা চড় কষিয়ে বললাম, "শালা, তোরও জামা-গেঞ্জি বুঝি সে খুলে নিয়েছে? বদমাসী করবার জায়গা পাসনি? মা-কালীর শ্মশানে এসে ফের ওই মায়ের বয়সী, মাগীটার উপর চড়তে গেছলি? বারণ করেছিলাম না! ফের শালা মিথ্যা কথা বলছিস?"

বরকৎকে পাঠালাম ব্যাপারটার খোঁজ-খবর নিতে। তেমনি মা কালী হয়ে সেই মাগী, টাল খেতে খেতে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে—গাব গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে! বোকা পাঁঠার মত লেট্টুও রইলো দাঁড়িয়ে, মাথা নীচু করে চড় খাবার পর!

বগলদাবা করে জামা-গেঞ্জী, শাড়ী-সায়া-ব্লাউজ নিয়ে ফিরলো ইসলাম মিঞা। সেগুলো নাকী যত্ন করে, বাঁশের কঞ্চিতে পাট করে রাখা ছিল! হারামজাদাদের দিকে তেরিয়া হয়ে তাকাতে, ছোঁড়াটা বললো—উ ত্য' আমাখে চড়তে বুল্ল্যাক উয়ার উপর! আপনকার লিষেদ্‌টো শুন্‌ল্যেক্ নাই!"

একেই পেটে গেছে মাংস-পরটা-মদিরা, চুপ করে থাকে কি করে, ওই নারী—বেগম্ নাদিরা? বাঁশবনের ঘুরঘুট্টি আঁধেরা অবশ-বিবশ করেছিল দু'জনকেই। তাই শেষ খেলা হবার আগে, আমার হাততালিতে—রসভঙ্গ হয়েছে তাদের। খেলা ফেলে আসার সময়, মনে পড়েনি কাপড়ের কথা। আষাঢ়ে গপ্প একটা তাই বানিয়েছে ওরা।

না, ওতে আর মহাভারত কতটুকু অশুদ্ধ হ'তে পারে! বললাম, 'কাপড়-চোপড় পরে নাও!'' ঝটপট শরীর ঢেকে ফেললো ওরা—যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না! নারীটি তবে মোছলমানী! **তওবা-তওবা!** হিঁদুর ঘরের লেট্যু কাহারকে, শরীরের বাহার দেখিয়ে,মনের আর ধনের আহার যুগিয়ে—ঘর থেকে বের করে, আর বের হয়ে এসেছে নারীটি: একেবারে **দুগ্ধপোষ্য সাবালক** এক পাঁঠাকে নিয়ে।

এখন যদি ওই ভর-দুক্যুর রাতের আঁধারে, ঠা-ঠা তেষ্টায় হা-হা হু-হু করে উঠে মন আর শরীরটা—তবে দোষটা মা-কালীরই হবে বটে! গোরুর গোস্ত-খাওয়া নাদিরার রক্তে, যদি আষাঢ়ের গাইগরু **হাম্বা ডাকে**; তবে লেট্যু কাহার বা ইসলাম মিঞা নামের **ষাঁড়গুলোর** দোষ কোথায়? **হাঁ, কথাগুলোয় লজিক আর ম্যাজিক আছে বটে!**

ওই যে নারীটি লেট্যু কাহারের **নাড়ী টিপে**, ঘর থেকে বের করে আনলো, ভূতের **হাঁচি আব হাসিতে ভরা** মাদুলী পরাবার জন্য—যাতে বাঁধন কেটে পাখী উড়ে না পালায়: সেই নারী যদি আবার কারো খাঁচায় বাঁধা পড়ে, তবে লেট্যু ব্যাটা—'লিট্টির' মত গোল পাকিয়ে যাবে; মনের দুঃখে 'রোষ্ট' হতে হতে 'ঘোষ্ট' হয়ে! কোন্ মাদুলী সেই ব্যপারটা ঠেকাবে? বিষম ফ্যাসাদে পড়লাম—এই শালা **সিঁড়ি-ভাঙ্গা-অঙ্কের** গেরোয়। এ' শালা-শালীর আবার লঘুগুরু জ্ঞান নাই!

মাল খেয়ে সবাই এখন তাল কানা। মাছটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। না হলে পচে-সড়ে যাবে। কোথায় নুন-হলুদ, কোথায় হাঁড়িকুড়ি, কড়াই খুন্তি? কোন শালাই বা দিয়ে গেল, মাল আর মাছ—এ তল্লাটে তো আমি **'লতুন' আগন্তুক**! কেউ চেনে না আমাকে, আমিও চিনি না কাউকে! আর তাই যদি-বা থাকবে, তবে ছেলের বয়সী **শ্রীমান কাটোয়া নিবাসী অতীন মজুমদারের, বাসী প্রতিশ্রুতির পান্তাটুকু—কেন গিলতে হলো ১২ই জুন, ২০০৭ সালে?**

এ হেন **শ্মশান-পান্থ** আমি, তখন থেকে শান্ত হতে পারিনি মনে মনে; যখন থেকে হাজির করলো ওই পেল্লায় মাছটাকে ইসলাম মিঞা, তিন বোতল কাঁচি-মালের সাথে! অগত্যা কী করা যায়, সেই নিয়ে একটা মিটিং করতে হলো—রাতের নিবু নিবু চিতার আলোয়; লেট্যু, ইসলাম আর নাদিরার সাথে, সেই কাঁচি মদিরা সহযোগে।

রাতের একটা নিজস্ব রূপ আছে, সব শ্মশানেরই। কংকালীতলা, বক্রেশ্বর, ফুল্লরা তারাপীঠ সর্বত্রই একই ছবি ছিল এককালে। শহরায়ণ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, সিনেমা-ভিডিও হলের জন্য; শ্মশানের সেই **নিবিড় মাদকতা** বেমালুম হারিয়ে যাচ্ছে। লোকালয় থেকে যে শ্মশান যত বেশী দূরে, তার **ভয়াবহতা** তত বেশী।

উদ্ধারণপুরে শ্মশান আছে বলে, এখন মনেই হয় না। খালি যখন গাড়ি ভরে মড়ারা আসে, বীরভূম-বর্দ্ধমান-মুর্শিদাবাদ থেকে, তখনই যা মনে হয়—এখানে শ্মশান বলে একটা জায়গা আছে! আগের শ্মশান এখন গঙ্গার পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে। বেঁচে আছে এখন ফুট ২০ পাড় আর একটা **গাব গাছের ঝাড়।**

দূরে দূরে আছে দু' একটা বাঁশঝাড়, যেখানে শেয়াল-কুত্তাও ডাকে না। বেল্লিক দু' একটা হাড়গিলের ছানা, কিংবা শকুনের পোলা, পালকে ঠোঁট গুঁজে উঁকুন খুঁজতে খুঁজতে—যখন ভূতের গলায় গলা-খ্যাঁকারী দেয়—পিলেটা তখন চমকে না উঠে, মাথা কুটে তাদের পায়ে—যা'তে তাদের ওই **বে-আক্কেলী গজল থামে।**

ঝপাস করে পড়লো একটা পুঁট্‌লী, **কষ বা গাব গাছের ডাল থেকে।** অনাসৃষ্টির এই ঢিলানোর কথা থাকলেও, এখনও তো আমি ওদের ডাকিনী মুত্ মেখে যুত করে; ভাঁড়ে দিয়ে কাঁচি মালের খানিকটা পানীয়! সেধে সেধে ভূতেরা তো আসে না? তবে কী এলো ওরা **পাকী মালের গন্ধে?** তার তো তলানিটুকু পড়ে আছে, অবসরে গলায় ঢালব বলে! যেই-ই আসুক, স্বাগত জানাতে হয় আগত-কে। অতএব—এসো হে শ্মশানচারী, বন্ধু আমার—আমি হচ্ছি **প্যামা-চামার!**

পুঁটলীটা পড়ে ছিল নাদিরার কোলে। মা-কালীর দান ভেবে, সে সেটা খুলে না **দেখে-চেখে;** রেখে দিল আমার পায়ের কাছে। অগত্যা আমিই খুললাম সেটা, বড়ই নিস্পৃহ্ হয়ে। পাকা রুইমাছের ভাজার, বা কষা-কষা লংকা-চচ্চড়ীর সাথে; পাকী-মালের কী যে স্বাদ, সে কথা আমি **কা'কে বুঝাই—কেমন করে? "একবার রসনায় যে পেয়েছে তার, আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তা'র!"** কবি ঈশ্বর গুপ্তের এই গুপ্ত কথাটি—মনের ঘুলঘুলীতে এখন চুলবুলীর মত এক্কা-দোক্কা খেলছে।

বেরিয়ে পড়লো এক এক করে সব সামান, মায় দুটো পেল্লায় কড়াই আর খুন্তী। নিজের কপালকে আমি কোনকালেই বিশ্বাস করি না। অসম্ভবের এই পোঁটলা ঘাড়ে (থুড়ি-কোলে) পড়ে, ব্যবস্থা একটা করেই দিল; যে সমস্যা নিয়ে বিব্রত ছিলাম আমরা এতক্ষণ! ঝোলার ভেতর থেকে ৬" সাইজের ছুরিটা বের করে, নাদিরা ছুঁড়িটাকে দিয়ে বললাম, "ব্যবস্থা করো। সবাই যাও এখন, এখান থেকে—আমার অনেক কাজ আছে। রাত গভীর হচ্ছে—**শ্মশান চিতায় বসবো আমি!"**

চলে গেল ওরা, দেওয়ালের আড়ালে। ইসলাম মিঞা এসে, শুধিয়ে গেল, **চিতার আগুনে পাক হবে কিনা!** বললাম, 'নূতন করে আগুন ধরাতে সময় লাগবে। দরকার কী আলাদা উনুনের? মড়ার চিতার আগুনের কী আলাদা কোন ধর্ম আছে? ওতেই মাছভাজার কাজটুকু করে ফেল!"

আমি আর বাক্য ব্যয় না করে, বসে গেলাম মড়াব ছাইয়ের গাদায়, গঙ্গার পাড় ঘেঁসে। জলের কুলুর কুলুর শব্দে, পূবালী হাওয়ায় শরীর মন জুড়িয়ে গেল। ধ্যানে ডুবতে ডুবতে আবার ভেসে উঠলাম, **কারুর যেন হা-হুতাশে।**

গভীর রাতের ল্যাজ মুড়ে কোন বে-আক্কেল, **শ্মশানে** ঢুকে হাপুস কাঁদে? উঁকি মেরে দেখলাম, সাথে নাই তার মড়া। আমার আসনের পাশে বসে, তবে কেন তার সুর চড়া? এ' শালা নিশ্চয়ই মাদুলী চায়, কয়টা আধুলির বদলে! এলি তো এলি—এখন এলি? যখন কিনা বেরুবে কালী? নাঃ, আর বসে থাকা যায় না। উঠতেই হলো ছাইয়ের গাদা থেকে, ছাই মেখে!

ল্যাংটা শিব সেজে সবে বসেছিলাম চিতায়! কোন রকমে গেরুয়াটা কোমরে জড়িয়ে, বললাম—কাঁদে কে? সময় অসময় বলে কী জ্ঞান নাই? কেঁদে কেঁদে শোকে উথলে উঠে, বাত্‌লে দিল সে তার কাঁদার নীরেট কারণটা। মড়া পুড়াতে এসে কটা টাকা পেয়ে, সে কটা জিনিষ—তরকারী মশলা তেল, কড়া-খুন্তী-বেড়ী কিনে, গামছায় বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল গাব গাছের ডালে।

ফেরার পথে মালের ঘোরে, সে নাকি সেটা নিতে ভুলে গিয়ে; **বিষ্টুটিকুরী** পর্য্যন্ত গিয়ে—আবার ফিরে এসেছে ওইগুলো নেবে বলে। এখন যদি আমি থাকি গাছের তলায়, তবে ও'গুলো ঝাড়বার জন্য, **জল এলো কার নোলায়!** সেই দুঃখটা সে পেশ করলো আমার কাছে! নেশা কাটতেই—সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

ভেবেছিলাম **ভূতের দান**। সাধুকে জানিয়েছে ওরা **মহা সম্মান।** এখন দেখি উল্টো তান— যেতে বসেছে **মান-সম্মান।** গাছের ডালে বাঁধা ছিল আলগা গেরোয় ও'গুলো। ঝুলতে ঝুলতে কখন যে তা' ফস্‌কা হয়ে গেছে, নদীর বাতাসের **উড়নচণ্ডী ঝটকা হাওয়ায়; সেটা বুঝা যায়নি পড়ে যাবার আগে।**

আমি শালা বড় আশায় আশায়, বুঝে নিয়েছি ওটা ভূতের দান। দু'জনে ভুল করলে, একে অপরের জন্য **ব্যথা অনুভব** করা উচিৎ। আর সেই কারণেই তার দুঃখে, আমার দুঃখেরও দু'চোখ ভরে জল এল। জিভেও জল এলো মাছ ভাজার গন্ধে, দেওয়ালটার ও'পাশ থেকে। কিন্তু **দুঃখের জলের চেয়ে, সুখের জলটা** অত ভারী আর নোন্‌তা বলে মনে হলো না।

তাকে সান্তনা দিতে বললাম, "সন্ধ্যেবেলা মা-কালী এসে বললো যে—পাকা-রুই ভেজে, পাকী বিলাতী মালের সাথে, আমায় তুই ভোগ নিবেদন কর। তোর বহুৎ পূণ্য আব খদ্দের হবে। **চীনে কালীবাড়ির** যে ভক্ত দারোয়ানটা, মরার সময় সগ্গের পানে **বাঁ-ঠ্যাং তুলে মরে গেছলো;** সেই **চেন ঝেং সুঙ্‌**-এর মৃত আত্মা এসে,

গাব গাছটা নাড়িয়ে তোমার পোঁট্‌লাটা ফেলে দিয়ে; বলে গেল যে—ওই পাকা রুই মাছ **চীনা পদ্ধতিতে ভেজে, চীনাচারে চীনাকালীকে** নিবেদন করো মহারাজ! আমি তার কথা ফেলি কী করে! মহা **চীনাভক্ত** কিনা সে!

আর এক **চীনালতা** নিজেই উবজে এসে, তার চ্যালা লেট্যুকে নিয়ে, নিজের গরজেই সে মাছ ভাজছে এখন, ও'ধারের চিতার নিভু-নিভু আগুনে। মাছ ভাজার গন্ধ পাচ্ছ না? **"তবে, এসেঁই যখন পড়েছোঁ—টুঁকান্ দেরী করোঁ বাঈ, প্যাসাঁদ পেয়েঁ যাবেঁ!**

আমার কথার মাঝে বেমক্কা কথা কে ছুঁড়ে দিলে, বুঝতে পারলম না। এদিক ওদিক তাকিয়েও দেখলাম না কাউকে। **চটাই ঘোষের** দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে বাতাসে মাছ ভাজার গন্ধ পাবার চেষ্টা করছে—কুকুরের-শেয়ালের মত নাক তুলে তুলে। আর জিভের জল, সড়াৎ সড়াৎ করে গিলছে!

তারপর হঠৎই সে কেঁদে পড়লো পায়ে। তার নিবেদন হলো এই যে—**ট্যাংরার চীনা মহল্লায়**, সে ছিল বছর দুই। কাজ-কামের সন্ধানে থাকতে থাকতে, একটা চীনা মেয়ের উথাল প্রেমে পড়ে সে। যখন হাবুডুবু খাচ্ছে দু'জনে, ওই পাড়ারই এক চীনা ছোঁড়া, তার নাকে **গোটা দুই ঘুসি মেরেছিলো—জুডো-ক্যারাটের কায়দায়**। তারপর তাকে গলির মোড়ের, দেড়-হাতি কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়ে, **জবাই করতে চেয়েছিল**।

হাতে পায়ে পড়ে জীবনটা রক্ষা সেদিন হয়েছিল বটে; কিন্তু নাকে খৎ আর মুখে **আরশুলার গু্য** ঠেসে ভরে দিয়ে—চীনাপাড়া ছাড়া করেছিল ওই শালা—**চেন্ ঝেং সুঙ্**। আর সেই মাগী **বেন্ চুং লী**, এত ঝাড় খাবার পরেও কোন প্রতিবাদ করেনি বা ছাড়াতেও আসেনি।

ওরা যদি সেই লোক হয়, তবে সে আর ওদের **মুখ দর্শন** করতেই চায় না। আমি অনুমতি দিলেই সে চলে যাবে। আমি কী ছাই জানি যে ওরা তারাই! চীনাদের প্রতি আমারও **বেজায় ঘেন্না** আছে। সেই জন্য **মশলাদার চাওমিন** আমি খাই না। একদম প্লেন খাই। কী জানি—ও'শালারা যদি, **আরশুলার গু্য আর ডানা মেশায়!**

এত কথার মাঝে যে কথাটা সে আরও বলেছিল, সেটা হলো যে—সেদিন থেকে নাকি তার **যৌবনকালের হাঁপানীটা নাই, ওই আরশুলার-গু্য খাবার পর!** এ' পেত্যয় চটাই ঘোষের হয়েছে যে—**চীনা মার, আর খাবারের সাথে, আয়ুর্বৈদিক ফর্মূলা পাঞ্চ করা আছে। হিমালয়ের ঠ্যাং-এর কাছে কিনা দেশটা।**

দশটা ঋষির আর্য্য-বৈদিক ব্রেণে তৈরী, তাদের সব রকম ওষুধ আর কাজ-

কম্ম। তার কথা শুনে, আমার হৃদয়টা হাফ্ জুড়ালো, বাকী হাফ্টা এখনও চিড়বিড় করছে। আমাদের কথা আর ব্যথার মাঝে, অযথা **কে যে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েছিল নাকি সুরে**, তাকেই যে এবার জানতে হবে। কিন্তু জানি বা কী করে?

সেই কশ বা গাব গাছের আড়াল থেকে, গামছা ঝেড়ে ইসলাম বললো, "বাবা আমিই বলিছি। উ শালা টাকা দাদন দেয়, সুদ ল্যায়, আবার কেঁধোর টাকার ভাগও ল্যায়। বাড়ীতে বৌটা উকে ছেড়ে চলে যেছে। ছেলেগুলান্ বাপকে দ্যাখে না। উ শালা একলা থাকে। আমি দু'চার বার এয়েছি উর সাথে শস্যানে, হিঁদু সেজে—কেঁধো সেজে, উর হেল্পার হয়ে! উ শালা আমাকে পয়সা দিলোনি। তাই উকে ভয় দেঁখাইছিলাম—ভূত সেঁজে! আপদটো গেছে, ভালই হয়েঁছে।"

বললাম, "তুই এখানে কখন এলি? মাছ ভাজা হয়ে গেছে, ভালই হয়েঁছে।"

—উরা করছে তরিবৎ করে। অত বড় মাছ—ওই টুকান্—ত্যেলে ভাজে ক্যাম্‌নে? উ শালা দু'জনায় মাছ-টো লিয়ে কুস্তি কর্-ছ্যা! আমি এলাম তুমায় পাহারা দিতে। কিছু লাগ্-ব্যা? লিয়ে আসি?

সত্যি তো! বিদেশ বিভুঁই অন্ধকার শ্মশানে, একজন পাহারাদার আমার লাগেই। পুংখে ডোম ছিল আমার পাহারাদার, দুবরাজপুর-বক্রেশ্বরের শ্মশানে। শ্মশান-ঝ্যাঁটানী লক্ষ্মী ছিল, **আমার কারণ-বারণ সঙ্গিনী**—সময় আর অসময়ের। ৩৮ বছর আগে, ওরা মরেছে নক্সালী করার জন্য—পুলিশের গুলিতে। এখন আমার এই বুড়ো-বয়সে, শরীর ভারী আর দুর্বল হয়েছে। একটা তাগড়াই পাহারাদার তো চাই-ই। ইসলাম মিঞার রিক্সা-টানা ইস্পাত-শরীর এক্ষেত্রে যথেষ্টই বটে!

বললাম, "যা যা, ক'টা মাছ ভাজা নিয়ে আয়, তলানিটুকুর সাথে, মাকে উৎসর্গ করে দিই। রাত একটা বাজে! এর পরে মা খচে যাবে।" সড়াৎ করে সে সেই পাঁচিলটার ওপারে না গিয়ে, পেল্লায় হাত বাড়িয়ে তুলে আনলো—এক খামচায় গোটা পাঁচ-সাত টুকরো আর মুড়োটা। **বাঁ-হাতটা গঙ্গার বুকে ডুবে গিয়ে**, তুলে আনলো রাজা-রাজড়ার আমলের **পল-কাটা ১টা তামার থালা।**

মাছগুলো তা'তে রেখে, বিলাতী বোতলটা তা'তে বসিয়ে; এগিয়ে চললো **সে কালীমন্দিরের দিকে, মুখে-মাথায় গামছা ঢেকে।** ঝট্‌পট্ করে ধূপের একটা প্যাকেট, আর লাইটার নিয়ে, আমি ছুটলাম তার পেছনে পেছনে। **আমার পেছনে যার ছুটবার কথা, সেই-ই আমাকে ছুটালো কোন মন্ত্রঘোরে?**

সম্মোহিতের মতো আমি বাড়িয়ে দিলাম, সেই ধূপকাঠির প্যাকেটটা ইসলাম মিঞাকে। লাইটার নিল না সে। **ফুঁ মারলো ধূপের গোছার ডগায়।** মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে

জ্বলে উঠলো ধূপগুলো। নিবেদন শেষে প্রসাদের থালা নিয়ে, সে হাঁটতে লাগলো নদীর ঘাটের দিকে।

মন্ত্রতাড়িতের মত একেবারে বোবা হয়ে, আমিও হাঁটতে লাগলাম তার পেছনে। ঘাটের পাটে পা দিয়ে, ইসলাম বললো—আপনি প্যাসাদটো লিয়ে, আসনে যান বাবা। আমি একটু চান করে লিই। শালা, যা' গরম পড়েছে! শরীরটা একটু ঠাণ্ডা করা দরকার! একটু পরেই এসে লিছি!"

কোন কিছু তাকে আর না বলে, চুপচাপ মিষ্টি দোকানটার পাশ দিয়ে, যেখানে চিতায় ওরা মাছ ভাজছে; সেখানে এসে **বিষম ধাক্কা খেলাম মনে মনে, ইসলামকে দেখে সেখানে।** চিতার আলো-আঁধারী আগুনের মৃদু আলোয়, ওরা যেন কিছু একটা **খুঁজছে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে!** আমাকে দেখে, তিনজনেই মুখ নীচু করে **কেঁদে উঠলো।**

"একুশ টুকরো মাছের ৭টা টুকরা আর সেই বড় পেল্লায় মুড়াটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাবা। আমরা লোভে পড়ে কেউ এতটুকুও **মুখে তুলিনি।**" ঠাকুরের ভোগ—নৈবেদ্যপাত্র হাতে নিয়ে; দাঁড়িয়ে রইলাম ওদের সামনে সজল চোখে।

মুখ তুলে তাকিয়ে, তারা 'থ' মেরে গেল—আমার চেয়েও। একবারেরটির জন্যও তো—আমি যাইনি ওদের কাছে। তাহলে—আমিই আমার **সাধন-বিভূতির জোরে, ওই মাছের টুকরোগুলো মায় মুড়োটা** নিয়ে; মাকে **নিবেদন** করে এলাম। সন্দেহ নাই আর ওদের যে—আমিই হলাম **এক নম্বর** তান্ত্রিক-সাধু।

ঠিক ঠিক মালকেই ওরা **ক্যাচ্** (Catch) করতে পেরেছে। ভয় কেটে গিয়ে, প্রসন্নতায় ভরে উঠলো—ওদের বুক আর মুখ। কোন রকমে ওদের হাতে **রেকাবীটা** ধরিয়ে দিয়ে, চলে এলাম আমার সেই গাব গাছতলার আসনে। বহুদিন বহু শ্মশানে-ঘোরা পার্টি আমি। পাগলা শেয়াল বা কুত্তা ছাড়া, অন্য কিছুকেই ভয় পাইনি। আজ আমাকেইবা কে, সাথে করে নিয়ে গিয়ে, শিখিয়ে দিল **নিবেদনের নীরব মন্ত্র!**

ইসলাম শেখের রূপ ধরে, তার গলায় কথা বলে, সে আমাকে জানিয়ে গেল, যার জন্য আমি এসেছি এখানে—তারা সবাই আছে আমার জন্য হাজির। তুড়ি দিলেই নেমে পড়বে—শুধু সেটুকুরই অপেক্ষা। আছেই যখন আশে-পাশে, তখন দু'টো করে টুকরো মাছ ভাজা—আর চা-ভাঁড়ের এক ভাঁড় করে; কাঁচি-মদের বরাদ্দ হলো তাদের জন্য।

গোটা মুড়োটাই ছুঁড়ে দিলাম গাছের ডগায়। সেটা ধাক্কা খেয়ে পড়লো না কোথাও। তবে যাকে দিলাম, সেই-ই তাহলে লুফে নিয়েছে। ভাঁড়ের

মদটুকুও গায়েব হয়ে গেছে ততক্ষণে। ওদের তিন-জনকেও ছুঁড়তে বললাম ২ টুকরো মাছ, কষ গাছটার মাথায়। না, তারাও নীচে এসে পড়লো না। সবার শেষে খেলাম আমরাও। সবাই গোল পাকিয়ে শুয়ে পড়লো, আমার আসনের আশেপাশে। কষ গাছে হেলান দিয়ে, বিড়ি ফুঁকতে লাগলাম আমি, ঘুম ছুটে গেছে তখন আমার চোখ থেকে।

গোটা রাতটা কাটিয়ে দিলাম, বসে বসে জেগে জেগে। পাশে শুয়ে অসাড়ে ঘুমাচ্ছে ওরা। বড় বড় নিশ্চিন্ত শ্বাস, পড়ছে ওদের বুক থেকে। আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি কই? ঘোরতর সংসারী মানুষ আমি। সংসার ছেড়ে চিরকালের মত, বাসা বাঁধবার ইচ্ছা নাই শ্মশানে।

মনের মধ্যে শুধু ইচ্ছে জাগে, মাঝে মাঝে যে—ওই আজব **মা-কালীর জগৎটাকে** দিন কতক **চেখে-দেখে** আসি। তাই **বহুলার মড়াঘাট** থেকে, **উদ্ধারণপুরের মড়াঘাটে** আসা। উদ্ধার হ'তে নয়, উদ্ধার করতেও নয় কাউকে। শুধু সেই বেটীর **রান্নাশালায়**, দিন কতক উঁকি মারা। আর দেখা কেমন করে **ঘাঁটছে সে তার, মড়ার ছেঁচ্‌কী আপনমনে!**

রাত আসে প্রতিদিনের মতো, মড়ারাও তাই। যে ম্যাড়াগুলো বয়ে আনে সেই সব, তাদের কাছে পাই—তাদের **ম্যাড়ম্যাড়ে জীবনের** আলাদা আলাদা স্বাদের—গভীর চালচিত্র। সেটাই আমার বই লেখার, খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। রাতের অপর নাম **'রাত্রি'**। সে নাকি শুধুই **দিতে জানে,** নিতে জানে না কিছুই। তাই তার সংস্কৃত নাম **'রাতি = 'দদাতি' = Gives only!** জীবনের সব দুর্ঘট্‌কে সরিয়ে, সে নাকি শান্তি দেয়!

কই, আমি তো তার সে রূপ দেখিনি! নাকি আমার বিচারের **সবটাই ভুল?** তবে কী মুনি-ঋষিদেরও ভুল? কই তারা তো সে কথা লিখে যায়নি? বরং তারা বড় শ্রদ্ধায় বলে গেছে ঃ—

"ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভূং কন্যাং,
শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীং।" .... সামবেদ

[আমরা ব্রহ্মরূপা রাত্রির শরণাপন্ন হই, যিনি বার বার ফিরে ফিরে আসেন, যিনি সমস্ত প্রাণীর সুখ-সমৃদ্ধির কারণ; যিনি দেখতে কন্যারূপা আর চির-যুবতী; ময়ূর-পালক শোভিতা—পাশহস্তা এবং চিরকুমারীরূপা।]

প্রতিদিনের রাত্রির তবে এই রূপ কেন? সূর্য্য ডুবে গেলে, কেন সে তবে

নামে এই শ্মশানে, তার নিষ্ঠুরা রূপ নিয়ে? ছায়ায়-ধোঁয়ায় মেশা শ্মশানভূমিতে, সে তবে কী করতে আসে, দেওয়াই যার স্বভাব, তবে সে কেড়ে নেয় কেন সব? কেন এত ছল তার মনে? কেন খল্ খল্ উন্মাদ হাসে সে, শেয়াল-কুকর-শকুন সাথে নিয়ে? কেন তার ধূমাবতী-ছিন্নমস্তা রূপ? কেন দু-চোখে তার অনন্তকালের বুভুক্ষা? আমি তো আসিনি এখানে, কারুর বৌ-মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে, লতা-সাধনা করতে? কিম্বা চীনাচারে—মহাকালীকে ধরে, আমার কব্জায় ফেলতে?

যা জানা হ'লে সব জানা হয়, যাকে জানলে—আর কাউকে জানবার দরকার হয় না; সেটাই তো জানতে এসেছি আমি! "প্রকৃষ্ট-জ্ঞানার্থম্ সবিশেষম্"। কেমন করে মরণের ভয়কে ছুঁড়ে ফেলতে হয়—ভয় করতে হয় জীবনরূপী কাল-সাপকে। পাপাচারে উস্কানি দেয় জীবন, সহজ ছন্দে চলার তার মানা আছে বলে।

লোভ-লালসা, হিংসা-উন্মত্ততা, তার চিরসাথী, জ্ঞান হওয়া থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত! অথচ মরণ আছে, কেমন তার রূপ—সেটা জানতে পারলে, জীবনের স্বাদের চেয়েও অমৃত স্বাদ লাভ হয়! সেটা জানতেই আসা আমার। আর সেই সব জানানোর কুশীলবেরা যে থাকে শ্মশানে আর তার আশেপাশে!

কত কিছু ভাবতে ভাবতে, ভোরের হাওয়ায় তন্দ্রাটুকু এসে, দু' চোখে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল হয়তো! ইসলামের দিকে চোখ পড়লো জেগে উঠে। সে তার নূতন কেনা গামছাটা, পেতে দিয়ে মাটির উপর, আমার আসনের পাশে—পশ্চিম-মুখো হয়ে মাথায় রুমাল বেঁধে তখন নামাজ পড়ায় ব্যস্ত। তাকে বিরক্ত করলাম না।

শুধু খুঁজতে থাকলাম লেট্যু আর নাদিরাকে। তাদের টিকিও দেখতে পেলাম না। নমাজ সেরে উঠে ইস্‌লাম বললো, "ওরা চলে গেছে সেই ভোরবেলায়, আমার আসনে মাথা ঠেকিয়ে।" বুঝে উঠতে পারলাম না, তাকে কী বলবো!

কমণ্ডলুটা নিয়ে ঘাটের দিকে বেরিয়ে গেল ইসলাম। চায়ের ব্যবস্থা একটু হলে, এখন ভালই হয়। জমাট আলিস্যি ভাঙ্গাতে—আবার গড়িয়ে পড়লাম—যার নীচে আমি রচনা করেছি, দু'দিনের জন্য আমার আসন। দেখতে চেষ্টা করলাম—আঁতিপাঁতি করে সেই মাছগুলোকে, যেগুলো গত রাতে ছুঁড়ে মেরেছিলাম তার ডগায়; হয়তো সে সব—ডালের খাঁজে খাঁজে আটকে থাকতে পারে। একটাকেও তার দেখতে পেলাম না। মাথাটা এখন আর কাজ করছে না ঠিক মতো!

সকালের এই নির্জনতা এদিকটায়, বেশ ধ্যানের পরিবেশ তৈরী করেছে! ঘাটে স্থানীয় মানুষের ভীড়—ধুয়ে মুছে ফেলতে নিজেদেরকে। কপালকে কী ধুয়ে ফেলা যায়? সে উত্তর ওই একান্নটা মুণ্ডের মালা পরা মাগীটাই বলতে পারবে। সে না পারলে—তার নাম-কা-ওয়াস্তে ভাতার, হাড়ের মালা (কীকস) গলায়

দুলিয়ে বলতেও পারে, "**ট্যকান্ গাঁজা-ভাঙ্ লিয়ায় ক্যানে, বুল্যা দিব (অ) বটে!**" নিজের কপালটা জেনে নিতে পারলে হতো! কিন্তু গাঁজা বা ভাঙ্ কোনটাই নাই আমার সঞ্চয়ে।

ফিরে এলো ইসলাম, কয়টা লেড়ো-বিস্কুট আর চা নিয়ে। ভাঁড়ে ঢেলে সে নিবেদন করলো আমাকে আগে। তাকে বললাম, "যার আশ্রয়ে আছি, তাকে আগে দিতে হয়। পরে তার প্রসাদ নিতে হয়। সে আছে, সেটা মানতে হয়। এই যে তোমরা নিরাকার আল্লাহ-র কাছে মাথা নোয়াও, প্রতিদিন দিনে-রাতে পাঁচ বার করে; এর মানে কী এই নয় যে—তাকে সালাম্ করে তার কাছে সব কিছু পেশ করো তোমরা?

জীবন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, সবই তো তারই দেওয়া! দেখতে না পেলে, সে নাই—একথা ভাবা ঠিক নয়! পীর-পয়গম্বর, ফকির-আউলিয়া; দরবেশ-মুসাফীর; সবাই আল্লাহ্‌কে আগে নিবেদন করে, তারপর অপরকে দেয় তার প্রসাদ—শেষে নেয় সে নিজে! চার পাশের জগৎটাকে আগে তুষ্ট করতে হয়।

আমি এখানে নূতন—চিনি না পথ ঘাট। ইসলাম বললো, "অজয়ের সঙ্গমের দিকে চলুন হেঁটে হেঁটে, ফিরবো-ও তাই; ভাল লাগবে আপনার। সারা রাত তো বসে বসে আপনার শরীরে খিল ধরে গেছে! গুছিয়ে ফেলুন আপনার ঝোলা-কম্বল। না হয় উঠুন—চান করে আসুন, আমিই গুছিয়ে ফেলছি।"

কথাটা মন্দ বলেনি ইসলাম। ও'দিকটায় গেলে—কয়টা ছবিও তোলা হবে, আর হাঁটাও হবে। এঁড়ে নদ অজয়ের গঙ্গা-সঙ্গমও দেখা হবে। শিব অজেয় জানি। তবে তার আর এক নাম **অজয় ছিল কিনা**, জানা নাই আমার। তার সাথে গঙ্গার প্রাকৃতিক মিলন, **শরীরী-সঙ্গমের** সাথে কতটুকু তফাৎ—সেইটুকুই জানতে বাকী।

বললাম, "আসন গুটিয়ে লাভ নাই। থাকতেই যখন হবে দিন আর রাতটুকু, তবে আর কষ্ট করা কেন? পড়ে থাক আসন এখানে। কমণ্ডলু আর ব্যাগটা কাঁধে নে। টাকা ক'টাও নে সাথে। চল্ সঙ্গমেই চান করবো দু'জনে। কয়টা ছবিও তুলবো।"

বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে—অজয়ের সঙ্গমস্থল **শাঁখাই-ঘাটের** দিকে। প্রায় দু'-আড়াই কিলোমিটার পথ, সকালের নরম আলোয় হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে এলাম। টুকটাক ছবিও তুললাম। সঙ্গমের গা-ঘেঁসা বাস-স্ট্যাণ্ড, কণ্ডাকটরদের খিস্তি-খেউড় আর বাধাহীন চেঁচামেচিতে ভরে আছে।

সঙ্গমের পাশেই ব্রহ্মানন্দ আশ্রম, পেল্লায় জায়গা জুড়ে। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ধ্বজা উড়ছে সেখানে, যদিও সর্বলোকের **ঢোকার অধিকার সেখানে নাই**—না ঝড়ে না বৃষ্টিতে—না রাত্রে। আগের বার এসে, বাসহীন বিজন গঙ্গাকূলে; ঘনায়মান কাল

বোশেখীর সন্ধ্যায়, **আশ্রয় চেয়েও স্থান পাইনি।** অগত্যা সেই **বিফল (বিপুল) হাজরার** ভ্যানে করে, ফিরে যাওয়া **নিরোলে**—তার **পর্ণকুটীরে।**

ইসলাম মিঞার মত, সেও ছিল **নিবেদিত প্রাণ**—একান্ত সঙ্গ দিতে! শুনেছি সেই আশ্রমেরও নাকি আছে অনেক **গ্যাঁড়াকলের-ইতিহাস আর ভূগোল।** অপপ্রচার আর সম্প্রচারে মিলিয়ে, তার বর্ত্তমান যে চেহারা দাঁড়িয়েছে, তা' দেখে মনে হয়েছে—**মা-কালীও একপেশে**—বড়ই হাত-খোলা!

স্নান করলাম দু'জনে সঙ্গমের জলে। শরীরটা এখন মনে হচ্ছে আমারই। কাল থেকে মনেই ছিল না যে, আমি সেই **প্রেমানন্দ প্রামাণিক**—কলকাতা হাইকোর্টের, প্রাক্তন বড় অফিসার। পোষাকী নাম **সোমানন্দ অবধূতের** আড়ালে—**শ্মশান-গোঁসাই** সেজে, তন্ত্রের ছিপ ফেলে বসে আছি উদ্ধারণপুরের ঘাটে, টপাটপ করে তুলতে **গোলা পাবলিককে;** গেঁথে ফেলতে—ভূত-পেত্নীর বঁড়শীতে!

যাই বা যতটুকুই জুটুক না কেন, সেটায় তো আর পয়সা লাগে না! বরং উবজে এসে, মৃদু কেসে হাত জড়ো করে—আসনের সামনে ওরা নামিয়ে রাখে। আমি সাগ্রহে নিয়ে যেন **'কেতাত্থ'** করি তাদের! আমার **'কিপা-দৃষ্টি'**-তে নাকি সব হয়ে যাবে তাদের! আরে বাবা—শিবের আর কালীর চ্যালা না হলে, **শ্মশানে কেউ আসন পাতে? নেহাৎ 'হাড়ি-ড্যুম্ ত' লয়!'**

আবার হাঁটতে শুরু করলাম, উদ্ধারণপুর শ্মশানের দিকে। মাঝে মাঝে পাবলিকের ছুঁড়ে দেওয়া, **'জ্যয় তারা'** অভিবাদনের উত্তর—**'জ্যয় কালী'** বলে দিতে হচ্ছে। এটাই রীতি-রেওয়াজ লাল পোষাকধারীদের। কালী-তারা পাত্তা না দিলেও, বলতেই হবে যে—ওরা ঘাপটি মেরে শুনছে; আর জীবনের সব **তাড়া-খাওয়া ব্যাপারে** ওরা এসে, তাড়া করবে সব **আপদ-বালাইকে।**

শুধু তার মন্ত্রী-সান্ত্রী-সাধুবাবাকে দিয়ে, ভেট পাঠাতে হবে তার কাছে—খানিকটা মদ, কিছুটা গাঁজা-ভাঙ্গ, হাঁস-মুরগী-পাঁঠার মাংসের কষা-কষা লংকা-চচ্চড়ী; সিগারেট-বিড়ি; আর নিদেনপক্ষে—১০১্ টাকা। তবেই—সব হবে; নাতি-পুতি হবে, মামলা-মোকর্দ্দমাও চুলোয় যাবে; চাই কী—ও'পাড়ার ডবকা ছুঁড়ীটাও হাম্‌লে এসে পড়বে—সাধ মেটাতে দু'জনেরই।

অতএব এই সাধুবাবা-মায়েরা হেলাফেলার **'বোস্ত লয়!'** মিনিমাম এক কাপ চা—একটা **কুত্তা-বিস্কুট** দিলেই, কপাল আর হাতের রেখা দেখে, **নিদান হাঁকবে খুশী** হয়ে! বিনি পয়সায় কী কিছু হবার যো আছে ভাই?

ইসলাম বললো, "সব বুঝেও তবে মানুষ, অত অমন করে ভুল করে কেন?

এই আমাদের ফকির-দরবেশ-আউলিয়া-ইমাম বলে, 'আল্লাব বান্দারা, বাচ্চা পয়দা করো। কোটি কোটি বান্দা একসাথে 'আল্লাহ' বললে—পরবার দীগর খুশী হবে, বেহস্তের দরজা খুলে দেবে। কিন্তু হিঁদুরা সব জানা সত্ত্বেও কেন সংসার করে? আপনাদের সব শাস্ত্রে তো ওই **অসারতার কথা** বলা আছে?"

বললাম, "বেটা, সব জেনেও মানুষ-দেবতা জ্ঞানপাপী হয়। দেবতা বলতে তোমরা কী বুঝো জানি না, হিন্দুরাও কী বুঝে আমি জানি না তাও! আমি বুঝি—ওরা সবাই মন্ত্রী-M.L.A–M.P-র মত **সুবিধাভোগী পার্টি**! ওদেরকে খুশী করতে, এই আমাদেরকেই লাগে। রাজনৈতিক পার্টিরা যেমন—চোর-গুণ্ডা-বদমাস পুষে, ওরাও তেমনি-ভূত-প্রেত-পেত্নী পুষে।

ওদের খুশী করে তবেই তার দরবারে যেতে হয়! দেবতাদের দেবত্ব আর কিছুই নয়—আড়ালে-আবডালে থেকে, বিদ্যা-বিজ্ঞান-বুদ্ধির ষোল আনা প্যাঁচ-কষা; রাক্ষস বা মাস্‌ল্‌ম্যানদের বিরুদ্ধে। আর রাক্ষসের রাক্ষসত্ব বোধবুদ্ধিহীন **'ধর তক্তা—মার পেরেক'** হয় বলে, মার খায় বেশী।'

তা'-হলে তুমি-আমি, আমরা কা'রা? **মার খাওয়ার দলে**—মারকুটের দলে নয়। যাই কিছু কর না কেন, জন্মের পর জন্ম দিয়ে তা অর্জন করতে হয়, প্রাকটিস্ চালাতে হয়—তবেই অধিগত হয় তা' মনে আর শরীরে। আজ তুমি যাকে চোর ডাকাত বুঝছো, সে কিন্তু বহু ছোটকাল থেকে, অভ্যাস করেছে এই বিদ্যা। আরও ভেতরে ঢুকলে বুঝবে—তার রক্তে আছে ওইসব। দেবত্বও অর্জন করতে গেলে, ওই একই প্রক্রিয়ায় এগোতে হয়!"

—— তাহলে আমরা কোন দিকে যাবো? কী রকম সে পথ? পথের শেষেই বা কী আছে?

—— সকলেরই উচিৎ, যে সব কিছুর মালিক—তারই হুক্‌ম্‌বরদার হওয়া। তাহলে জন্ম-প্রজন্মের এই যন্ত্রণার ফেরে পড়তে হয় না। যে পথে গিয়ে গিয়ে মুনি-ঋষি, ফকির-দরবেশ, আউল-বাউল, পীর-পায়গম্বর; পাকা করে নিয়েছে তাদের আসন সেই খুদার দরবারে; আমাদের সকলের উচিত সেই পথে চলা, অটল মন নিয়ে। যে পদ্ধতি তারা অনুসরণ করেছে—তাই-ই করা। এই যে তোমরা নামাজ পড়ো রোজা রাখো, তা' তো কেউ না কেউ প্রথম শিখিয়েছে ইসলাম ধর্মে! হিন্দু আর খ্রীষ্টানদেরও ওই একই পদ্ধতি—হয় মুনি-ঋষি-কেষ্ট, নয়তো যীশুখ্রীষ্ট!

চলে এলাম আবার শ্মশানে। সার সার মড়া পড়ে আছে, আমার আসনের কাছে। আমি শুদ্ধ-সুন্দর করে দিলে, মন্ত্র পড়ে আর গঙ্গার পবিত্র জল ছিটিয়ে; তবে

নাকি তাদের **স্বর্গপ্রাপ্তিতে** কোন বাধা হবে না এতটুকুও। আসনের উপর পড়ে আছে অনেকগুলো বোতল, আর ছড়ানো ছিটানো একরাশ—পাঁচ-দশ-কুড়ি টাকার নোট আর খুচরো পয়সা।

সেদিকে তাকিয়ে কুৎকুতে লোভী চোখে—**শ্মশান পূজারীকে** ব্যাজার মুখে, দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললাম, "তুমি থাকতে, আমি কেন ভাই?" সে বললো যে, "আমি **শেষ মন্ত্র পড়লে, সবাই** নাকি **ভূত হয়,** পেত্নী হয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে **ঘাড় মটকাবার জন্য।** আর আপনি পড়ালে নাকি সবাই **স্বর্গে যাবে**—এটা ওদের ধারণা! আজ দু'টো দিন আমার **একদম রোজগার নাই।"**

আমি শ্মশানে গেড়ে বসে থাকাতেই নাকি, তার এই হাড়ির হাল হয়েছে। মনে মনে কষ্টই পেলাম তার জন্য। তার **ভাতে হাত মারা,** আমার এতটুকুও উদ্দেশ্য নয়। **সুস্থ-সুন্দর** ভাবে ভাতের ব্যবস্থা যার করতে পারবো না; তার **অসুন্দর-লোক ঠকানো ব্যবসায়**—নাকটা না গলানোই শ্রেয়ঃ।

যাই হোক তাকে বললাম যে, "তোমাকে দেখে তো ব্রাহ্মণ বলে মনে হচ্ছে না। তোমার নাম আর পদবী কী? অতগুলো লোকের সামনে বেমক্কা এই কথা বলায়, সে গেল কুঁকড়ে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, "আমার গুরুর বারণ আছে কিছু বলতে। ব্রাহ্মণের আবার নাম-ধাম, জাত-গোত্র কী দরকার? তবে আপনাকে আমি বলতে পারি **গোপনে,** কেননা আপনি সাধু-মহারাজ, **শ্মশান্-ভৈরব!"**

দেওয়ালের আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলাম তাকে। এবারে সে কেৎরে পড়লো আমার পায়ে। বললো সে হাড়ি-ডোমের কাজ করতো নদীয়ার শ্মশানে। সেখানে তার পোষায়নি। উদ্ধারণপুরের ঘাটের মত অত **'পেস্টিজ আর মড়া'** সেখানে নাই। তাই ভেক্ ধরে সে **বামুন সেজেছে।** বেশ কয়েকটা বছর আছে এখানে। কোন তান্ত্রিক সাধু-সাধুমা এলে সে কেটে পড়ে, আসল পরিচয় ধরা পড়বার ভয়ে।

আমার ছেড়ে যাওয়া আসনটায় বসে, সে নাকি **সাধুবাবা সাজতে চেয়েছিল।** ভেবেছিল ওই কম্বল **আসন ত্যাগ করে** আমি চলে গেছি। কিন্তু বে-আক্কেল একটা **লাউ-ডগা সাপ,** গাছ থেকে নেমে এসে বেশ খানিকক্ষণ ওটায় **শুয়ে বসে,** আবার গাছে উঠে গেছে—এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। অনেক কোলাহলে আর **শ্মশান-খেউড়ে,** সে হয়তো **বিরক্ত হয়েই** চলে গেছে কোথাও।

তাকে বললাম, "এবার বলো তোমার মন্ত্রের কথা। কী মন্ত্রে তুমি মৃতদেহকে শুদ্ধ কর, চিতায় দেবার আগে? তোমার মন্ত্রে সবাই নাকী ভূত হয় · পেত্নি হয়, একটাও সগ্গে না গিয়ে, পাড়ায় ফিরে গিয়ে সকলের **ঘাড় মটকাবার চেষ্টা করে?** যদি

কিছু ভুল থাকে, শুধরে দিই—শিখে নাও। আমি তো আর এখানে থাকবো না! তুমি তা' হলে ভাল করে সব করতে পারবে। লোকেও তোমাকে আর অবিশ্বাস করবে না—গালিও দেবে না।"

এবার সে সত্যিই কেঁদে ফেললো। বললো, "মন্ত্র আমি জানি না বাবা। শিখাবার গুরুও নাই আমার। ডোমের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, মাঝে মাঝে তরজার লড়াই শুনতে যেতাম। সেখানে মা-কালীর তরজা শিখে নিয়ে, সেটাই মনে মনে আওড়াই এখানে, **ডমরু আর মোষের শিঙা** বাজিয়ে—গঙ্গার জল ছিটিয়ে—এক গোছা ধূপ জ্বেলে দিয়ে। একটু **কারণ প্রসাদও** করি তখন।"

ইসলামকে একটা বোতল আনতে বললাম। তারপর তাকে গিলিয়ে দিয়ে, আমরাও খানিকটা করে নিয়ে বললাম, "এবার বলো তোমার সেই মা-কালীর তরজা—আমরাও শিখে নিই!"

নিমরাজী হয়ে সে বাজালো তার **ডুগডুগি আর মোষের শিং-এর শিঙ্গা**। তারপর হাতজড়ো করে—শ্মশান-মাটিকে আর চিতাকে প্রণাম করে বললো ঃ—

"জয় জয় দেবী চরাচর সারে,
মাঈগুলো ঢাকা লিছ মানুষের হাড়ে;
কটা মাথা টুটা-ফাটা বাঁশের মারে—
সিটা শুদ্দু লিছ তুমি গলায় পরে!
***   *   ***
দয়া কর জননীগো, ভাল হঁক্ এ' শালার—
সঙ্গে য্যান(অ) যায় ইটো,
হয়েঁ মালা ত্যুর গলার!
***   *   ***
না হলে ত্য' খেয়ে লিবে,
কুত্তা কী শিয়ালে—
কাঁহাতক কোরবি মাগো,
দলে দলে গুচ্চের বিয়ালে!
জ্যয় কালী-তারা-শিব-শিব!! .....**(মা কালীর তরজা)**

আবার ডুগডুগি বাজিয়ে, শিঙ্গা ফুঁকে সে চিতা আর শ্মশান-মাটিকে প্রণাম করলো। আবারও তাকে বিনে পয়সার মদ গিলিয়ে, বেজায় রকমের হাততালি দিয়ে, হাসতে হাসতে টেনে গিয়ে তুললাম, আমার আসনের পাশে। তারপর বললাম, "১২ বার শিঙ্গা ফুঁক শালা, ১২টা মড়ার জন্য, ঘুম ভাঙ্গুক শালা-শালীদের।

গঙ্গার জল লিয়ে আয়—চোখে-মুখে-গাঁড়ে ছিটিয়ে দে। দেহঘটটো পবিত্ত হোঁক। ইসলাম, টাকা পয়সা গুণে ওকে একভাগ দে, এক ভাগ মা-কালীর, এক ভাগ তোর—আর এক ভাগ শ্মশান ভৈরবের। দে ওকে আগে দিয়ে দে। ওর এখন কত কাজ পড়ে আছে।"

সে আমাকে আবার ঢপাস করে প্রণাম করে, ইসলাম মিঞাকেও সালাম করে, টলতে টলতে চলে গেল একটা কলসী নিয়ে—গঙ্গার ঘাটে জল আনতে; নামিয়ে রেখে তার অতি মূল্যবান, গামছায় গেরো-দেওয়া ঝোলাটা—আমার আসনের কাছে। একবার সে গাছের ডগাটায় দেখেও নিলো, সেই লাউ-ডগা সাপটা ঘাপটি মেরে এখনো সেখানে আছে কিনা।

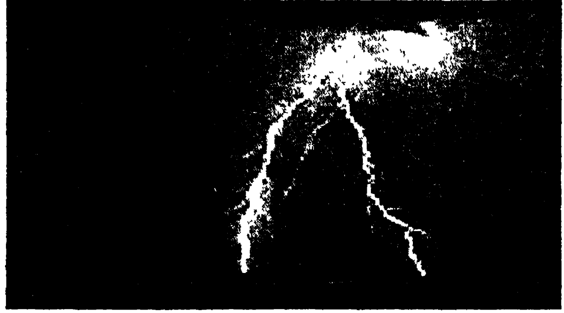
ফিরে এসে জল ছিটিয়ে মড়াগুলোর উপর শিঙ্গা ফুঁকতে আর ডুগ্‌ডুগী বাজাতে লাগলো। মিনিট পনেরো বাজাবার পর বললাম, "সবাই শালারা বোতলগুলো খোল্—প্যাসাদ করে দিই মা-কালী, তারার-শিবের। খেয়ে নে সবাই। তারপর পূজারী ঠাকুরের সাথে, ওই মন্ত্র শুনে শুনে বলতে থাক। তা হলেই মড়া রোষ্ট্‌ হয়ে একদম সগ্গে চলে যাবে।"

সবাই তাই করলো। মহা আনন্দে আমার প্রসাদ খেয়ে; বেজায় টলতে টলতে বলতে লাগলো, "জয় জয় দেবি... ... ...শিব শিব।।" নূতন রকমের মড়ার উদ্বোধনে, অকারণে আর বেজায় কারণে, সবাই নাচতে লাগলো ভূতের নাচ উদ্ধারণপুরের গোটা শ্মশান জুড়ে।

একপাল কুকুর—যারা সুযোগে ছিল, এক খাবলা করে মড়ার মাংসে ভাগ বসাতে পোড়াবার আগে; তারা এই সৃষ্টিছাড়া অদৃষ্টপূর্ব ভূতের নাচে বিরক্ত হয়ে; কোরাসে ঘেউ ঘেউ করে যেন বললো, "চ্যাংড়ামোর আর জায়গা পাস না? ভূত না হয়েও ভূতের নাচ! ভূত হলে তবে, তখন করবি কী! এই শ্মশানের কী কোন পেস্টিজ নাই। কেন ওই ঐতিহাসিক ভুলটা করলি?"

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



উদ্ধারণপুরের শেষ-রাত

(ক) সারাদিন এঁটুলীর মতো লেপটে আছে, আমার সাথে ইসলাম মিঞা। এতটুকুও ক্লান্তি নাই তার **'খিদ্‌মদ্‌গারীর'**। সারা দিনে যত মড়া আসছে, তার শুদ্ধি করে দিতে হবে—আমার মত এক **'গজিয়ে ওঠা'** শ্মশান-ভৈরবকে! না হলে, চিতাভস্ম গঙ্গায় দিলেও, মুক্তি হবে না—মৃতের; অমৃতের স্বাদ সে পাবে না! কেন না, তার শেষ ছাইটুকুকে হাতে নিয়ে বলতে হবে—

"ধর্মাধর্মসমাযুক্তাং লোভোমোহোসমাবৃতম্,
দহেয়ং সর্বগাত্রাণি—দিব্যান্ লোকান্ সঃ গচ্ছতু"!

[এই (মর) শরীরে—ধর্ম-অধর্ম, লোভ-মোহ, যাইই থাকুক না কেন, (হে পরম পিতা অগ্নি), এই মর-শরীরের সবটুকুকে—তুমি দহন করো (ভস্মে পরিণত করো: আর দেখো যে) —দিব্যলোকে তার যেন গতি হয়!!]

এক কথা, এক মন্ত্র—কত আর আওড়ানো যায়? অদম্য ইচ্ছার অধিকারী আর **'ভূত-ধরার' ভিখারী**, সেই ইসলামকে শিখিয়ে দিলাম—আশীবর্ণীর ওই মন্ত্রটা! মানেটাও বলে দিলাম তাকে— ভাল করে বুঝিয়ে! আমার জীবনে "হাফ শেখানো আর শেখা" ব্যাপারটা নাই—ওটাকে আমি বড়ই ঘেন্না করি! নূতন উদ্যমে সে পড়াতে লাগলো মন্ত্রটা, নুড়ো জ্বেলে যে লোকটা মুখে দিচ্ছে মড়াটার! আমার চেলা সে। অতএব না হেলা-ফেলা! না প্রশ্ন, আর উত্তর!

ইস্পাত-শক্ত শরীর, উন্নত-থ্যাবড়া-মুঘল-নাসা; নেশার ঘোরে লাল-লাল চোখ; নূতন শেখা মন্ত্রের অচিন-ঘোর; সব মিলিয়ে—ইসলাম মিঞাকে মনে হলো—**আজরাইল, দোজাখের জ্যান্ত দূত**! ঝড়ঝড় করে পড়ছে খুচ্‌রো টাকা, **'কাঁচি-পাকী'** মদের বোতল! লোভাতুর চোখে চেয়ে আছে শ্মশানের সেই পূজারী! ইসলাম, আর

তাকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বললাম—মন্ত্রটা শিখেনে শালা! কাল্‌কে আমরা থাকবো না! সবই তো তোকেই করতে হবে!" পরম উৎসাহে, প্রাপ্তির আশায় নেশায়; বিকট সুরে সে চেল্লাতে লাগলো ঃ—

"ধর্মাধর্মসমাযুক্তাং লোভোমোহোসমাবৃতম্,
দহেয়ং সর্বগাত্রাণি—দিব্যান্ লোকান্ সঃ গচ্ছতু"!

সারাদিন কেটে গেল এমনি করে, ওই দুই **নন্দী আর ভৃঙ্গীকে** নিয়ে! সাকুল্যে সেদিন হয়েছিল—সাড়ে চার-শ' টাকা, আর ৭-বোতল 'কাঁচি' মদ আর ৩-বোতল পাকী-মদ! ৪-বোতল কাঁচি-মদ শ্মশান-পূজারীকে দিয়ে, ৩-বোতল কাঁচি আর ৩-বোতল পাকী-মদ রেখে দিলাম; আমার নিজের জন্য! আমি এক ৩-কি.লি. মাল্ খাবার মত—কল্‌জে আর পেট্ নিয়ে আসিনি! আমি মাল খেলে, আমার "সেথো" ওরা—শুধু কী চেয়ে চেয়ে দেখবে; ওই শ্মশানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? আমার **"প্যাসাদ্"** তো ওদেরকে পেতে হবে! তাই ওই **'সামান্য ব্যবস্থা'**!

সন্ধ্যে নামছে ঘনঘোর হয়ে, কেন না—লোড্‌শেডিং (Load-Shedding) **'কৃপা করেছে'** সাঁঝের পূণ্য-লগনে! অগত্যা গাব-গাছ-তলায়; ওদের ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বললাম, 'টাকা আমার দরকার নাই। কে বেশী নিবি বল্ তোরা!" ইসলাম বললো, 'টাকা আমার চাই না! আমি চাই **আসল মন্ত্র**!!" শ্মশান-পূজারী বললো, **"টাকাও চাই—ভূত ধরার মন্ত্র চাই!"** অগত্যা দুজনকে ৫০ শতাংশ করে টাকা বেঁটে দিয়ে; মনে মনে বললাম—সব চাইলে সব যায়! কিছু না চাইলে—সবই এসে পায়ে ধরে সাধাসাধি করে! **ইসলাম, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, গোল্লায় যাক শ্মশান-পূজারী, ও' ভিখারীই থাক! আজও ওর চোখ খুললো না!"**

(খ) নামছে রাত। রক্তে-মনে-মগজে আমাদের তিন জনের এখন জলহীন **'জলের উৎপাৎ'**! অবয়বহীন রাতের কালো ছায়াকে, রাতের আঁধারের বেলেল্লা-শরমহীন বেশ্যা ভেবে নিয়ে, উন্মাদ রভসরসে উত্তাল-পাগল হয়ে উঠলো—ইসলাম আর শ্মশান-পূজারী কেষ্ট! 'লাগাম্' একটু আলগা করে, লাটাই ধরে রইলাম—দেখি না, লাট খেতে খেতে কোথায় যায় দেখা যাক্—ওই **আরশুলারূপী** চ্যালারা!

মানুষের মূর্খ জীবন, শুধু নির্বিচারে স্বপ্ন কেনে। মনের ভেতরের তার লোভ-লালসা, যে স্বপ্ন তাকে বেচতে চায়—ফাউ আর বোনাস দিয়ে দিয়ে; সে তা' কখনও বিচার করে না—দেখে বেছে নেয় না; মোহঘোরে পতঙ্গের মত উড়ে যায় তার দিকে। সে জানে না যে—ওই রাত আর তার বরাৎ, ছলনার জাল বিছিয়ে রেখেছে; মাকড়সার

মতো তাকে চুষে-শুষে খাবে বলে! সে নিতে যায়, নিতে চায় সেই শেষ তৃপ্তিসুখ— যা' কোনকালে জীবন্ত কারুর পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়! তা' শুধু মেলে মরার আগে— যখন নারী বা পুরুষ তা' উপভোগ করে—মৃত্যু-মুহূর্তে !

কেমন সে রূপ? আসুন চেখে নিই খানিকটা তার! বাঘ-সিংহ-যখন হাতি-মোষ- বা অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করে, তখন লড়াইতে হেরে যাওয়া ওই প্রাণীদের প্রাণ তো যাইই। আরও একটা জিনিস যায়, তার নাম হলো রজঃ বা বীর্য্য—যা' ক্ষরিত হয় লিঙ্গ বা যোনীমুখ থেকে; মরার মুহূর্তে লড়াই করতে করতে ভয়ে। তাই, দেখা গেছে শব-ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে যে, অসহ্য আর সীমাহীন সঙ্গমানুভূতি না হলে, কারুরই ওই রকম বীর্য্য বা রজঃ স্খলিত হয় না!

সাপ যখন কোন প্রাণীকে গিলে, বা কুমীর যখন কোন প্রাণীকে টেনে নিয়ে যায়; তখনও স্খলন ঘটে ওই ভাবেই। প্রকারান্তরে বাঘ-সিংহও দাঁতাল হাতিদের পাল্লায় পড়ে মরে কখনো কখনো। তাদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে-একই ঘটানার পুনরাবৃত্তি! গলায় দড়ি দিয়ে মরা নারী-পুরুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে-ওই রেতঃ-রজঃ স্খলন মরার আগে। বিজ্ঞানীরা আজ নিঃসন্দেহ যে, মরার আগে অসহ্য সঙ্গমানুভূতির ফলেই এই স্ফলন!

তাই জীবন যতক্ষণ আছে, ওই পরম সুখ আস্বাদন করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ মানুষ বেঁচেও থাকতে চায়, আবার চরম পরম সঙ্গমসুধাও চাটতে চায়! তা' তো সম্ভব নয়! অথচ কামনার সব ডালা সাজিয়ে বসে থাকে, কামনার কামিনী রাত্রিরূপে শ্মশানে! কোন উপচারের অভাব নাই সেখানে। চারিদিকের এত প্রলোভনকে, জন্মের পর থেকে দেখেও—মানুষ তবু শেখে না, কোনটাকে বেছে নেওয়া জরুরী!

শরীর নিয়ে জন্মায় প্রাণী, মরে যায় যখন সেই শরীরটা ছেড়ে দিয়ে; তখন সেই শরীর পুড়ে ছাই বা পচে মাটি হলেও—তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা এতকালের অতৃপ্ত বাসনাব যে ক্ষয় হয় না! সেটা যে পুড়ে না বা পচে না।! শুধু উড়ে বেড়ায় ঘট থেকে দেহঘটে! আর আঙলিয়ে বেড়ায় গোটা জীবনটাকে, অধরাকে ধরতে!

এত কথা, এত চিন্তা—সবই কেমন যেন পাগল করে তুলছে। একটু একটু করে নামছে, সন্ধ্যার সেই বুক কাঁপানো অন্ধকার—ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলা চিতার সাথে কোলাকুলি করে! রাতের চেহারা এখন থুত্থুরে লোলজিহ্বা ধূমাবতীর মতো, যেন পুরো সংসারটাকেই সে চিবিয়ে খেতে চায়---রাতের আঁধারে আশ মিটিয়ে!

কোটরগত তার দু'টো চোখে যেন ঝরে পড়ছে লোভ আর লালসার জল;

সড়াৎ সড়াৎ শব্দ করে সে যেন গিলছে সেই উজিয়ে ওঠা জলকে। বুকের ভেতরে কোথায় যেন মোচড় লাগছে, নিজেকে সামলাতে গিয়ে—হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠলো। এ' যন্ত্রণা আমি বুঝাই কেমন করে, ইসলাম বরকৎ মিঞাকে?

শ্মশান-ভৈরব সেজে বসে আছি, মহাকাল ভৈরবের মুখোশ পরে, তার আর তার গিন্নির রাজত্বের মাঝখানে। অথচ তাকে প্রাত্যহিক পূজা না চড়িয়ে। ক্ষেপে গেলে সব **সাধনার চৌপাট** হয়ে যাবে, পদে পদে ঘটবে যত বিঘ্ন আর বিপদ। করজোড়ে মনে মনে তাই বললাম ঃ —

"ওঁ হুঁ ক্ষৌঁ যাং রাং লাং বাং আং ক্রোঁ,
মহাকাল ভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয়;
হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা!"

তিন তুড়ি দিয়ে মাথার উপর—তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, যত বিপদ আর বিঘ্নকে! তাড়াব বললেই যদি তাড়িয়ে দেওয়া যেত; তবে কত অমন বিপদ-বালাইকে তাড়িয়ে দিতে পারতাম! সারা জীবন কী করতে পেরেছি? কাজের কাজ কিছুই করতে পারিনি আজও—গুছিয়ে নিতে পারিনি কিছুই! সবাই কেমন সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে, পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে আরামসে; আর আমি শুধু মাছি তাড়াচ্ছি। রাজা হতে পারলাম না, রাজার কুত্তাও হতে পারলাম না। লেড়ি কুত্তা হয়ে থেকে গেলাম চিরটা কাল!

ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকানো, সেই রাতের অন্ধকারে উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ে থাকতে থাকতে; জ্বালা করে উঠলো চোখ দু'টো। বুকে জাগলো ঠা—ঠা তেষ্টা! কেমন করে সেটা মিটবে? অগতির গতি ইসলাম খুলে ফেললো, একটা পাকী বোতল। সড়াৎ করে ছোঁ-মরার মত সেটা নিয়ে, প্রায় অর্ধেকটা তার গলায় ঢাললাম—যদি কিনা শান্তি হয় কিছুটা সেই তেষ্টার!

আকাশে পাকিয়ে উঠছে মেঘ, নদীয়ায় ওই পারে। সামনে দীপাবলীর সেই গভীর অমাবস্যা আসবে। দু'চারদিন আগে থেকে, সে যেন জানান দিয়ে যেতে চায়—সে আসছে বন্যা-ঝড়-বাদল সাথে নিয়ে; নাচবে গোটা বর্ধমান-নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম জুড়ে; উড়ন্ত **চিত্রলেখা** আর **উষার** সাথে; উদ্ধারণপুরের মড়াঘাট হবে তার. সেই ক'টা দিনের **নাটমঞ্চ**!

গাব-গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ও'কে? গোটা শরীরটা যেন তার ধোঁয়া দিয়ে

তৈরী! বড় বড় দাঁতের পাটি তার জ্বলছে—রাতের আঁধারে। রক্তলাগা মুখে একটা কচি বাচ্চার হাত, সে চিবিয়ে চলেছে আপন মনে; কোমরে ট্যানার মত করে পরা এক টুকরো বাঘের ছাল; সমস্ত বুক-স্তন-পেট জুড়ে ঝরে পড়ছে কাল্‌চে রক্ত! যেন সেটাই তার রক্তবাস! তিনটা চোখ তার। জটায় জড়ানো চাঁদের ফালিটায় ঝল্‌কে ঝল্‌কে ঘুরে মরছে বিদ্যুৎরেখা; গলার মড়ার মাথার খুলির মালায়, লাগছে বিকট ঠোকাঠুকির দোলা! এ'কে তো ডাকিনি এখনো আমি! না চাইতেই কী তবে সে এসে গেল? এতটাই কী সুন্দর কপাল করে এসেছি!

উদ্বেগভরা মুখে তাকালো বরকৎ, আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে। ওপারে বাজ পড়লো সশব্দে, অসহ্য আলো ছড়িয়ে। এপারে ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে থাকা, বট গাছটার মাথাটাকে দু'হাতে জাপটে ধরে—কেউ যেন উপড়ে ফেলে দিতে চাইছে গঙ্গায়। ইসলামকে চুপি চুপি বললাম, "চোখের পলক ফেলবি না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক, ওই বেটীর দিকে। আমাদেরকে পরীক্ষা করছে, বুকের পাটা আছে কিনা। দাঁড়া বুক চিতিয়ে—বাপের ব্যাটা হয়ে। ঘাবড়াস্ না, আমি আছি। নে আমার চিমটে-টা—বাগিয়ে ধর আশাবাড়ীর মত; ওটা ওরই দেওয়া। বিপদ দেখলে—আগুন উগরাবে গলগল করে ও'টা।"

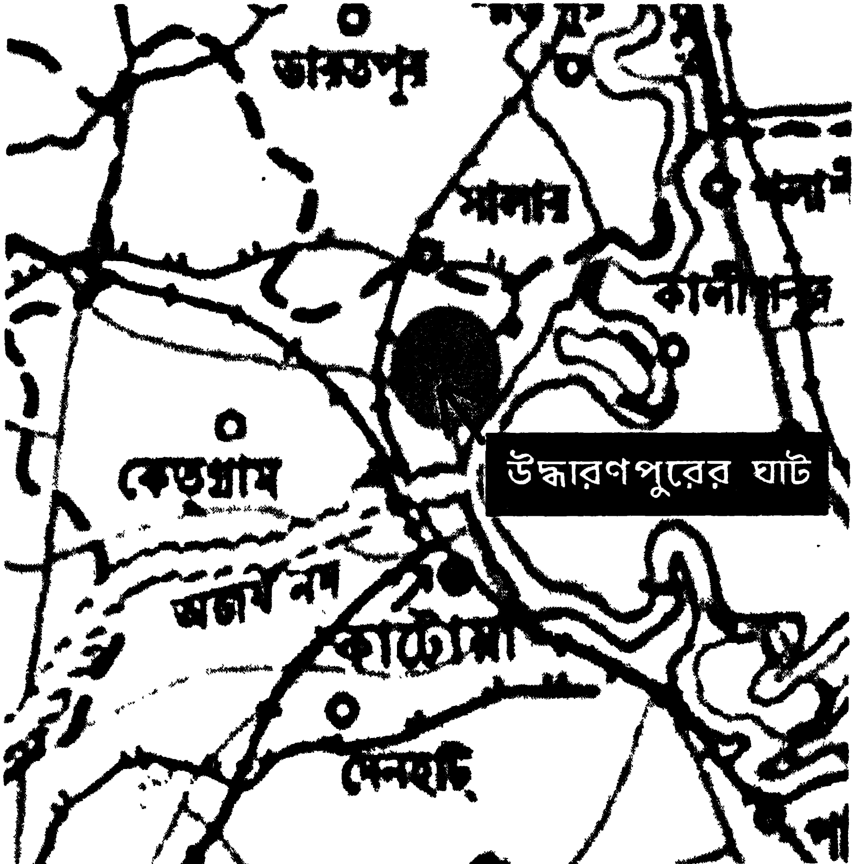
শুরু হলো বিষম শিলাবৃষ্টি। গাবগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম দু'জনে। শিলাবৃষ্টি ছাপিয়ে—শুরু হলো ইঁট-পাটকেলের বৃষ্টি, হাড়-কঙ্কালের বৃষ্টি! সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যেতেই—চেঁচিয়ে বললাম, "আর সহ্য হচ্ছে না। হে পরমময়ী, তুমি প্রসন্ন হও! ইসলাম তোমারই সন্তান। ও' তোমার বরাভয় চায়! আবার কড়কড়িয়ে পড়লো বাজ, কাছে-পিঠে কোথাও! দুই কানে তালা লেগে গেছে। গোটা উদ্ধারণপুর ঘাটের আশে-পাশের বাড়ীতে, একটাও প্রাণী বেঁচে আছে বলে মনে হলো না। হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল ঝড় আর বৃষ্টি! সব কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেছে; কোন এক যাদু-মন্ত্রবলে!

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাবার যোগাড় হয়েছে। একটা বোতল আবার তুলে নিয়ে, কারণ দিয়ে স্নান করালাম মার্কণ্ডেয় মন্দিরের চিমটেটাকে। বাকী মদটুকু পান করলাম ইসলাম আর আমি। ভেজা আসনে বসতে গিয়ে চমকে উঠলাম। কই, এত শিলাবৃষ্টিতেও তো ভেজেনি সেটা! তবে এতক্ষণ কী ভ্রমের ঘোরে ছিলাম? কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা, তার খোঁজ করতে চলে গেল ইসলাম। একটু পরেই সে ফিরে এসে বললো, "বড্ড দেরী হয়ে গেল। ঝড়-বৃষ্টি আর বাজ পড়ার দাপটে, আসতেই দিল না লোকেরা শ্মশানের ভেতর!"

হাঁ করে গিলছিলাম তার কথাগুলো! তবে এতক্ষণ যে আমার সাথে ছিল,

সেই বা কে? চিমটাটার দিকে একবার তাকিয়ে, সেটা মাথায় ঠেকালাম ইসলামের। বললাম, "লোকেরা আসতে না দিয়ে, ভালই করেছে। অনেক কিছু বিপদ আপদ হতে পারতো!" গভীর দৃষ্টি হেনে মুখের উপর ইসলাম অভিমানের সুরে বললো, "বেইমানী আমি করি না বাবা! ওরা আমাকে আপনার কাছে আসতেই দিল না!" তার চোখে টলটল করে উঠছে জল।

বুকে জাপটে ধরে বললাম, "তুই তো এতক্ষণ এখানেই ছিলি! বরং বেইমানী যে করলো, সেই ব্যাটা এখন পালিয়েছে। আসনের দিকে তাকিয়ে দেখ্, তোর জন্য রেখে গেছে সে—তস্‌বী আর টুপী—তোর নামাজ পড়ার জন্য। যতদিন বেঁচে থাকবি, এগুলো হাতছাড়া করিস না। পাঁচবার নামাজ পড়ার সময়, এগুলো নিয়েই নামাজ পড়িস। আল্লার দোয়া পাবি! এগুলো নিয়ে এখন একবার নামাজ পড়তো বাবা! সুব্‌হান্ আল্লাহ!"



পাঠকের দরবারে

*** মহাস্থান কেতুগ্রাম, মধ্যরাঢ়**
মনোহর শাহী পরগণা

প্রীতিভাজন,
শ্রী সোমানন্দ অবধূত

অট্টাট্টহাসিনীর অট্টহাসে পুস্তিকা সম্পর্কে—এই পুস্তিকাখানি সরাসরি আমার **পাওয়া ন্যায্য ও অগ্রাধিকার ছিল**, এবং তৎসঙ্গে **নর্মদাতীর্থ হ'তে** ২য় খণ্ড খানি অন্ততঃ! বদলে, আমার কাছে অন্ততঃ **পাঠিয়ে দিয়েছে মা**। লেখক যাকে দিয়েছে—তার এক বয়োকণিষ্ঠ ভক্ত-বন্ধুর মাধ্যমে।

বইখানির **৭১ পৃষ্ঠায়—'প্রত্যক্ষ দেখায় আর অনুভবে'** যে মহাত্মা এই বইখানি পাওয়ার সাথে সাথে, লেখক পরিচিতি পৃষ্ঠায় **উচ্ছ্বাসের আবেগ লিখেও,** পরে অন্য কোথাও কোথাও ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠায় **লাল-কালির দাগ দিয়ে**—'ভুল' বা ৩৯ পৃষ্ঠায়—সব **মাতালদের অভদ্র কথা—এই মন্তব্য করে; ৬৫ থেকে ৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ৭ (সাত খানা) পাতা কেটে নিয়ে,** বইখানা **অভদ্র-অশ্লীল** ইত্যাদি মন্তব্য **সিঞ্চিত** করে—ওই ভক্তবন্ধুকে দিলে, **সে আমাকে এনে দেখায়।**

ছেঁড়া-পাতা ৪-খানা অবশ্য **লাল-সূতোয় বাঁধা ছিল**, ওই পুস্তকের সাথে। আমি ওই **সূতো ফেলে দিয়ে**, ওই ছেঁড়া-পাতাগুলি আবার **সংযোজিত** করেছি। একদিন তিনি স্বয়ং এসেছিলেন, বইখানি নিতে (গত রবিবার ২৪/২/০৮); আবার আজ (২৮/২/০৮) হেল্‌থ-সেন্টারে **যাবার পথে**। আমার জানালায় আমাকে দেখে বলে গেলেন, কিন্তু ...... আসেন নাই। **ওই জানালাতেই দেখেছি—লেখক যখন কেতুগ্রামে বহুলা মহাপীঠ এবং বহুলাক্ষী মন্দিরে হোম করেছিলেন, শিষ্য-বন্ধুদের হিতার্থে!**

পত্র পাওয়ার পরে, এই বইখানির **এক কপি**, নর্মদার অন্ততঃ **২য় খণ্ড এক কপি** আমি অবশ্যই অমূল্য **উপহার স্বরূপে** পাচ্ছি; এবং ওই **বৈদিক সাধুর** ওই কপি তাঁকে ফেরৎ দেবো, কিংবা ওটি **আমার কাছে রেখে, নূতন খানা দেবো**—তাও জানতে পারবো। যে বিবরণ দিলাম, তাতে ও'নার বইখানা আমার কাছে **থাকাই আবশ্যক সত্য-রক্ষার প্রয়োজনে**। না হলে—আমার বিবরণটা (উনি) **মিথ্যে করে দেবেন।**

এই বইতে যে সব বিবরণ—সে বিষয়ে কিছু **বলার আছে**। পরে বলছি—

আপাততঃ একটি কথা বলি। ৩৮ বছর আগে **বহুলা মহাপীঠে সনৎ বাবাকে ভৈরব হিসাবে উক্তিটি, কোন দিক থেকে সমর্থনযোগ্য করতে পারবেন না।** আর অট্টহাসেও সে সময় যে **ভৈরব ছিলেন, তিনি একক।** তাঁর সঙ্গে কোন **ভৈরবী ছিলেন না। পূর্ববঙ্গ আগত ভৈরব-ভৈরবীর পঞ্চমুণ্ডীতে আসা এবং বর্ণনা সম্বন্ধে, আমার কিছুই বলার নাই, বরং ভালই মনে হলো। এরকম অনেকে অট্টাহসে ও বহুলাতেও আসেন একক বা যুগলে।**

অট্টহাস-ফুল্লরা থেকে বহুলা—এই যুগ্মপীঠে হাসির কথাটা বেশ ভাল করেই বলেছেন। তবে—তবে **এক-জ্যোতির** পরিক্রমার **কথা তো নাই!** লাবপুরে **ফুল্লরা নয় বলেছেন।** কিন্তু লাবপুরই ফুল্লরা, তা তো বলেন নাই। ওখানে দেবী অঙ্গের **ফুসফুস** থাকে। ওখানকার লোকে বলে **"ফুলঘরা-টাই"** পড়ে ছিল, যেটা প্রস্তরীভুত হয়ে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে— ঘর জুড়ে গিয়েছে, একশ বছরের মধ্যে। আর এর ভৈরব অজয়তীরের বিশ্বেশ নয়, কীর্ণাহারের কাছে **আলিগ্রাম-জিবুটির জম্পেশ্বর** হওয়াই সঙ্গত!

কেতুগ্রাম থানা এলাকা ও কাঁন্দি মহকুমা—দু'টিই সেদিনও পর্য্যন্ত (১৯১৫-১৬ সালেও), **বীরভূম জেলার মধ্যেই ছিল।** জ্ঞানদাস-কাঁদরায় মুন্সেফী আদালত ছিল। গাজন-উৎসবে ৫০০/৬০০ বছরের কেতুগ্রামের, বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ .... জল .... **গোমাই গ্রামের** উপর দিয়ে এক বিশেষ বাজনা নিয়ে, **যাওয়ার বিরুদ্ধে,** গোমাইগ্রাম **মোকর্দ্দমা করায়;** সিউড়ীর জেলা আদালতে **রায়-বিচার হয়** এবং কেতুগ্রামের ডিক্রি হয় (১৭৬০/৬৫?)।

পঞ্চ ম-কার সম্বন্ধে বেশ সুন্দর কথা হলেও, মুখ ও অধঃদেশ প্রসঙ্গে অনেক কথা বললেও; মধ্যদেশ (বুক) প্রসঙ্গে কিছু পেলাম না। অথচ বুক .... বৃত্তমধ্যে মদনের পূজা বিধেয় কপালে এবং অধোদেশে ত্রিকোণ, নবপুষ্পও স্তনমর্দ্দন ও নখরাঘাত, রহস্যোল্লাস ও রাসোল্লাস উভয় ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে।

মা-মাই-মাটি বিশ্লেষণ এবং শ্রীরাধার উক্তি—নবকুচে নখ দেখি, জীউ মোর কাঁপে ... — স্মরণীয়! ৩/৪ .... ৮০ **উর্ধ্ব।** মাতৃভক্তির দাবী নিয়ে, **কনিষ্ঠকে এতসব লেখা 'সহজে'।** ভালবাসা শুভেচ্ছাসহ—অকিঞ্চন পাথর।

স্বাঃ — রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
কেতুগ্রাম — ৭১৩১৪০,
জেলা — বর্দ্ধমান

To
শ্রী রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু,
কেতুগ্রাম — ৭১৩১৪০, জেলা — বর্দ্ধমান

সুধী মহাত্মন,

বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে আপনি প্রথমেই আমার **প্রণাম নেবেন**। গভীর ভাবে যে **পড়াশুনা করেন**, চিঠিতেই তার **প্রমাণ মিলেছে**। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আপনাকে আমি আগে **চিন্‌তাম-জানতাম না বলে**। আপনার সাহিত্য-সভার সংগ্রহে **থাকবে** বলে, আমি এক সেট বই পাঠালাম। পড়া আর আলোচনার পর, আপনাদের **মন্তব্য লিখে পাঠাবেন**—এটুকু আশা করি। সঙ্গে ফোন নম্বর দিলাম — ৯৮৩০৪৭৯৩২৪, কথাও বলতে পারেন সকালে ১০ টার মধ্যে, অথবা রাত্রে ৭টা থেকে ১২ টার মধ্যে।

দুঃখের বিষয় এই যে, কেতুগ্রাম এত বিখ্যাত জায়গা হয়েও, চিঠি পেলাম, প্রায় ১ মাস ১০ দিন পরে। আমার এই চিঠি আর বই কবে যে পাবেন, তা' একমাত্র মা-বহুলাই জানে!

আপনার হাতের **ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা** উদ্ধার করতে, বড়ই কষ্ট হয়েছে। এবার যখন লিখবেন, একটু বড় হরফে লিখলে বাধিত হবো। অনেক **অজানা তথ্য** আপনি পরিবেশন করেছেন। এ' জন্য **কৃতজ্ঞ আমি**। প্রমাণ ছাড়া আমি কোন কিছু লিখি না, বা বলি না। গোলা-পাবলিকের **গালগল্পেও** আমি শ্রদ্ধা রাখি না। প্রাচীন **ভারতীয় শাস্ত্র (সংস্কৃত) ছাড়া**, আমি কারুর গল্পে বিশ্বাস করি না। কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস ওঝাকে, আমার **বাঙ্গালীর বোঝা** বলে মনে হয়। আমি **বেদব্যাস, বাল্মিকী**, বুঝি। **বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ** বুঝি। বাকী কোন্ মিঞা কী বললো—তা' মানি না।

আমার লেখার সমালোচনায় (?) যারা **মুখর হয়েছে** লিখেছেন, **তাদের বিদ্যের দৌড় আমি জানি**। আমার একটু পাণ্ডিত্যের **অহংকারও আছে**, আর সেটা **মা নর্ম্মদা** (মহাদেব আর মহাকালীর **হ্লাদিনী-কন্যা**) প্রদত্ত। **অশ্লীল আর মাতালের কারবার** বলে যারা বলেছে, তারা যে কোনদিন স্কুল-কলেজের **বারান্দায় উঠেনি**—সেটা **হলফ করে** বলতে পারি। হিন্দুদের মুসলমান আর খৃষ্টানদের এমন কোন **Original বই নাই**, যা' আমি পড়িনি।

আজ **৬৫ বছর ধরে** সেগুলো আমি পড়ছি, আর তা' নিয়ে **গবেষণাও করছি**। কলকাতা High Court-এ চাকরী করার সুবাদে, প্রধান বিচারপতি Sir John

Woodroffe -এর **গবেষণামূলক** বইগুলো, আমাকে ও্ই কাজে **উৎসাহিত** করেছে।

আমার লেখা বই নিয়ে আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মান এবং ভারতের বিভিন্ন পণ্ডিতেরা গবেষণা চালাচ্ছেন। দেশ-বিদেশের বহু বিদগ্ধ মানুষ, আসেন আমার কাছে—আমাকে খুঁজতে খুঁজতে— নর্মদা আর কালীকে জানতে।

সংসার জীবনে তো আমরা সবাই **পঞ্চ ম-কার করি**—আমাদের অজান্তে। তার একটা মোটা-মোটা গালভরা নাম হলো—**বিবাহ**। সেটা কী **যোনী আর লিঙ্গের** আশ মেটানোর **খেলা নয়**? আর ওই কর্মের মধ্য দিয়ে কী আমরা **শ্রীকৃষ্ণকে, ব্যাসদেবকে, ভীষ্মকে, শ্রীরাধাকে পাইনি**? শ্রীদুর্গাও তো তার **মা মেনকা** আর **দক্ষ প্রজাপতির লিঙ্গ আর যোনীর ফসল**। তবে এত alergy **কেন! গো-মুখ্যুদের কথায় কান দিয়ে লাভ নাই**। পড়লে, Original বই পড়ে নেবেন **সুযোগ** হলে। বটতলার ঝোঁতারামের **খেউড় বই** পড়বেন না।

সাহিত্য-সভায় আজকাল, সাহিত্য বা শাস্ত্র আলোচনা হয়? না কি; হয়—**রাজনীতি** আর ইট-পাটকেল **মারামারির গল্প**। সর্বত্র একই দৃশ্য। লাইব্রেরীতেও কেনা হয়—২৫/৩০ টাকার বই, বা মেরে কেটে ৫০/৬০ টাকা দামেরও।

ওই সব লক্ষ্মীর পাঁচালী বা শনির পাঁচালী, বা **পেঁচোর-পাঁচালী** ছাড়া ওখানে অন্য কিছু নাই। ওই পড়লে মস্তিষ্ক **উর্বর হয় না—বর্ব্বর তৈরী হয়!** আর সেই জন্যই আমরা ছুঁড়ে ফেলেছি—**সংস্কৃত শাস্ত্র-সম্ভারকে**। এখন আবার **বইমেলাগুলোতে**— Political party-এর নির্দ্দেশে, **বস্তাপচা** বই কিনতে বাধ্য হয় **লাইব্রেরীগুলো**, কেন না—grant এর টাকার **75% চলে যায়** party fund -এ এবং Cader-দের Comission **দিতে দিতে**। ২০০০ টাকা দিয়ে **বুঝবার মতো**, আমার বই কেনা তো সম্ভব নয়! **বুঝদার পাঠক তাই বোবা হয়ে যায়!**

"**অট্টাট্টহাসিনীর অট্টহাসে**" বইটি আলাদা কোন **বইই নয়**। ও'টা "বীরভূমের পথে প্রান্তরে"—এর **২য় খণ্ডের অংশ মাত্র। এখনও ছাপা হয়ে উঠেনি অর্থাভাবে। অট্টহাস আর মড়াঘাটের বহুলা মন্দিরের, সংস্কারকল্পে যে অর্থের প্রয়োজন, ওই বই ভক্তদের কাছে বিক্রী করে; যদি কিছু টাকা আসতো, সেই উদ্দেশেই Sample হিসাবে ওটা পাঠিয়েছিলাম—ওখানকার মহারাজদেরকে। ওরা রাজী থাকলে—আমিই ছেপে পাঠিয়ে দিতাম, আর বিক্রি করে টাকাটা পেতো ওই দুই মন্দির কর্ত্তৃপক্ষ!**

ভালই হয়েছে— মা হয়তো চায় না, ওই গবেষণামূলক বই **গণ্ডমূর্খদের হাতে পড়ুক— যারা 'বাপ' বললে 'শালা' বুঝে**। মদ-তাড়ি-গাঁজা খেয়ে সন্ধ্যেবেলায়

ল্যাংটা হয়ে হরি-কেত্তন করে। হরি দেখা দেয় না। সংসারের চাপে পড়ে যখন **হাড়ির হাল হয়**—তখন 'হরি-হরি' করতে করতে দৌড়ায়, **শনি-শীতলা-কালী মন্দিরে, হোম-যজ্ঞ, তাবিজ-কবচ-ঝাড়ফুঁক-গ্রহরত্ন** পরতে। অথচ আসল বই পড়লে—নকল ওই সবের **দরকার-ই হতো না কোন দিন**।

ওই বইটি যাঁর থেকে পেয়েছেন, তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিন, মন্তব্যগুলো Xerox করে নিয়ে। **"বীরভূমের পথে প্রান্তরে—২য় খণ্ড" ছাপা হলে ডাকযোগে পেয়ে যাবেন**। এবার বিদায় নেবো। আবার প্রণাম জানাই। শুভমস্তু।

ইতি —

সোমানন্দ অবধূত

ফোন - ৯৮৩০৪৭৯৩২৪

মাননীয়,

সোমানন্দ অবধূত

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

১. আপনার লেখা 'নর্মদাতীর্থ হ'তে'—**১ম থেকে ৯ম খণ্ড এবং বীরভূমের পথে প্রান্তরে** পড়লাম। প্রথম পাঠে বেশ কিছুটা বিষ্ময় ও আবেগ থাকলেও, পুর্নবার পাঠে তার **ঘোর কেটে যেতে**; খুব বেশী দেরী হয় নি। অমরকণ্টক থেকে ওঁকারেশ্বর মায় 'মর্দ্দানাঘাটে ফিরে আসা' পর্যন্ত আপনার যাওয়া, দেখা এবং জয় করা প্রসঙ্গে কিছু কথা, যা মনে হয়েছে বলার চেষ্টা করলাম। আপনার অধীত শাস্ত্রজ্ঞান, এবং বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তার পরিবেশন সম্বন্ধে; **সবিশেষ প্রশংসা** থাকলেও কিছু প্রশ্নের **অবকাশ থেকেই যায়**। প্রথমতঃ বাংলার কিছু বিশেষ অঞ্চলের কথ্যভাষা, আপনার লেখনীকে সুষমামন্ডিত ও শ্রুতিমধুর করলেও—যে সব শব্দ নানা স্থানে নানা অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে; তা পাঠককে কতটা **আরো রুচি সম্মত** করে তুলতে সাহায্য করবে; তা ভাবনার দাবী রাখে।

২. অনস্বীকার্য যে, রচনা লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত হলেও—প্রকাশের মাধ্যমে যখন তা পাঠকের সান্নিধ্যে এসে পড়ে; তখন তা আর **ব্যক্তিগত থাকে না**। পাঠককে প্রভাবিত করার দায়, তখন লেখকের **কাঁধে এসে পড়ে**। সবিনয়ে বলি, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে; ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকরা যে শব্দগুলিকে, এতদিন **সযত্নে পরিহার করে**; ইঙ্গিতে বা তার পরিপূরক শব্দবন্ধে তাকে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন—সেই **"এ্যাঁদাড়ে"** (কথা সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার কৃত)

শব্দগুলিকে ব্যবহার করে, সত্যিই কি মনে হয় বাংলা ভাষার উৎকর্ষকে; বেশ খানিকটা বৃদ্ধি করে—পাঠকের রুচিবোধকে অধিকতর পরিশীলিত করা যাবে? তাহলে তো ধরে নেওয়া যায়, পারিবারিক বা সামাজিক কথোপকথনে; ঐ সব শব্দ ব্যবহারে সোমানন্দ মহারাজ; আপত্তির কোনো কারণ-খুঁজে পাবেন না। মনে রাখা দরকার যে, অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করতে গেলে, বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করতে হয়। একথা স্বয়ং ঋষি কবির। আর "দেশকালস্বভাববিরুদ্ধার্থানি লোকবিরুদ্ধানি" অর্থাৎ যা দেশ, কাল বা স্বভাব বিরুদ্ধ তাই-ই লোকবিরুদ্ধ একথাও সর্বজনবিদিত।

৩. এবার বিশেষণ ও রসপ্রয়োগ প্রসঙ্গে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। যেমন 'রমণ' শব্দটিকে, আপনি বহুবার 'উদ্দাম' শব্দ দিয়ে বিশেষিত করেছেন। এতে রমণকে রমণীয় করা হল, না ধর্ষণে রূপান্তরিত করা হল, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কৃষ্ণ কি রাধাকে শুধু শারীরিক রমণই করেছেন? পূর্ণ রমণীয়তা দিয়ে, তাকে কি প্রকৃত রমণী (পরমা প্রকৃতি) করে তোলেন নি? পতঞ্জলিও কিন্তু শব্দের অন্যথা উচ্চারণকে অপশব্দ বলেই উল্লেখ করেছেন ঃ - "তেহসুরা হেলয়ো হেলয়ো ইতি কুর্বন্তঃ পাবভূবুঃ . . . . . ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছ হ বা এষ যদপশব্দঃ।।" এছাড়া অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে "অন্যস্য যঃ প্রসঙ্গে রসস্য নিপতেদ্রসঃ ক্রমাপেতঃ / বিরসোহসৌ স চ শক্যঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতুং প্রবন্ধেভ্যঃ।।" অর্থাৎ রসবিশেষের বর্ণণাবসরে তার বিরোধী রসান্তরের অবতারণায় যেমন রসভঙ্গ হয়, তেমনি একই রসের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী হয় না।

৪. অথচ এই কাজটিই আপনি, ক্রমাগত করেছেন—প্রায় প্রতিটি খণ্ডে। তা সে আপনার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, প্রবচন বা পঞ্চ ম-কার সাধনের উপযোগিতা ও এ্যানাটমির পাঠ থেকে হুবহু তুলে আনা; দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য ও তার দুঃসহ সিদ্ধান্ত, কোথাও এর কোনো যতি পড়েনি। ভাবতে অবাক লাগে "কুলধর্মামিমংজ্ঞাতা সুচ্যন্তে সর্বমানবঃ। ইতি মত্বা কুলেশানি ময়া লোকে বিগর্হিতম।"—এই কুলধর্ম (পঞ্চ ম-কার) জেনে সব মানুষ মুক্ত হয়ে যাবে মনে করে, আমি লোকসমাজে এই ধর্মের নিন্দা করেছি, কুলাণবতন্ত্রে স্বয়ং শিব একথা বলা সত্ত্বেও লেখক কেনই বা এসব নিয়ে এত অর্গলহীন সোরগোল ফেললেন, আর ঈশ্বর কোটির সাধুমাতৃকাগণ, যাদের লেখক "কেউ কেউ দেখিবারে পায়" এই আপ্তবাক্যের সার্থকতায় পরিচিতি ঘটিয়েছেন, তাঁরাই বা কোন সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে—এই শিববাক্য লঙ্ঘনের পথ সুপ্রশস্ত করালেন; তা নিয়ে বিভ্রান্তি থেকেই যায়।

৫. একথা জ্ঞাত যে, মহানির্বানতন্ত্র মতে "প্রবল কলিকালে তু ন কুর্যাৎ

চক্রগোপনম্।" অর্থাৎ ঘোর কলিকালে চক্র (পঞ্চ ম-কার সাধনানুষ্ঠান) গোপন অনুচিত। তাহলে তো ঐ তন্ত্রমতেই "শেষ তত্ত্বং মহেশানি নিধার্যে প্রবলে কলৌ। স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্বদোষবিবর্জিতা।" — বীর্যহীন ঘোর কলিতে নিজ স্ত্রী ছাড়া, পঞ্চ-ম তত্ত্ব সাধন দোষের হতে পারে, একথাও মানতে হয়। লেখক তো তা বলেন নি, বরং 'বাবা-মা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, মাসী-পিসি সবাইকে নিয়ে পঞ্চ ম-কার করা যায়' (৮ম খণ্ড ২৬৪ পৃষ্ঠা) বলে গোলা পাবলিক (লেখক কৃত) দের উৎসাহিত করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সহায়ক হিসাবে তিনি দৃষ্টিপাত করতে বলেছেন প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষির সাধুসঙ্গ' বইটির কামাখ্যা চ্যাপ্টারে। অথচ ঐ বইটিতেই স্বয়ং অঘোরীবাবা, এই সাধনাকে কেন গুহ্য রাখতে হয়েছে তার ব্যাখ্যা করেছেন খুব সঙ্গতভাবেই। সোমানন্দজীর জ্ঞাত থাকলেও উদ্ধৃতিটুকু আবারও স্মরণ করার লোভ সামলাতে পারলাম না — "হাজারে একটা মানুষ সাধনের পথে যায়। তাছাড়া শরীরের মধ্যে যে সকল সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম নাড়ী, প্রাণশক্তির ক্রিয়া আর অনুভবের নানা স্তর, স্থুল সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বা বোঝানো যাবে কি করে। অনুভবের কি ভাষা আছে? তার উপর কাম-মার্গের ব্যাপারে কতই না জটিল—লিঙ্গ থেকে মস্তিষ্ক অবধি প্রাণমার্গে তার ক্রিয়া; রেত বা ধাতুকরণের কত প্রকার ভেদ, অন্তঃক্ষরণ, বহিঃক্ষরণ, কেমন ভাবে কোন্ কোন্ ক্রিয়ার ফলে বহির্গতি বন্ধ করে অন্তরমার্গে গতিমান করা যায়, এসকল ব্যাপার প্রকৃতি যখন গুহ্য রেখে দিয়েছেন, তখন কেন তাকে অত প্রচার করবার জন্য মাথা ব্যথা .....। এই কামকলা, যা নিয়ে এই বিরাট সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ব্যপার দিবারাত্র চলছে তার যতরহস্য মানুষের শরীরের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা থেকে শুরু করে কামের উদ্দীপন, যে ভাবে দুজনের উপর দুজনের চৈতন্য থেকে আরম্ভ করে মনের ভিতর দিয়ে শরীরের উপর টান—তারপর মৈথুনে দুটি এক হয়ে যাওয়া, তারপর পরাণশক্তির ঘন-স্পন্দনের উদ্দামলীলা, শেষে উভয়ের স্খলন, যে ক্রমে প্রথম থেকে শরীরের নানা সুক্ষ্ম নাড়িগুলির ভিতরে যে যে ভাবের ক্রিয়া হয়— তার প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রত্যেক ফলটি কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? এ সবই অনুভব সিদ্ধ ব্যাপার,—পূর্ণবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থুল, তুচ্ছ বাস্তব প্রমাণ দিয়ে এসব লোক সমাজে কি করে প্রকাশ করা যাবে? কামের প্রথম প্রেরণা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ পরিনতি পর্যন্ত, যে সকল ব্যাপার তাই তন্ত্রে পতিপাদ্য বিষয়; এ সকল কি করে মানুষকে ন'কড়া ছ'কড়ার হিসাবে বুঝানো যাবে .... ?"

৬. অনুমেয় যে, 'পূর্ণবিজ্ঞান' বলতে অঘোরী বাবা নিশ্চই জড় বা ফলিত বিজ্ঞানকে বোঝান নি। "পরম বিজ্ঞানের ব্যাপার মহাশক্তির অন্তঃপুরের খেলা। ইচ্ছাশক্তি, এমনকি ঈশ্বর, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টির মূল কারণ, কিন্তু ঈশ্বর

অথবা ইচ্ছাশক্তির স্ফুরনের মূলে যে অতিগুহ্য শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা পরম বিজ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ মহাশক্তিরই অঙ্গীভূত।" ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের এই বক্তব্যও যে অঘোরী বাবা কথিত ঐ পূর্ণবিজ্ঞানের অর্থটি সমর্থন করে, আশা করি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সামাজিক ভাবে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, মাসী-পিসি সবাইকে নিয়ে এই বিজ্ঞানভিত্তিক পঞ্চ ম-কার সাধন আদৌ **বাস্তব সম্মত** কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

৭. স্মর্তব্য যে, তারা তন্ত্রমে পঞ্চ-তত্ত্ব সাধনার অধিকারী বিষয়ে বলা হয়েছেঃ 'দ্বৈতজ্ঞানবিহীনো যঃ সর্বভূতহিতেরতঃ। তক্তুর্বনাশ্রমঃ শান্তঃ পাপলেশপরাম্মুখঃ।। / অবলিপ্তো ন কৃত্রাপি ধুতপাপঃ সদৈব হি। অবধূতঃ স বিজ্ঞেয় স্তৎকৃতে চীনসাধনম্।।" যার অর্থ দ্বৈতজ্ঞানহীন, সর্বভূতের হিতে নিয়োজিত বর্ণাশ্রমত্যাগী, শান্ত পাপলেশপরাম্মুখ, নির্লিপ্ত, নিষ্কলুষ যিনি অবধূত পদবাচ্য সেই সাধকই চীনাচার সাধনের উপযুক্ত। তাছাড়া নিরুত্তর তন্ত্রে শক্তি হিসাবে মাতা, ভগিনী, দুহিতা, স্ত্রী, পুত্রবধু প্রভৃতি সাংকেতিক। এর অর্থঃ "ভূমীন্দ্রকন্যকামাতা দুহিতা রজকীসূতা। শ্বপচী চ স্বসা জ্ঞেয়া কাপালী চ স্নুধা স্মৃতা। / যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চ কন্যা প্রকীর্তিতাঃ।" বিশ্লেষণ করলে এরকম দাঁড়ায়—মাতা = ভূমীন্দ্রকন্যা = সর্বদা যাঁর যন্ত্রসংস্কার হয় সেই সর্ববর্ণোদ্ভবা (সর্বদা যন্ত্র সংস্কারো যস্যশ্চ পরিজায়তে/ সৈব ভূমীন্দ্রজা রম্যা সর্ববর্ণোদ্ভবা প্রিয়ে। [নি.ত.]), দুহিতা = রজকীসূতা = পূজা সামগ্রী দেখে সর্ববর্ণোদ্ভবা যিনি রজঃশ্বলা হন (পূজা দ্রব্যং সমালোক্য রজোহবস্থাং প্রকাশয়েৎ। সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্তিতা। [ঐ]), পুত্রবধু = কাপালী = চতুবর্ণোদ্ভবা রমণী (চতুবর্ণোদ্ভবা রম্যা কাপালী সা প্রকীর্তিতা [ঐ]), আর সাধকের নিজশক্তি বা স্বকীয়া = যোগিনী = যিনি শিবশক্তি সমাযোগ বুদ্ধিসম্পন্না (শিবশক্তি সমাযোগা যোগিনী সা ব্যবস্থিতা [ঐ])। এইসব কুলনায়িকাগণ ছাড়াও বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে নটী, বেশ্যা, নাপিতাঙ্গনা, শৌন্তী, মালিকা, গোপালকন্যাকে, যবনী প্রভৃতি বহুশক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এ **সবই পারিভাষিক**। একমাত্র **সদ্গুরুই বোধহয়** এই রহস্যের সমাধান করতে পারেন। অতএব স্বকীয়া বলতে যদি নিজের স্ত্রীকেও বোঝায়, তাহলে তাকে অবশ্যই উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী "শিবশক্তিসমাযোগা" অর্থাৎ **অদ্বৈতজ্ঞান সম্পন্না** হতে হবে। সমাজে এরকম স্ত্রীও কি নিপাতনেসিদ্ধা নয়?

৮. পূর্বকথিত মুখ্য বা প্রত্যক্ষ পঞ্চ ম-কার ছাড়াও, আমরা তন্ত্রে অনুকল্পতত্ত্ব ও দিব্য পঞ্চতত্ত্ব এই দু-রকম পঞ্চতত্ত্ব সাধনার কথা পাই। 'সাধন

রহস্যম' এই সাধনার অধিকারী ভেদ করেছে এরকমঃ "পঞ্চতত্ত্বেন মুখ্যেন চানুককল্পেন বা প্রিয়ে। দিব্যেন জগদম্বার্থে নৈবদ্যং পরিকল্ময়েৎ। / মুখ্যকল্পেন বীরাণাং নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ। পহনাঙ্কানুকল্পেন দিব্যানং দিব্যকল্পকৈঃ।" অর্থাৎ মুখ্য, অনুকল্প ও দিব্যপঞ্চতন্ত্রের মধ্যে দিব্যভাবের সাধকরা দিব্যতত্ত্ব, বীরাচারীগণ মুখ্যতত্ত্ব ও পশুভাবের সাধকরা অনুকল্পতত্ত্বের দ্বারা জগদম্বাকে নৈবদ্যদান করবেন। তত্ত্বান্তরে এখানে মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এইগুলির অন্য অর্থ করা হয়েছে। যেমন "এবং মাংসনোতি হি যৎকর্ম তন্মাংসং পরিকীর্তিতম। ন চ কায়প্রতীকস্তু যোগী-ভির্স্মাং সমুচ্যতে" তান্ত্রিকগুরু বইটিতে শ্রী নিগমানন্দ 'মাং' অর্থাৎ আমাকে 'সনোতি' অর্থাৎ সমর্পন ক'রে যে কর্ম তাই-ই মাংস এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আবার পরশুরাম কল্পসূত্রে 'পঞ্চমতত্ত্ব' সম্বন্ধে বলা হয়েছে "রক্তং তু করবীরং বৈ তথা কৃষ্ণা-হপরাজিতা। এতৎ প্রোক্তং লিঙ্গযোন্যোঃ পুষ্পং তত্র তু যোজয়্যে" অর্থাৎ রক্তকরবী লিঙ্গপুষ্প এবং কৃষ্ণ অপরাজিতা যোনীপুষ্প। এদের উভয়ত সংযোজনই মৈথুনতত্ত্ব। অন্যদিক দিয়ে ভাবলে দেখা যায় এই বিকল্প তত্ত্বগুলির উদ্ভাবন হয়েছে হয়তো একথা ভেবেই "স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্ত চেতসঃ। তদ্রুপেন ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবৃদ্ধয়ঃ। / অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্বতি। ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা।।" (মহানির্বাণ-তন্ত্র) —কলিযুগে মানুষ চেতনার দিক থেকে কামবিভ্রান্ত। স্বল্পবুদ্ধিজনিত কারণে তারা শক্তির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই শেষ বা পঞ্চ-ম-তত্ত্বের প্রতিনিধি হিসাবে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও স্বীয় ইষ্টমন্ত্র জপ করাই বিধেয়।

৯. লক্ষ্যণীয়, যে মহানির্বাণতন্ত্র চক্রগোপন অনুচিত বলছে, সেখানেই আবার প্রতিনিধি রূপকল্পে মৈথুনতত্ত্ব সাধনার কথা বলা হয়েছে। আর যেহেতু এই দ্বন্দ নিরসনের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠী আমাদের জানা নেই, সেহেতু সামাজিক ভাবে আমরা কোন পথ বেছে নেবো?

১০. প্রসঙ্গতঃ জানাই, আপনি ৮ম খণ্ডে ২৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রাকে ইংরাজীতে Coin হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুকল্প বা দিব্য কোনো তত্ত্বেই তন্ত্রে ঐ চতুর্থ তত্ত্বটিকে ঐরূপে চিহ্নিত করা হয় নি। যেমন যোগিনী তন্ত্রে ভৃষ্টধান্যাদি অর্থাৎ খই প্রভৃতি যা কিছু চর্বনীয় তাকে মুদ্রা নামে অভিহিত করা হয়েছে ঃ "ভৃষ্টধান্যাদিকং যদ্ যৎ চর্বনীয়ং প্রক্ষেতে। সা মুদ্রা কথিতা দেবী সর্বেষাং নগনন্দিনী।।" মহানির্বাণতন্ত্রের মতও প্রায় অনুরূপ। আর ৮ম খণ্ডে ২৫৭ পৃষ্ঠায় বেদবতী মা ময়ূরটাকে নিধন করে, তার মাংস গ্রহণ করতে বলেছিলেন। তার কারণও বোধহয় পরশুরাম কল্পসূত্রে পাওয়া যায়ঃ "গ্রামারনৌ কুক্কুটৌ চ ময়ূরস্তিত্তিস্তথা। চক্রবাকঃ সারসশ্চ রাজহংসস্তথৈব চ। / জলকুক্কুট-হংসৌ চ চটকো দশা খেচরাঃ।।"

১১. পরিশেষে বলা ভালো—অঘটন আজো যে না ঘটে তা নয়। বরং 'নর্মদা কিনার মে ঐসা হোতাই হ্যায়।' আর দেব-দেবী, সাধু-মহাত্মাদের নিয়ে রোমহর্ষক অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত বইপত্রেরও; বাজারে কোনো অভাব নেই। লেখকের কাছে প্রশ্ন। কোনো আধ্যাত্মপিপাসু বা আর্তজন যদি গ্রন্থকথিত ঐ সব সাধুমহাত্মাদের কারো প্রতি দর্শনেচ্ছু হন, লেখক কি সে ব্যাপারে পারঙ্গম হতে পারবেন? বিশেষতঃ তাঁরা যখন কখনো সখনো, লোকালয়ে জন সান্নিধ্যে আসেন না এমন নয়; বরং আধুনিক প্রযুক্তির কল্যানে তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ ক্ষীণ হলেও বর্তমান (সূত্র তোতারাম গ্রেবালের মোবাইল)। তা যদি না পারা যায়, তবে শুধু 'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ' প্রার্থনা করে কপট অশ্রুজলে চিঁড়ে ভিজিয়ে কি লাভ? বিশেষতঃ কপাল লিখন বা জন্মান্তরের সংস্কারের মতো, ।রকালীন বাক্যগুলো যখন আমাদের প্রতি; অঙ্গুলি হেলন করেই আছে। তার সাথে আদেশ বা অনুমতি না থাকার মতো, পাশকাটানো যুক্তিগুলো আছে সোনায় সোহাগার মতো। আসলে সোমনন্দজী, আপনি নর্মদা মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন আপনার মতো করে, আপনাকে উহ্য না রেখেই। ব্যতিক্রমী তাঁরা, (সাহিত্য সম্রাটের ভাষায়) যাঁরা মনে করেন 'আমাদিগের আত্মপরিচয় দিবার রীতি আপনাদের নাই।"

শুভেচ্ছা ও প্রীত্যন্তে
শান্তিময় মুখোপাধ্যায়

লেখকের উত্তর

To,
শান্তিময় মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ

(ক) আমি সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিনি, আর সেই সদিচ্ছা বা কদিচ্ছা আমার আদৌ নাই। সাহিত্যের মিষ্টিরস আর কল্পনা, আমার লেখায় খুঁজতে চাইলে, সেটা বৃথা চেষ্টা হবে। আমারটা কটু-কষায় আর কুইনিন-তিক্ত। একমাত্র ম্যালেরিয়া রোগীর জন্য। ওই খেয়ে কেউ বমি করলে বা মাথা ঘুরলে—আবিষ্কারকের কোন দায় থাকে না। যেমন কোন দায় নাই—পেন বা পেন্সিল আবিষ্কারকের, কাগজ আবিষ্কারকের, রিভল্‌ভার, মেসিন-গান আবিষ্কারকের। ওই দিয়ে যেমন ভাল কাজ হয়, তেমনি বহু অপকর্মও হয়।

(খ) যে কোন কাজ করতে গেলে, তার জন্য যোগ্যতা লাগে। আর যোগ্য

পরিচালকের বা নির্দেশকের অধীনে কাজ করতে হয়। যে কেউ পঞ্চ ম-কার চক্র করতে চাইলে হবে না। চক্রাধিপতির অনুমতি প্রয়োজন। রাসলীলার সময় গেটে বসে ছিল মা দুগ্গা স্বয়ং। আর শ্রীকৃষ্ণই তাকে সেখানে ফিট্ করে দিয়েছিল, যাতে উটকো লোক ঢুকে না পড়ে। শিব ঢুকতে গিয়ে, ঘাড় ধাক্কা খেয়েছিল দুগ্গার। তবুও যখন কথা শুনেনি শিব, তখন শ্রীকৃষ্ণই বের করে দিয়েছিল তাকে, রাসলীলার আসর থেকে।

(গ) আমি যা লিখেছি, তা আমার ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার ফসল, কল্পনার খেউড় নয়। আমার ভাষা "এ্যাঁদাড়ে"-ই। ক্যামেরায় ছবি তুলবার মত ন্যুড বা প্রকৃতির মতো খোলা-মেলা; নকল নয়। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বেদ-পুরাণ—আর্য্য ঋষিদের লেখা হয়েও ৭০ শতাংশ এ্যাঁদাড়ে ভাষায় ভর্ত্তি। ঋষিরা মন-রাখা কথা লেখেনি—আমিও লিখিনি। রামায়ণ ইত্যাদি পড়ে—সমাজটা গোল্লায় যায়নি যখন এতদিনে, আমার লেখা পড়লেও যাবে না—এটা নিশ্চয় করে বলতে পারি। ঋষি কবি বলতে যদি বুঝি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তবে বলবো—আমি তাঁর গল্প উপন্যাস পড়বার মানসিকতা কোন কালেই পোষণ করিনি। তবে পূজা পর্য্যায়, প্রকৃতি পর্য্যায়, দর্শনসমৃদ্ধ কবিতাগুলোর আমি যত্নশীল পাঠক; শুধু কবিতার জন্যই মাথা নোয়াই তাঁর পায়ে।

(ঘ) আমার এই দায় নাই যে, ওইসব হিন্দুশাস্ত্র থেকে এ্যাঁদাড়ে ভাষা আর বর্ণনা ছেঁটে ফেলে দেবো অথবা পারবো। অজন্তা-ইলোরা খাজুরাহো গিরিগুহার চিত্রগুলো অসম্ভব কুরুচিকর, শিব দুর্গার লিঙ্গ আর যোনীর Exhibition-ও কুরুচিপূর্ণ, রাস্তায় চলতে গিয়ে কুকুর-ছাগল-গরু ইত্যাদিকে সঙ্গমে রত দেখি—সেগুলিও বড়ই কুরুচিপূর্ণ। যথেষ্ট শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা-ডাক্তাররা যখন artificial inseminate করায়, তাও কুরুচিপূর্ণ। উদাহরণ টানলে—পৃথিবীর এ'প্রান্ত থেকে ও'প্রান্ত চলে যাবে ফর্দ্দটা। রবি ঠাকুরের ঘাড়ে সাহিত্য সৃষ্টির ভুত চাপলেও, আমার চাপেনি।

রবি ঠাকুরের ঠাকুর্দার আবার, অনেকগুলি বেশ্যাবাড়ী ছিল গোটা কলকাতা জুড়ে—তাও কুরুচিপূর্ণ। তো—এই সব জানা সত্ত্বেও, আমরা রুচিবান মানুষেরা, সেগুলো গুঁড়িয়ে দিচ্ছি না কেন? সমস্ত সমাজের মধ্যমণিরা কেন গোয়ায় যায়? সারা বিশ্বের খানকীরা কেন ল্যাংটা হয়ে Stadium-এ প্যারেড করে? কেন ক্রিকেট খেলার নামে—বাজারের সেরা খান্‌কীদের 'চীয়ার গার্ল' নাম দিয়ে ইডেনে ল্যাংটা নাচ করানো হয়? এটা কোন সুরুচির পরিচয় বহন করে?

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে রমণ করতো কিনা, সে কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে ভুরি ভুরি আছে। আমি সংস্কৃত এতটাই জানি যে—যে কোন পণ্ডিতের সাথে লড়াই

করতে পেছ-পা নই। তবে সে যদি পণ্ডিত হয়। আমি প্রতিটি কথাকে ভাঙ্গতে জানি—আরও জানি যে, একটা কথার ৫০টা মানে বা প্রতিশব্দ থাকলে, কোনটাকে বেছে নিতে হয়। **ফালতু বুলি কপচানো** আমার ধাতে নাই।

তেঁতুলকে গাছে ঝুলতে দেখে মনে করিনা যে, ও'গুলো চিনে-বাদাম ঝুলছে। তালগাছ, খেজুর গাছ, নারকেল গাছকে প্রায় এক রকম দেখতে বলে—গুলিয়ে ফেলি না। যে স্বামী বা প্রেমিক নারীর দেহকে রমণ করে, সে তার মন-রুচিকেও রমণ করে। গোপীদেরকে শুধু শ্রীকৃষ্ণ রমণ করেনি, উদ্ধব ও অন্যেরাও করেছে। Original ভাগবতটা নিশ্চয়ই আমি লিখিনি।

নিরবচ্ছিন্ন কোন বর্ণনা, প্রয়োজনেই করতে হয়েছে। মেঘহীন আকাশে যদি সূর্য্য খর রোদ ছড়ায়, তবে কষ্টই হয় সব প্রাণীর। তাই বলে সূর্য্যের সমালোচনা করাটা কতদূর যুক্তিঋদ্ধ? সূর্য্য বা চন্দ্র বা প্রকৃতিই বুঝে, কী হওয়া কতখানি দরকার। কারুর রুচিমত তাকে চালানোটার ব্যাপারটা—পাগলের পর্য্যায়ে পড়েনা কী?

(চ) পঞ্চ ম-কারের দ্বারা, কিভাবে উৎরে যাওয়া যায়, সেই বিজ্ঞানটুকু বুঝাতে Anatomy & Physiology অবতারণা করেছি। কাউকে অজ্ঞান করতে নয়। কোন অজ্ঞানী যদি, জ্ঞানীর ভান করে, ধান ভানবার শব্দকে-বজ্রের শব্দ বলে ভেবে নেয়; তবে তার ওই পথ পরিহারই শ্রেয় হবে। মড়া কাটে ডাক্তারেরা; গবেষণা আর বিজ্ঞানের প্রয়োজনে।

রিক্সাওলা যদি প্রশ্ন করে—কী দরকার ছিল মড়া কাটার—তবে কী সেটা ঠিক কাজ হয়? ডাক্তারের জায়গায় রিক্সাওলাকে দেওয়া আর রিক্সাওলাকে ডাক্তারী করতে দেওয়া; আমাকে সাহিত্যিকের দলে ফেলা—সবটাই অর্থহীন উদ্ভট ব্যাপার নয় কী? আমি গবেষক তন্ত্র-শাস্ত্রের। কতটা সত্যি আর কতটা বিজ্ঞান আছে ওতে—সেটাই খুঁজি আমি, সেই জগন্মাতা তন্ত্রকন্যাদের নির্দ্দেশে। সাহিত্য সৃষ্টির মানসিকতা আমার আদৌ নাই। **আমার বই গবেষণা গ্রন্থ। গো + এষণা = হাম্বারব বা হাম্-বড়া চেল্লানী লিপিবদ্ধ নাই ওখানে। আমি তন্ত্র-ইনভেষ্টিগেটর-কাম-চিত্র সাংবাদিক। আমার কাজ নির্দ্দিষ্ট রয়েছে হুবহু তুলে ধরা—সব তথ্য আর চিত্র। আর তার গবেষণা করা—কোন কিছুকে আড়াল না করা নর্মদাতটের ধর্মীয় বিধানও বটে।**

(ছ) পত্রলেখক তন্ত্রের-গবেষণাগারে যেতে চেয়েছেন। কে তাঁকে মানা করেছে? তিনি যাবেন তাঁর আপন-টানে। আজ যদি **অরোভিলের** গোপন কর্ম্মশালায়, **রামকৃষ্ণ মিশনের** গোপন সাধন কক্ষে, কিংবা খ্রীষ্টান জগতের (Vatican city) ধর্ম্মগুরু

পোপ পল-এর সাধন কক্ষে গিয়ে আড্ডা মারতে চান; কিংবা RAW এর **সদর দপ্তর** / FBI / ISI / CIA / বর্ত্তমান জগৎ-গুরু শংকরাচার্য্যদের **গোপন সাধনা কুঠরীটা** দেখতে চান, তবে সেখানকার মালিক বা Head যিনি, তাঁর **পার্মিশান নিতে হবে।** তিনি যদি বুঝেন, অন্বেষকের যোগ্যতা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-অরুচি সব কিছু আছে—ওখানে ঢুকবার-জানার, তবে তিনি **পার্মিশন দিলেও দিতে পারেন।**

(জ) আর ওখানে যা হয়, ওখানকার কেউ যদি লেখে সে সব, তবে **সেটা আষাঢ়ে গল্প নয়**—যেহেতু সবাইকে সেখানে যেতে বা জানতে দেওয়া হয় না। প্রতিটি সংস্থা বা গোষ্ঠীর কিছু **কঠোর নিয়ম আছে**—সেটা সবাই মানতে বাধ্য। লেখক উৎসাহী-অন্বেষু পাঠকদেরকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলো না বা পারলো না বলে—সেটা তার গোলা-পাবলিককে **"পাশ কাটানো"** ব্যাপার হলো না।

আপন প্রিয়জনকে Operation Theatre-এ নিয়ে গিয়ে, ডাক্তারেরা অনেক কাটা-ছেঁড়া করে। গাঁটের লাখ লাখ টাকা খর্চা করে, বাড়ীর লোকেরাই বন্ড দিয়ে ওইগুলো করায়। কিন্তু সেই বাড়ীর লোকদেরকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না—**কেঁদে মরে গেলেও।** তাহলে কী বলা যায় যে, অপারেশন থিয়েটারে যা হয়, সেটা লেখাটা মিথ্যা, আর বাড়ীর লোকদেরকে—**নিষ্ঠুর বা জোচ্চুরীর পাশ কাটিয়ে যাওয়া?**

(ঝ) পরিশেষে বলি, তন্ত্রশাস্ত্রে কারা কারা পঞ্চ-ম-কার করবার অধিকারী, সে কথা বলা আছে। যদি কারুর **শহুরে মেকী রুচিবোধে** তা' বাধে, তবে আর্য্য ঋষিদেরকে **পেটানো উচিত**, যারা এই ধরণের **কুরুচিতে উৎসাহ দেয়।** অথবা পঞ্চ ম-কারের ব্যাপারে লেখা বইগুলো যেখানে যত আছে, দল বেঁধে দলমত নির্বিশেষে, সেগুলো পোড়ানো উচিত। তবেই শান্তি হবে। শিবলিঙ্গ আর দুর্গার যোনীপীঠ, **কামাখ্যার দুর্গামায়ের ফাটা-যোনী**, যেখান থেকে **রক্তাভ জল** উজিয়ে উঠে, আষাঢ় মাসে; সেখানে কয়টা ডিনামাইট লাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়া উচিৎ।

(ঞ) ভগবান শালা এমনই বেরসিক যে, জম্মাবার সময় সব প্রাণীকে দিয়ে দেয় লিঙ্গ-যোনী-মাই (সাধুচদুদের ভাষায়—ল্যাওড়া-গুদ্-ম্যানা)। ওগুলো তো তারা আলাদা প্যাকেটে করে, ক্যারি ব্যাগে ভরে, বাচ্চার হাতে ধরিয়ে দিতে পারতো? ওই বাঞ্চোতের কী কোন শালীনতা জ্ঞান নাই? সেটা তারা বনে জঙ্গলে অথবা পুকুরের পাঁকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতো? সময় মতো তুলে নিয়ে ওই কুরুচির কাজ করতে পারতো! তা না করে, শরীরের সাথে সেগুলোকে জুড়ে দেওয়া? আরে ছ্যাঃ-ছ্যাঃ-ছ্যাঃ, লজ্জায় মাথা কাটা যায়! ভদ্রলোক আমরা। আমরা কিনা ওই ল্যাওড়া-গুদ-সাথে নিয়ে, জন সমাজে ঘুরে বেড়াই। আর দর্জ্জিকে বলে, জামা প্যান্টে মাঝে মাঝে ফুটো ফুটো বানিয়ে রেখে, সেগুলো সকলকে দেখাই!

(ট) আর ওই "শুয়োরের বাচ্চা" ডাক্তারেরা, একগাদা টাকা নিয়ে, রোগ সারাতে গিয়ে, মাই টিপে, যোনীর ভিতর কণ্ডোমের মত গ্লাভ্‌স্ পরা হাত ঢুকিয়ে ঘন্টাভর কুস্তি করে! পুরুষদের লিঙ্গ চটকায়! এত অনাচার কত সহ্য হয়? মনে হয় ওই মেডিক্যাল কলেজ-গুলোকে, ডাক্তারখানা-গুলোকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিই। ওই সব গুহ্য ব্যাপার। ওখানে হাত চালানো কিংবা উঁকি মারার দরকারটাই বা কী? ওই শালা 'মেলেচ্ছ' জাত ইংরাজ আর আমেরিকানরা—ওই সংস্কৃত বইগুলো নিয়ে আবার **'গবেষণা'** করে? আমরা কেমন ওগুলোকে বাদ দিয়ে দিয়েছি, আর স্কুল-কলেজ থেকে বিদেয় করে দিয়েছি, ছেলে মেয়েদের **সময় আর রুচি নষ্ট হবে বলে!** সংস্কৃতে লেখা ওই **ফালতু বইগুলোতে** কী এমন লেখা আছে শুনি? এই আমরা ভালই আছি **রুচিবান** হয়ে—**'মেলেচ্ছ' হবার কোন ঠ্যাকাটা আছে?**

(ঠ) ফালতু জিনিস্ ঘাঁটুক ওরা ওদের দেশে। আমরা বরং **'বাজার থেকে'** ভাল জিনিসই কিনব। ফালতু "পায়স্ আর মুড়ি-খই" খেয়ে পেট খারাপ করে। বরং **"রাইস-পুডিং"** আর **"পার্চড্ রাইস"** খেলে শরীর ভাল থাকে। **আলুভাজা** কুত্তায় খায়। আমরা **পটাটো চীপস্** খাই। আমরা তাহলে—বোকা না ভিখারী!

অলমিতি বিস্তরেণ—বিস্তারেণঃ।

সোমানন্দ অবধূত



বার্ত্তাঃ বিশেষাঃ

(News : A Special one)

নর্মদা, পরম পিতা শিব এবং দুর্গার মানসকন্যা, বা বলা যেতে পারে যে—শিবের হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপা; এক মহাশক্তিময়ী সে। মহামায়া কালীর কন্যারূপা—খেয়ালী-আর ক্ষ্যাপাটে বা উড়নচণ্ডী-কন্যা। ভালবাসে সে, পেতে পিতা-মাতার স্নেহ। গেরুয়া-ধারিকা-সর্পরূপা সে, আমি তাকে যেমন দেখেছি, নর্ম্মদা-পরিক্রমার পথে পথে; বিন্ধ্যপর্বতে আর তার বুক-কাঁপানে জটিল-কুটিল, অরণ্যভূমিতে।

কোটি কোটি বছর ধরে, আজও তার তীর ধরে চলে পবিত্র পরিক্রমা; তার পুণ্যময়ী আশীর্বাদ পেতে। লক্ষ লক্ষ সাধু-মুনি-ঋষি দেবদেবী, রক্ষ-যক্ষ-কিন্নরেরা—আজও তাকে পরিক্রমা করে। শিব-দুর্গা স্বয়ং পিতামাতা হয়েও, করে তাকে পরিক্রমা আজও। একথা আমার নয়—স্বয়ং মহাঋষি মার্কণ্ডেয়ের।

ওই বিপদসংকুল পাহাড়ীপথে, গভীর বিন্ধ্যা-অরণ্য ভেদ করে; বছরের পর বছর পরিক্রমা করা—কারুর কারুর পক্ষে সম্ভব হয় না, সময়-সুযোগ, শরীর-মন; আর ভয়ে হুতাশে! তবে কী ব্রাত্য থাকবে তারা ? পাবে নাকি তার অপ্রমেয় করুণা ? অবশ্যই পাবে ১০ শতাংশ পুণ্য সবাই, যদি মনে মনে জপ করে—ওঁ হ্রাং রেবা রেবা হ্রাং ওঁ!

তবুও অভক্তিপুষ্ট অবিশ্বাসী আমরা, সামনে কোন মূর্ত্তি না দেখলে, মাথা নোয়াতে চাই না! এতটাই তরল, আমাদের ভক্তি আর বিশ্বাস! আর তাই চাই তার মূর্ত্তি , মঠ-মন্দির-মিশন, শুধু মেতে উঠতে—তার পবিত্র নামে, তাকে পেতে একান্ত করে! পশ্চিমবাংলায় নাই তার কোন মঠ-মন্দির আর মিশন, যতটুকু আমার জানা আছে। কন্যাস্বরূপা শিবকন্যার যে একটা, খেলাঘর বা আশ্রম বানিয়ে দিতে হয়, এই বাংলায়—তাদের জন্য, যারা সদিচ্ছা

থাকা সত্ত্বেও—যেতে পারলো না তার তটরেখায়। এখানে তাকে দর্শণ করে; সমান পুণ্যের ভাগীদার হতে পারবে তারা।

তাই ভিক্ষা চাই, সাহায্য চাই, খেলাঘররূপী তার মঠ-মন্দির আর আশ্রম গড়ে তুলতে। যেখানে পাণ্ডারূপী পাষণ্ডের খপ্পরে না পড়ে, ভক্তেরা নিজেরাই পূজা করতে পারবে নর্ম্মদার; শুধু জল দিয়ে তাকে—জলময়ীরূপে। ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য, কিছুই লাগে না—তার নাম করতে, প্রণাম জানাতে। সদিচ্ছা আর সামর্থে কুলিয়ে উঠলে—মুক্ত হস্তে দান করুণ—এই বিরাট কর্মযজ্ঞে। অতি সামান্যতম দানও—শ্রদ্ধায় গৃহীত হবে।



যোগাযোগের ঠিকানা

Sri Premananda Pramanik
Vill - Bidyadharpur, P.O. & P.S. -
Sonarpur, Kolkata - 700150
Dist - 24 Parganas (South), West Bengal

নিবেদক
সোমানন্দ অবধূত
ফোন ঃ- ৯৮৩০৪৭৯৩২৪